হিমালয়ের মহাতীর্থে

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৫০

ভট্টাচার্য্য সন্স্ লিমিটেডের পক্ষে ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বর্ত্তমানযুগের কেন্দ্রশক্তি শিক্ষাগুরু

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পধারা যাঁর প্রতিভার পরশ পেয়ে আজ সারা ...তর শিল্প সমাজে আদর পেয়েছে,—যাঁর প্রেরণা আমাদের মধ্যে আজ ...য় পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাজ করেচে, সারা ভারতের প্রসারিত শিল্প ...ল্যের যিনি প্রাণ হয়ে শক্তিসঞ্চার করেচেন,—আজ এই হিমালয়ের মহাতীর্থে তাঁকেই উৎসর্গ করে কৃতার্থ হলাম।

টালীগঞ্জ
কলিকাতা

তাঁরই আদরের লামা
প্রমোদ

নিবেদনের-জের

ছাপার হরপে এই খানিই তৃতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই হিমালয়ের মহাতীর্থের বিষয় বস্তুই আমার প্রথম (১৯১৪) হিমালয় ভ্রমণের বৃত্তান্ত, আর এই ভ্রমণের যে অভিজ্ঞতা তার মূল্য জীবনব্যাপী। এইটি প্রথম, তার পর বৎসরে দ্বিতীয় হিমালয় ভ্রমণ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথে, তারও দুই বৎসর পরে হিমালয় উত্তীর্ণ হয়ে কৈলাস ও মানসসরোবর উদ্দেশ্যে যাই। এটি তৃতীয় উদ্যম। কিন্তু বিধাতার বিধানে ঐ তৃতীয় উদ্যমের কথাই সাহিত্যের প্রথম উদ্যম, গ্রন্থ হয়ে প্রকাশিত হোলো সবার আগেই। এরমধ্যে একটু জানাবার কথা আছে।

প্রথম ভ্রমণে শুধুই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য, বিশালতা আর নগরাজের মহিমায় মুগ্ধ ভক্তই ছিলাম। নবীন শিল্পী প্রাণকে একটা উন্মাদনাই অধিকার করে রেখেছিল সারা কালটা। যা কিছু দেখেছি, আনন্দেই তার পরিসমাপ্তি আর কোন কথাই নেই। মহাতীর্থগুলি ভ্রমণের এইটি প্রত্যক্ষ ফল। এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, তখন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে বোধ হয় প্রকাশ করবার মত সাহসও ছিল না। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকে আমার ধারণায়, জলধর বাবুর হিমালয়, সাহিত্যের আসরে এতটা উচ্চে ধরা ছিল যেন সাহিত্যের দরবারে আর কারো হিমালয়কে স্পর্শ করার অধিকার ছিল না, এই ধারণাটাই অনেকদিন আমার মধ্যে সঙ্কোচ হয়ে বাধা দিয়েছে।

বৎসরান্তে দ্বিতীয় বারের ভ্রমণের সুযোগ ঘটলো। যমুনোত্তরী প্রথমে, তারপর গঙ্গোত্তরী হয়ে গোমুখ সন্ধানে এই যাত্রা। এবারেও ঐ উন্মাদনার মধ্য দিয়েই রহস্যপূর্ণ গিরিরাজের সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচয়। ঘটনা বৈচিত্র্যে আমায় অনেকটাই উন্নত করলেও সম্পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত এমনই কোন গ্রন্থ রচনায় মন স্থির করতেই দেয়নি, তখনও ঠিক সংযত হতে পারিনি। তবে ফিরে এসে সংগৃহীত মাল মসলা নিয়ে পৃথক পৃথক দুই তিন অংশে বিভক্ত কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছিল কিন্তু প্রকাশিত হয়নি।

তারপর শেষ বা তৃতীয় ভ্রমণ হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর উদ্দেশ্যে। সঙ্গী ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বর্গীয় সত্যচরণ শাস্ত্রীমশাই, (১৯১৮ সাল) তখনকারদিনে একজন বড় পর্য্যটক, বাঙ্গালার গৌরব বললেও ভুল হয় না। সাহিত্যিক ও বাগ্মী একাধারে এমন সঙ্গ অনেকটাই দুর্লভ। তখন আমার সাহসও অনেকটাই উদ্যমের সঙ্গে মেলানো আবার দৃষ্টির প্রসারতা, নিজ অনুভূতি বিশ্লেষণ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সাধক অবস্থা। সে যাত্রায় মালমসলা বুদ্ধিপূর্ব্বক সংগ্রহ করা হয়েছিল বোলেই প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সাধুভাষায় লিখতে আরম্ভ করি আর সঙ্গে তার ছবিগুলিও

তিন মাসেই শেষ হয়ে গেল। তারপর ঐ পাণ্ডুলিপির যে ইতিহাস তা ঐ গ্রন্থেই আছে বলা, পাঠকের তা অবিদিত নয়। তাহলে এখন আসল কথাটি এই যে হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর গ্রন্থখানি আমার প্রথম সাহিত্য উদ্যম হলেও আসলে আমার হিমালয় সংক্রান্ত শেষ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। আর এই হিমালয়ের মহাতীর্থে দীর্ঘকালপরে, শেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও আসলে এখানি হিমালয় ভ্রমণের প্রথম বিবরণ। আরও নিবেদনের জের একটু আছে।

হিমালয়ের দ্বিতীয় ভ্রমণ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে কয়েক বৎসর থেকেই বিচ্ছিন্ন আকারে নানা পত্রিকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। মাত্র গতবৎসরে সেগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু দুঃখের কথা বই খানির ভূমিকায় অথবা কোথাও তার কোন উল্লেখই রইলোনা। অন্য যে কোন স্বাধীন সাহিত্য ক্ষেত্রে এটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, এই অস্বীকৃতি আমার ইচ্ছাকৃত না হলেও এখনও আমার গায়ে বিঁধেই রয়েচে। আসলে এই শেষ দুখানি একই সঙ্গে প্রকাশ করবার মৎলবও ছিল তার প্রমাণ পথের নক্সা খানি দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না। কিন্তু কার্য্যকালে তা ঘটেনি, দুখানা আগে পাছেই প্রকাশিত হোলো।

শেষে ছবির কথাও একটু আছে। এই বই খানিতে ষোলোখানি ড্রইং আছে। তার মধ্যে আমার অপর প্রকাশক মাননীয় মিত্র ঘোষ কোম্পানী এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য,—পর্য্যটক, লছমন ঝুলা, দেব ও রুদ্র প্রয়াগ চন্দ্রপুরী কেদারনাথ, বদরী বিশাল ও বদরীমন্দির এই আটখানি ব্লক ছাপবার অধিকার দিয়ে আমায় চির কৃতজ্ঞতা পাশেই বদ্ধ করেচেন। শেষ এইটুকুই নিবেদনের জের।

৭৭ নং রসা রোড সাউথ
টালীগঞ্জ, কলিকাতা

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

হিমালয়ের মহাতীর্থে

হরিদ্বার—হৃষীকেশ ১৪ মাইল

১৩২১ সালে ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, প্রথম সেই ১৯১৪—১৮ যুদ্ধের বছর, হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলাম। সেই জনসমুদ্র দেখা জীবনের একটি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা। চৈত্রমাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ঐ মেলা এমনই জমজমাট ছিল যাতে দু এক হাজার চলে গেলেও যেমন দু এক হাজার এলেও কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা বাদ দিয়েই বলচি আমার মনে হয় পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুরুষই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় এসেছিল। আমি গিয়েছিলাম ফাল্গুন মাসে, মেলা শেষ হোলো চৈত্রমাসের শেষে। তারপরও আরও দেড় মাস ঐখানেই ছিলাম, তার কারণ সৌভাগ্যক্রমে যেস্থান আমি পেয়েছিলাম বিনামূল্যে এমন স্থান কত সুকৃতির ফলে পাওয়া যায়, তা জানতেন ভগবান স্বয়ং আর জানতেন বন্ধু আমার মদনমোহন বর্ম্মণ। এমন সচ্ছন্দ ও আরাম, বিশেষতঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে, পবিত্র হরিদ্বারের গঙ্গার উপর থাকার ব্যবস্থা খুব কম ভাগ্যবানেরই জোটে। এই তীর্থকে কেবল বাঙ্গালীরাই হরিদ্বার বলে বাকী জগতের সবাই একে হর-দোয়ার বলেই জানে।

গঙ্গার জল-কল্লোল আর হিমালয়ের পাদপীঠের প্রসারিত দৃশ্য প্রতিদিনেরই আকর্ষণ, সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যায়, অতুলনীয় যাকে বলে তাই। হরিদ্বারে যাত্রীসমাগম বারো-মাসই বেশ ঘনই থাকে। মনটা আমার কিছুতেই হরিদ্বারের মায়া কাটিয়ে বার হতে চাইছিল না। বাড়ি ফিরে নিজ কাজকর্ম্মে, উপজীবিকায় মন যায়নি, একটি বিশেষ কারণে, সেটা এখানে চুপি চুপি আমার প্রিয়তম পাঠককে বোলে রাখি। শুনেছিলাম, এই তীর্থের ফেরৎ অনেক মহাপুরুষ উত্তর হিমালয়ের কেদার বদরীতে যাবেন, আর সেই সঙ্গে অনেক যাত্রীও উত্তর হিমালয়ের দিকে, ঐ পথেই যাবে। তখনও পর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টে হিমালয়ে হৃষীকেশের বেশী অগ্রসর হবার সৌভাগ্য হয়নি তাই, যদি সুযোগ করে নিতে পারি তাহলে ঐ মহাতীর্থের পথে যাবার গোপন আশা মনে মনে বিলক্ষণ পোষণ করছিলাম।

জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি মনস্কামনা পূর্ণ হবার সুযোগ এলো। সুযোগ মানে টাকা। পর্য্যাপ্ত টাকা যখন হাতে এলো তখনই যাত্রার উদ্যোগ করলাম। কম্বলাদি প্রয়োজন মত

জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়ে গেল, মনে হয় ১৫ই জ্যৈষ্ঠই আমরা যাত্রা করি। তা আগে থেকে কতক প্রয়োজনীয় খবরও নিয়ে রেখেছিলাম। বালকিষণ নামে বদরী নারায়ণের একজন পাণ্ডা বা সাথুয়া,—পনেরো ষোলোজন যাত্রী নিয়ে আজ বাদে কাল রওনা হবে। আমার উদ্দেশ্য ছিলনা কোন দলে যাবার, কিন্তু কোন দলের কাছাকাছি থাকবার উদ্দেশ্য মনের কোণে ছিল। যাবো আমি একলাই, এই ছিল সঙ্কল্প এখন একটা লোক এই কদিন আমার সঙ্গ ছাড়ছিল না, সে অনেটাই নিজগুণে আমাকে সঙ্গীর মতই অনুসরণ করছিল, যেহেতু মাত্র একটা বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে একতা ছিল; সেও কোন দলের সঙ্গে যাবেনা। কেন? যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আমার যে উত্তর হবে তার সঙ্গে তার উত্তরের কোন মিলই নাই। উদ্দেশ্য দুজনেরই আলাদা। সে ছিল বিহারি, পাটনার অন্তর্গত কোন স্থানের। পরিষ্কার হিন্দি বলে, পরিষ্কার ভজন গানও করতো। ফার্ষ্ট ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল, অসংলগ্ন ইংরাজীও বলতো। এইটু মাত্র সে তার পরিচয় আমার কাছে দিয়েছিল; কিছুমাত্র কৌতূহল না থাকায় তার আর কিছুই জানতে চাইনি। সেও আমার নয়। আমি দলের সঙ্গে যেতে চাইনা তবুও কেন বালকিষনের দলের পিছনে পিছনে যাবার সংকল্প করেছিলাম, খুলে বলতে গেলে এই কথাই বোঝাতে হয় যে, জীবনে এই প্রথম হিমালয়ে প্রবেশ,—অতটা দূর পথে যাত্রা, একটু যেন অসহায় ভাবটা ছিল প্রথম, সঙ্গে কিছু টাকাকড়িও ছিল,—সেই কারণে সম্পূর্ণ একলা বা নির্ব্বান্ধব যাওয়াতে একটু ভয় ছিল। দলের কাছাকাছি থাকলে অনেকটাই নিরাপদ, এই যুক্তিতেই দলপতিকে স্বীকার করে, সকলের সঙ্গে একটা সহজ আপন ভাব রেখেই যাত্রা আমার সফল করবার চেষ্টা করেছিলাম। আর আমার বিহারি সঙ্গীর ঠিক যে এই উদ্দেশ্য ছিলনা তা আমি নিশ্চিৎ বোলতে পারি। তার নাম রামপ্রসাদ। বয়স আন্দাজ হয় চব্বিশের মধ্যেই,—বেশ সুপুরুষ না হলেও খারাপ ছিল না দেখতে। দাড়ি গোঁফ ছিল তার,—আমিও সেই সময় দাড়ি গোঁফ রেখেছিলাম, বৎসর খানেক। আমার বয়স তখন প্রায় ছাব্বিশ।

যাবার আগে যে আড়াই তিনমাস হরিদ্বারে ছিলাম তার মধ্যে যতটা ঐ পথের খবর নেওয়া সম্ভব তা সংগ্রহ করতে ত্রুটি করিনি,—কাজেই প্রায় সব দিক দিয়েই আমার এই যাত্রার কথা ভাবাছিল, হঠাৎ যাওয়াটা ঘটে যাইনি;—যেন তপস্যা করেই যাওয়াটা ঘটানো হয়েছিল। সময়েরও একটা হিসাব ছিল,—সোজা পথে শুধু কেদার ও বদরী-নারায়ণ ঘুরে আসতে পাঁচ সপ্তাহই যথেষ্ট সময়। বোধ হয় এ খবর সবাই জানেন।

শুভদিনে যাবার সময় হোলো, তখন নটা বেলা, আহারাদি শুভ কার্য্য শেষ করে—যখন আমরা পা বাড়িয়েছি বালকিষণের দলটি আগেই রওনা হয়েছে। রামপ্রসাদ, আমার পাটলাই নবীন বান্ধব পথে ভারি গম্ভীরভাবেই বললে, দুবেলা রান্নার বিষয়ে, আমি রুটিটা

করবো—আর তুমি ভাত রাঁধবে, ডাল ও তরকারী একটা তুমিই পাকিও। আমি এভাবের কর্ম্ম বিভাগের পক্ষপাতি ছিলাম না, আবার যাত্রাকালে এ নিয়ে আর বেশী কথা-বার্ত্তাও বাড়াতে ইচ্ছা হোলো না। সঙ্গে আমাদের রসদ ছিল না, কেবল কিছু কিছু আচার, বিস্কুট আর শুকনো ফল পেস্তা বাদাম কিসমিস, মিসরী এই রকম কিছু কিছু ছিল, আর আমার কম্বল, ওভারকোট তুলাভরা জামা প্রভৃতি শীতবস্ত্র, দুজোড়া কাপড় তোয়ালে ইত্যাদি সব নিয়ে প্রায় পনেরো বিশ সেরের এক বোঝা থাকায় হৃষীকেশ থেকে একটি বাহক নেবার সংকল্প ছিল। বান্ধবের সব কিছু নিজের পিঠে বেশ গুছিয়ে নেওয়া, তার মধ্যে রুটি গড়বার চাকি ও ব্যালন পর্য্যন্ত ছিল, বোধ হয় সেইজন্য তার রুটি গড়বার কাজটাই বেশী মনঃপুত ছিল।

তার যেটুকু বিশেষত্ব লক্ষ্য করছিলাম তা এই বেলা বলেনি। মনে হয় সে একটু মুখচোরা মানুষ; আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা কইতে তাকে দেখিনি। কোন দেবালয়ে ঢুকতেও দেখিনি, স্নান করতে কখনও গঙ্গায় নামতো না। তার আত্ম-সম্মানবোধটা বেশ প্রখর, তার বোঝাতে কাকেও হাত দিতে দেয়নি। যতই ভারী হোক সে নিজেই বহন করতো। যাত্রার আগেই দেখলাম, চাকি ব্যালন, একটা কানা-উঁচু থালা, একটা বাটি, এগুলি সে তার কম্বলের সঙ্গে পরিপাটি করে জড়িয়ে, তার সঙ্গে কাপড়-চোপড় যা-কিছু জামা পটি, সবার উপর একটা মোটা পাট-করা বোম্বাই চাদরে গুছিয়ে পিঠে নিয়ে দুটি খুঁট বুকের কাছে বেশ জোরসে গাঁট দিয়ে বাঁধা, হাতে কেবল দড়ির পাকানো বাণ্ডিলের সঙ্গে লোটাটি ঝোলানো থাকতো। পোষাক তার মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা। তার পরিচয় এখন এই পর্য্যন্তই।

হৃষীকেশ চোদ্দ মাইল পথ, হরিদ্বার থেকে গঙ্গার ধারে ধারে এঁকে বেঁকে গিয়েছে, সোজা পথ, কোন চরাই উৎরাই নেই, জানা পথ। আট মাইলের মাথায় ভীম গোডা। এরা বলে যে,—মহাপ্রস্থানের কালে ভীম এইখানে তাঁর গদাটি ফেলে যান। হিমালয়ের মধ্যে অনেক স্থানে পঞ্চ পাণ্ডবের স্মৃতি অনেক কিছুই আছে এইটি তার আরম্ভ বলা যায়। ঐ স্থানে মন্দির একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আর দোকান-পাট কিছু কিছু আছে দেখলাম। সেখানে আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করে বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ হৃষীকেশ পৌঁছে গেলাম। আগে একবার এসেছিলাম সুতরাং জানা স্থান। আমার সঙ্গে, হাতেই ছোট খাতা, পেন্সিল, একটা রাবার, এই সব ছিল। খাতাটা এক বিঘৎ লম্বা আর সাড়ে চার ইঞ্চি চওড়া সুতরাং তাকে ডাবল অর্থাৎ দুটো পাতা এক করে বেশ ল্যাণ্ডস্কেপ স্কেচের কাজ মনোমত চলতো। হৃষীকেশ থেকেই আরম্ভ করে দেওয়া গেল।

এই হৃষীকেশ হল বাবা কালী কমলিবালার যতো ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, জলসত্র, তার হিন্দি নাম পিয়াউ, প্রভৃতি সাধারণের উপকার-মূলক সৎ-প্রতিষ্ঠান, তার ব্যবস্থা কেন্দ্র বা হেড্‌ কোয়ার্টার। তা ছাড়া আরও, অপরাপর কত কত ধনী বণিকদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা, বিত্যালয় প্রভৃতি এখানে বর্ত্তমান, মন্দিরাদি দেবস্থানও কম নয়। কুলী ও যান বাহনাদি সব কিছু এইখান থেকেই ব্যবস্থা করতে হয়। আমার কুলী এইখান থেকেই নেওয়া হোলো। সে রুদ্র প্রয়াগের বেশী যাবেনা,—দশটাকা মজুরী, আর প্রত্যহ চার আনা খোরাক। যাত্রীদের ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঝাপান, ঘোড়া, গাধা সব ব্যবস্থা এইখানেই হয়। সুতরাং হিমালয়ের সর্ব্বস্থানে ভ্রমণের বেশ বড় ট্রানসপোর্টের সকল ব্যবস্থার কেন্দ্র এই হৃষীকেশ। তারপর সবার উপর ভরতজীর মন্দির,—বিরাট তাঁর ঐশ্বর্য্য, মহান্ত মহারাজ পরশুরামজীর একচ্ছত্র অধিকারে। তা ছাড়া এই বিশাল কেন্দ্রের অধিকারে সহস্র সাধু সন্ত বাস করেন,—এদের আহার যোগানোর ভার ভগবান বড় বড় বণিক বা শ্রেষ্ঠীদের উপরেই দিয়েছেন। তারপর যে সকল অভ্যাগত সাধু-সজ্জন নিত্য এখানে আসচে, থাকচে ও যাচ্চে তাদেরও ব্যবস্থা আছে। আসলে হিমালয়ময় যে সাধু সন্তদেরই গতাগতি তার প্রথম ও প্রধান ঘাঁটি এই হৃষীকেশ। এত বড় কেন্দ্র হিমালয়ের আর কোথাও নেই।

টিফিনের ঘণ্টা হলে স্কুলের ছেলেরা স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে যেমন মুক্তির আনন্দে চঞ্চল হয়ে খেলে বেড়ায়, হৃষীকেশে পৌছে আমাদের সেই মুক্তির আনন্দে অধীর করে তুললে। চার দিকেই সব ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। যার যেটা চাই সে সেই দিকেই ছুটাতে লাগলো। তার মধ্যে আমি একজন, প্রথমে এদিক ওদিক থেকে, স্কেচ করে ফেললাম খান তিন চার; তার পর গঙ্গার তীরে সৈকতের বালি আর নোড়ানুড়ির শয্যার উপর বসে পড়লাম ক্লান্ত হয়ে। নবীন বিহারী বান্ধব রামপ্রসাদ, আমার সঙ্গে তখন ছিল না। সে নিজের তালেই ছিল। বালি আর নোড়ানুড়ি ভরা বিস্তৃত সৈকতের মধ্যে একফালী নীল জল সামনে দিয়ে বরাবর বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছে, তারই ওপারে দীর্ঘ বিস্তৃত বালুকা পূর্ণ সৈকত প্রান্তে পাহাড় আরম্ভ হয়েছে একেবারে শিখর দেশ পর্য্যন্ত ঘন তরুলতা পূর্ণ। কি চমৎকার সূর্য্যাস্তের রং সঙ্গে এর মেশামিশি, গাছের সবুজের সঙ্গে খয়েরী তার পাশে নীল আর বেগুনি, অস্তগামী সূর্য্যের এক ঝলক তার উপর পড়ে যেন সোনার সঙ্গে তামা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে, দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। আকর্ষণ তার এমনই, চক্ষু ফেরানো যায় না একবার নজরে লাগলে। বেশ মগ্ন হয়েই ছিলাম এই সব যার নাম নয়নাভিরাম দৃশ্য নিয়ে।

হঠাৎ তিনটি মূর্ত্তি আমার সুমুখ দিয়েই গেল গঙ্গায় জলের ধারে। গুজরাটি পোষাক এক প্রৌঢ়, লম্বা কোট, মাথায় টুপি, মুরুব্বি গোছের মানুষটি আগে, সঙ্গে ছুটি

মেয়ে, ভদ্র লোকের পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো, দেখলাম। তাদের রূপ লাবণ্য এমনই প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করে দিল যে সবার চক্ষু তাদের দিকেই কেন্দ্রস্থ করে রাখলে কতকক্ষণের জন্ম। সুধু আমি নয়, দেখলাম অনেক সাধু-মুর্ত্তি যারা ঐ খানে ঐ সময়ে ছিলেন তাঁরাও যেন অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েছিলেন। খানিক দূরে রক্ষক একজন সিপাইয়ের পোষাকে দাঁড়িয়ে ছিল তটস্থ অবস্থায়, তাদের পিছনে।

বালিকা দুটির বড়ো যেটি যেন গৌরী প্রতিমা। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ অনেক দেখা যায় কিন্তু তার মধ্যে এতটা লাবণ্য, দুর্লভ। এ রূপের ছটা আছে,—আনন্দও আছে ;—আর সেটা রূপ দেখার সার্থক আনন্দ। বয়স কতো হতে পারে, ষোলো সতেরোই হবে মনে হয় ;—ছোটটি বারো তেরোই সম্ভব। বড়টি, বেগুনীরংয়ের ঘাগরার উপর মহামূল্য সাড়ি, চার দিকেই তার জরির চমকানি, ছোটটির ঘাগরা হালকা নীলরং তাতে সর্ব্বত্র জরীর নকসা, উপরে ঐ রংয়ের কাঁচলী তার উপর গোলাপী ওড়না। এখন প্রৌঢ় ভদ্র লোকটি দেখলাম এদিক ওদিক দেখে ধীরে ধীরে জলের কাছে এসে হেঁট হয়ে জলস্পর্শ আঙ্গুলে জল নিয়ে, আপোমার্জ্জন যাকে বলে তাই করলেন,—নিজের সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে তার পর মেয়েদুটির অঙ্গেও সেই রকম ছিটিয়ে তাদের পবিত্র করে দিলেন। তারপর যেভাবে গিয়েছিলেন সেইভাবেই ফিরে আসতে লাগলেন, আমার দিকেই।

আমার চেহারার বর্ণনা করে নেবো এই সুযোগে। প্রায় দেড় হারা, এক হারা নয় দোহারাও নয় এমন শরীরকে যা বলে, তাই দেড় হারা শরীরের উপর মালকোচা দিয়ে কাপড় পরা, মাথায় পাঞ্জাবী ধরণের পরা পাগড়ি, ভিতরে হাতকাটা ব্যানিয়ান তার উপর মোটা সাদা বোম্বাই চাদর সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো, পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের জুতা রাবার সোল, আর লম্বা হিলষ্টিকটা পাশে ফেলা আছে। চুল বড় বড়, গোঁফ দাড়ি স্বাভাবিক। বলেছি বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। জানিনা, আমায় দেখে ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তির মনে হয়তো একটা কিছু হয়ে ছিল, আমারই দিকে, আমাকেই লক্ষ্য করে আসছেন, পিছনে পিছনে মেয়ে দুটিও আছে দেখছি। সোজা আমার সামনে আসচে,—আমায় তটস্থ হতে হোলো। জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাতেই তিনি হিন্দিতেই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনে কাঁহাসে আয়া হোগা? আমার নিজ স্থানের কথা শুনেই বড় মেয়েটি এগিয়ে এসে, তখনকার রাজভাষায় বললেন, তুমি বাঙ্গালী? ইংরাজীতে তুমি আপনি একই আর গুজরাটি বা মারহাট্টিতেও ঠিক ঐ রকম। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বহুবচনের প্রয়োগ আছে। তখন তুমি টা, তমে, হয়ে যায়। কোথায় যাবে? এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? প্রশ্ন হোলো।

আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে প্রৌঢ় ব্যক্তি পিছিয়ে গেল জ্যেষ্ঠা গৌরীই প্রধানা বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং সামনে এসেই আরম্ভ করলেন, আমার বাবা, হয়তো

শুনেছেন নামটি-তার দাম্বালাল আরাভাই,—আমরা আমদাবাদের ;—অসুস্থ শরীর আমার মাকে নিয়ে গরমের ছুটিতে আমরা সবাই মুসুরীতে এসেছিলাম, এখন আমাদের ছুটি ফুরিয়েছে পড়াশুনা আরম্ভ করতে হবে তাই ফিরে যাচ্ছি, বাবা-মা মুসুরীতেই আছেন। যখন আমরা মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি তিনি আমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন যে, যখন আমরা হৃষীকেশে নামবো তখন যেন সেখানকার কোন ভালো সাধুকে টাকাটা দিয়ে দিই। আমরা একটু মস্কিলে পড়েচি। এই মাত্র আমরা এখানে এসেছি। আমি বলছিলাম একজন সাধুকে টাকাটা সবই দিয়ে দিতে কিন্তু,—আমাদের সঙ্গে, ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে,—নন্দ-শঙ্করজি বলছেন, সাধুরা তো প্রায়ই গরীব, ঐ টাকাটা আট দশ জনকে বেটে দিলেই ঠিক হবে, টাকাটার সদ্ব্যবহাব হবে। কিন্তু আমরা সাধু চিনিনা, সবাইত একই রকম দেখচি, কাকে দি অথবা কিভাবে দি, ধাঁধায় পড়েছি, সেই জন্য আপনার পরামর্শ চাই, যদি কিছু মনে না করেন, অবশ্য—

কি ব্যাপার! এত বড় একজন ক্রোড়পতির মেয়ে, তার কি সিদ্ধান্ত সঙ্কট, সামান্য কিছু টাকা দানের বিষয় নিয়ে!

আরও চমৎকার কথা এই, টাকাটা যে কত তা কিছুতেই জানার সম্ভাবনা নেই। কিছু টাকা, এই টুকুই জানবার অধিকার আমাদের, তাইতেই সব কিছু অনুমান করে নিতে হবে। • জিজ্ঞাসা করাও যায় না। আমি কিন্তু নিজের কোন মতামত এক্ষেত্রে অবান্তর মনে কবে বললাম, আপনার সঙ্গী প্রবীণ, বিচক্ষণ নন্দশঙ্করজি যা বোলেছেন তাই করুন না কেন? তা শুনে মেয়েটি বলে কি? টাকাটা এমন বেশি কিছু নয় যে অতগুলি লোকের মধ্যে বাটলেও সবার ভাগে বেশী কিছু হবে ;—তা ছাড়া এখানে যতগুলি সাধু আছে সবার অভাব পূর্ণ করাও যাবে না। তাই ভাবছিলাম একজন যদি সবটা পায় তাতে তার বিশেষ কিছু অভাব মিটতে পারে অথবা কাজের মত কিছু কাজ হতে পারে।

বিস্‌নেসম্যানের মেয়ে, বুদ্ধিও সেইরূপ, তার কথা শুনেই আমি বললাম, এই যুক্তিটাও আমার মনে হয় খুবই ভাল। মেয়েটি বিদ্যুতের মত একটু হেসে নন্দশঙ্করের দিকে চেয়ে তাদের মাতৃভাষায় বললে, শুনেছ বাবুজি যা বললে? সেও হেসে বললে, বেশ তো, তাহাই করো। তখন মেয়েটি আমায় বললে একটি ভালো উপযুক্ত সাধু খুঁজে দিতে একটু সাহায্য করবেন কি আপনি? আমার বিরক্তি, অন্তরের গ্লানী যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলে,—আমি তাকে একটা অদ্ভুত ভাবার মধ্যে ঢাকা দিতে চাইলাম। বললাম, এক্ষেত্রে আমার চেয়ে ভালো সাধু আমিতো আর কাকেও দেখছি না।

মেয়েটি অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, আমার মনের ভাবটা মুহূর্ত্তেই বুঝেনিলে। একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললে, কিছু মনে করবেন না—আমরা তাড়াতাড়ি হরদোয়ারে ফেরবার জন্যেই একজনের সাহায্যে একাযটা সংক্ষেপে সারতে চাইছিলাম। যাই হোক, নমস্কার, আচ্ছা আমরাই খুঁজে নেবো। আমিও প্রতিনমস্কারান্তে বললাম, টাকাটি যাকে দিয়ে আপনাদের মনে সন্তোষ থাকবে এমন সাধুকে আপনাদেরই খুঁজে নেওয়াই উচিত। তারপর ধন্যবাদান্তে পরস্পর বিদায় নেবার পালা।

খানিকটা, বেশ কিছুক্ষণ এই তুচ্ছ ব্যাপারটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া চলেছিল, তার পর, বোধ হয় দুঘণ্টাও গেল না আর এক নাটকীয় ব্যাপার যা ঘনিয়ে এলো, সে রহস্যও মন্দ নয়। যাই হোক, আমরা এখন ধর্ম্মশালায় গিয়ে রাত্র ভোজনের যোগাড় করলাম। ঘৃতসিক্ত রোটি আর শাক, দহি প্রভৃতি খাওয়া সেরে নিয়ে ভাবছিলাম একটু আবার গঙ্গাতীরে ঘুরে আসি। চাঁদ ছিল আকাশে। দরজা পার হবার আগেই পুলিশ এসে উপস্থিত, যত যাত্রী ছিল সবার পরিচয় নেওয়ার কাযে। আমাকে নিয়ে যখন দারোগা সাহেব পড়লেন, প্রায় মাঝখানে, তখন তাঁর ধরণ দেখে আমার ভয় হোলো। একে পাঞ্জাবী পুরুষ, গৌরবর্ণ, লম্বা চওড়া চেহারাটা বীরত্ব ব্যঞ্জক। প্রথমেই যখন আমার নামটি জিজ্ঞাসা করলেন। শুনবামাত্রই, ইংরাজীতে বললেন, Oh-ho, Bengali! You require special treatment. Please wait a few minutes till finish with them, বোলে আমায় একদিকে অপেক্ষা করতে বলে নিজ কাজে মনোনিবেশ করলেন। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে Come with me Babu, বোলে নিয়ে বাইরে এলেন, সঙ্গে তিন চ্যরজন কন্‌স্‌টেব্‌ল্‌। চোস্ত ইংরাজীতেই বললেন, কি জানেন, আপনাদের দেশের প্রত্যেকের উপর বড় কড়ানজর রাখতে আমাদের উপর হুকুম হয়েছে পুলিশ সুপারের। এখন আপনার কি ভাবটা বলুন তো? কোথায় চলেছেন?

কেদার-বদরী, হিমালয়ের মধ্যে প্রাণ ভরে কিছু দিন ভ্রমণ, আর তীর্থ দর্শন,—আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। তবে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল সম্ভব হলে, কিছু কিছু পেন্সিল স্কেচ করে নেওয়া মনোমত স্থান গুলির। তার পর বাড়িতে ফিরে তাথেকে অবসর মত রং দিয়ে উৎকৃষ্ট হিমালয়ান ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি তৈরী করা।

ল্যাণ্ডস্কেপ? সেকি? আমি বললাম, আমি চিত্র শিল্পী। শুনেই দারোগা সাহেব খুসি। প্রশ্ন হোলো, কাজ কিছু আছে নাকি সঙ্গে? বললাম, সঙ্গে গেলে দেখাতে পারি, বাসায় রেখে এলাম যে। তিনি ছাড়বার পাত্র নন। স্বচ্ছন্দে ভদ্রলোক বলেন, চলো যাই, দেখবো। বাসায় এসে খাতাখানা দেখালাম, বেশী নয় চার পাঁচটি ছিল; আজ হৃষীকেশের গঙ্গা ধারে বসে যে ক'টী করেছিলাম, দেখালাম।

দেখে খুসী। বললেন, you have saved me from a great trouble। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

তিনি। আমাদের সুপার হরিদ্বারে বসে আছে, বলে, বাঙ্গালী সন্দেহ জনক, পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে, young, ছোকরা পেলেই আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে, আমি নিজে পরীক্ষা করবো। আমাদেরও বিশ্বাস নেই। তা তোমার কেশটা ত হালকা, শিল্পী বলে আমি অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারি। তা ছাড়া, যদিও তুমি ইয়ং you look to be in and out innocent, নিরীহ, তাতে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, ক্ষমা কোরো,—ধন্তবাদ। বোলে করমর্দ্দনে আপ্যায়ীত করে গটগট করে চলে গেলেন। তাঁর দলবল দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে।

পুলিশের পাল্লায় পড়তে পড়তে রয়ে গেলাম, ভগবৎ কৃপা ছাড়া একে আর কি বলতে পারি। যাই হোক ওরা চলে যাবার পর একলা আমি অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারেই ছিলাম। তারপর. আমাদের অধিকৃত ধর্মশালার ঘরে এসে দেখি রামপ্রসাদ মহা খুসী হয়ে নিজের বিছানার উপর বসে আপন মনে রাম ভজন জুড়ে দিয়েছে। হাতে কাঠের করতাল, ঠকাঠক্ চকাচক্ ঝম ঝম তাল দিচ্ছে, আর দুচার জন শ্রোতাও পেয়েচে। আমি যেই এলাম গান বন্ধ করে দিলে। যেই শ্রোতারাও অন্তর্দ্ধান করলেন সেও যেন মহানন্দে লাফিয়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? আরে আজ দোনো স্বর্গ সে হুরী আয়াথা, বহোত খুবসুরতি, ক্যাবলু ম্যায়, কঁ্যাবলু—যোয়ান, দোনো বিবিজী আইথি, ইস ধরম সালে সে বাহার, বো সাধুকে ঝুপড়ি দেখতা না? উহা আয়া, সব সাধুকো কুছ কুছ দান ধরম কিয়া, হামতো উহাই খাড়ে হোকর দেখতারহা। হামকো ভি দো রুপায়া মিলা। আপ রহতে তো আপকো ভি মিলতে থে। চমৎকার ঘটনা। জিজ্ঞাসা করলাম, উলোক গয়া কঁহা? সে বোললে, আপনা গাড়িমে উলোক তবহি হর দোয়ার মে চল দিয়া। এই হোলো আমাদের যাত্রার প্রথম রাত্রের কথা।

লছমনঝুলা, গড়ুর, গুলার, বিজনী, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ—৪১॥ মাইল

পরদিন লছমনঝুলার পথে রওনা হলাম। আমরা দুজনে আগে আগেই চললাম। সোজা সমতল পথ বিজন বনভূমির মাঝদিয়ে। মৌনী বনের শান্ত নিস্তব্ধ অল্প আলো অল্প অন্ধকার মেশানো এক চমৎকার পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে, সে যে কি শান্তিময় বায়ু মণ্ডল তার কথা আর কি বলবো। সহরবাসী আমরা কেবলই জনকোলাহল মুখর, ইট-কাট, পাথরের বাড়ি, গাড়ি, লোহালক্কড় দেখতে অভ্যস্ত, তার মধ্যেই হয়েচি

মানুষ। চক্ষু জলে যায় সহরের ঐশ্বর্য্যের পানে লক্ষ্য করলে এখানে তাই, এই বনভূমির শান্তি প্রাণে কেমন একটা সমাহিত ভাব নিয়ে আসে, দীর্ঘকাল থাকতেই লোভ হয়। প্রায় মাইল দেড় আসবার পর সামনে পর্ব্বতের উপর গাড়োয়ালের রাজার এক প্রাসাদ দেখা যায়। মুনিকিরেতি স্থানটির নাম, পার হয়ে খানিক ওঠানামা করে তিন মাইলের মাথায় লছমনঝুলায় এসে পড়লাম। ঘন সিঁদুর রং করা ঝক ঝক করচে নূতন পুলটি। এপাড়ে দাঁড়িয়ে, সামনেই গঙ্গার নীল ধারার কি চমৎকার দৃশ্য; ওপারে, নীলকণ্ঠ পর্ব্বত, কি বিশাল শরীর যেন আকাশে ঠেকেছে;—আর ঐ পর্ব্বৎশীর্ষ থেকে একটি ঝরনার পথ, এখন আর ঝরনা নেই শুখিয়ে গিয়ে কেবল পথ রেখাটি সেই উপর থেকে বরাবর এঁকে বেঁকে নেমে এসেছে। আমরা পুল পার হয়ে ডাক বাঙ্গালার দাওয়ায় বসে বসে কিছু জলযোগ করে নিলাম। এমনই সময় বালকিষানের দল আমাদের অতিক্রম করে চলে গেল স্বর্গাশ্রমের দিকে। এমন মনোহর স্থানটিতে একটুও দাঁড়ালোনা, দেখলেনা, সোজা চলে গেল। ওদের দলটির পিছনে পিছনে ২টা কাণ্ডিওলা আবার ঝাপান নিয়ে দুজন চলছে। কেউ তাদের লাগায় নি বা নিযুক্ত করেনি তবুও তারা চলেছে, কি জানি কি মনে করে। যাইহোক সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

দুই মাইলের মাথায় গড়ুর চটি। এই খানেই দেখলাম ঐ বালকিষনের দল আড্ডা গেড়েছে এ বেলার মত। আমরা দাঁড়ালাম না। বেশ প্রশস্ত পথ, মাঝে মাঝে বেশ গ্রামের আয়তন। মধ্যে ফুলওয়ারী চটি বোলে আরও একটি ছোট পড়াও পেরিয়ে, আরও চার মাইল গিয়ে গুলার চটিতে পৌঁছে আড্ডা গাড়লাম এবেলার মত। তখন সাড়ে এগারোটা হবে। বানিয়ার দোকানে সওদা নিয়ে তারই চালায় রান্না চাপানো হোলো।

গুলারচটি গ্রামখানা ক্ষুদ্র হলেও অতীব সুন্দর। হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের রূপ আসলে নব যুবতির মত, সর্ব্বত্র সবুজ। পিছনে বিশাল শৃঙ্গধর, মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিনী, তারি মধ্যে কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম,—এক হতে অপর অংশে যেতে সর্ব্বত্রই স্রোতস্বিনী প্রাণে প্রাণে পরিপূর্ণ, এই ভাবটি শিবালিক শ্রেণীর সর্ব্বত্র। এরূপ যিনি দেখেননি তাঁকে সাহিত্যের সাহায্যে বুঝাতে গেলে একটা দিকে ফাঁক পড়বেই। এখন সেই জন্য পৃথকভাবে সে চেষ্টা করবো না,—এখানে যেভাবে যেখানে যেটি দেখেছি কেবলমাত্র তাই বলবার চেষ্টাই করবো।

আজ এখানে দিনের অতিথী হয়ে আমরা স্নান আহার এবং বিশ্রামে কিছুক্ষণ কাটিয়ে, উঠলাম। পথিক, যতক্ষণ পথ চলি ততক্ষণ আমরা পথের মানুষ;—তার পর যখন আশ্রমে প্রবেশ করি, পান ভোজন ক্লান্তি অপনোদন, বিশ্রাম, আপন শয্যায় গাঢ় সুষুপ্তি মধ্যে সমাহিত থাকি তখনই আমরা আশ্রমী, কিছুতেই পথের মানুষ আমাদের বলতে পারি না তখন। পরে বিশ্রামান্তে যখন পথে বার হয়েছি তখন পথের মানুষ

আবার। কিন্তু পথে, বিধাতার আশীর্বাদ আছে, কারণ, স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমা পথেই ধরা যায়। কাজেই পথে থাকলে আমরা দুঃখী তো নয়ই বরং সৌভাগ্যবানই বলবো। একথা কবি কল্পনা নয়, দার্শনিক মতবাদ নয়, একথা সত্য সত্যই একজন পর্য্যটকের

লছমনঝুলা

সত্য অনুভূতি। প্রকৃতি মহৎ, যখন আমি চক্ষুঃ উন্মীলন করি তখন এটা স্পষ্ট দেখি তার পর যখন দৃষ্টি প্রত্যক্ষের সীমা ছাড়ায় আপনি চক্ষু মুদিত করি আর প্রাণ দিয়ে অনুভব করি। এর সঙ্গে আমার তোমার কারো স্বার্থের কোন সংঘাত বা সম্বন্ধই নেই, তাই এর মূল্য আমার কাছে যেমন সবাকার কাছেই অপরিমিত।

সুন্দর পথ, প্রথমাংশ সরল, সুখে চলেছি। তারপর একধারার নিকটবর্ত্তি হলাম, পার হয়েই চড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। চড়াইয়ের যে কঠিন ভাবটি এই পথেই প্রথম অনুভব করা গেল। আরোহণ প্রায় দুই মাইল,—পথে একটা ঝরনা পাইনি, সুতরাং অবসন্ন হয়ে পড়াওতে যখন পৌঁছে গেলেম তখন যে তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলাম সে কথা বলাই বাহুল্য। পর্ব্বতের শীর্ষদেশেই সুন্দর গ্রাম খানি। সন্ধ্যার আগেই আমরা বিজনীতে পৌঁছেছিলাম ;—সুতরাং স্থানটির সঙ্গে পরিচিত হবার বেলা ছিল। দোকান তো আছেই তা ছাড়া ডাক বাঙ্গলো আছে। পথের উপর খানিক চড়াই উঠেই এই চমৎকার ডাক বাঙ্গলাটি। চমৎকার ঘর, বারান্দা চারিদিকে আর ঐ খান থেকে স্থানীয় দৃশ্য এতটা সুন্দর দেখা যায় অমন বুঝি আর কোথাও থেকে দেখা যাবে না। সত্যই যেখানে যেখানে ডাকবাঙ্গলো আছে দেখেছি, সেখান থেকে বহুদূর ঐদৃশ্যের ঐশ্বর্য্যই প্রকট এবিষয়ে আর কোন সংশয় নেই। আমাদের মত অবস্থাহীন যাত্রীদের থাকতে বড় অসুবিধা, আর যাদের সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই থাকে তাদের সর্ব্বসুখ এখানে।—যাদের তা অনেকটা নেমে প্রত্যেক জিনিষটির জন্যই বাজারে ছুটতে হবে। যাই হোক এ গ্রামে ঘনবসতি নেই ছড়িয়ে আছে গৃহগুলি। আমাদের চটিতেই থাকতে হলো রাত্রে। রোটি, আলুর ভাজি, আমাচার আর শেষে একটু ক্ষীর খণ্ড। শীত ছিল বেশ, আগুনের ব্যবস্থাও ছিল আঙ্গিনায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে নয়। পাঁচ ছয় জন যাত্রী ঐ আগুণের কাছা কাছি শুয়েছিল বাকী সবারই ঘরের মধ্যে স্থান। এই বিজনীতে হোলো আমাদের দ্বিতীয় রাত্র যাপন। সকালে উঠে বেশ শীত বোধ হোলো,—গরম জামাও একটা পরে নিলাম।

উৎরাই পথে হন হন করে নামচি,—আস-পাশে হরিতকি, আমলকী, বয়ড়া কতরকমের বনৌষধি পথের দুইদিকেই দেখতে দেখতে, দুচারটে কুড়িয়ে ছিলাম আস্বাদনেও বঞ্চিত হইনি। এগারো মাইল পথ,—সুখে বেশ চলেছিলাম। শেষদিকে গঙ্গাতীরে মহাদেব মন্দির আর গ্রামের নামটিও মহাদেব। এই খানেই এবেলারমত বিশ্রাম। সুখে পানাহার ও বেশখানিক বিশ্রাম নিয়ে দুটা আন্দাজ রওনা হলাম।

এবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথটা সোজা চলে গিয়েছে। মনে মনে এই বনের একএকটি স্থানকে ভীতিপ্রদ বোলে, তা ছাড়া হিংস্র জানোয়ারের ভয়েতেও বটে স্মরণীয় করে রেখেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই খানিক চড়াই ভেঙ্গে উঠে, কোটলী বেল নামে এক বনগ্রামে আমরা আশ্রয় নিলাম। এইখানেই আমাদের আজ তৃতীয় রাত্রিবাস।

প্রাতে আবার পথে,—এবারে ব্যাসঘাট হোলো লক্ষ্যস্থল। চড়াই তারপর উৎরাই এই নয় মাইল পথ বড়ই বিচিত্র দৃশ্যে পূর্ণ। বিশেষতঃ একটি পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী, যে মূর্ত্তি আমাদের দেখালেন মনে হোলো যে হিমালয়ের যথার্থই একটি রূপ দেখতে পেলাম।

ব্যাসগঙ্গার সঙ্গে মিলনের প্রায় দুই মাইল আগে বিশেষ আরও একটি সঙ্গম আমরা উত্তীর্ণ হলাম। এই নব গঙ্গা আর গঙ্গা সঙ্গমের মাহাত্ম্য আকৃষ্ট করে একজনকে।

আজ পথটি নিয়ে চলেছে আমাদের দুই রাজ্যের ভিতর দিয়ে। যখন কোন স্থানে পথ গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝতে হবে আমরা ব্রিটিশ অধিকৃত গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে বা অধিকারে এসে পড়েছি, আর যখন গঙ্গার বামতীরস্থ পথে চলেছি,—তখন খাঁটি গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে দিয়েই চলেছি। এই অধিকারটা ঐতিহাসিক ব্যাপার এটুকু জেনেরাখা ভালো। দেশরক্ষার জন্য কিভাবে দেশের গভার্মেণ্ট সীমান্ত নির্ণয় এবং রক্ষার ব্যবস্থা করেন তাতে তাঁদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে যখন বৃটিশ গভার্মেণ্ট গাড়োয়াল রাজ্যের উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ অংশ অধিকার এবং রক্ষণাবেক্ষণের দাবী করেন,—কতই না প্রতিবাদ হয়েছিল দরবার থেকে। কিন্তু ভারতের সীমান্ত নির্দ্দেশের ব্যাপারে, ভবিষ্যতে ভারতের নিরাপত্তার জন্যই ঐ স্থানের অস্তিত্ব কতটা গুরুত্ব-পূর্ণ এটা সাধারণের মাথায় আসেনি। যাই হোক আসল গাড়োয়ালের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণের কতকাংশ বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে আছে কিন্তু ধর্ম্ম বা তীর্থ বিষয়ক যাকিছু তা টিরী দরবারেই সম্পূর্ণ অধিকারে আছে,—ভেদ বা বিভাগ কেবল রাজনৈতিক, সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। কেদার নয় কিন্তু বদরীনারায়ণ অঞ্চলও বৃটিশ অধিকারে একেবারে মানা গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত।

নদীর দুই ধারেই এ পথে, প্রচুর শস্য ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। সমতল জমির চাষ আর পার্ব্বত্য জমীর চাষ আকারে প্রকারে কিছু ভেদ আছে। পার্ব্বত্য ঝরনা পার্ব্বত্য চাষীদের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। যে পর্ব্বতে ঝরনা নেই সে পর্ব্বতে চাষ বাস বা লোকালয় নাই। যেখানেই লোকালয় দেখা যাবে বুঝতে হবে সেইখানেই ঝরণা আছে আর সেইখানেই কৃষিক্ষেত্র বর্ত্তমান। এই সব দেখতে দেখতে এখন আমরা ব্যাসঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম।

ব্যাসঘাট নামটা শুনলেই ব্যাসদেবের কথা মনে হয়। অবশ্য নাম মাহাত্ম্য যতো স্থান মাহাত্ম্যও ততই কাজ করে তীর্থ যাত্রীর মনে। এখানে বেদব্যাসের একটি সাধন ক্ষেত্র বা কর্ম্মকেন্দ্র যাহোক একটা কিছু ছিল। আমার মনে হয় তিনি এখানে শীতের সময় থাকতেন আর বদরীনারায়ণ ক্ষেত্র পেরিয়ে মানাগ্রামে যে ব্যাসগুহা দেখা যায় সেখানে তিনি গ্রীষ্মকালে বাস করতেন। দেশের বড় বড় গণনীয় মহাত্মাদের এখনও যেমন তখনও তেমনি ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাস বা কর্ম্মক্ষেত্রেরও পরিবর্ত্তন করতে হোতো। একই স্থানে বাস সকল ঋতুতে স্বাস্থ্যকর নয় একথা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষীকল্প পিতৃপুরুষগণ খুবই ভাল বুঝতেন। এখন, এ তথ্য অর্থ বা ধননীতির কঠিন প্রতিযোগিতার কালেও সত্য। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যখন উপযোগী অবস্থার পরিবর্ত্তন ও

সম্ভব হচ্চে, তখনকার দিনে যখন ধননীতির এতটা কঠিন আলোচনা ছিলনা, জীবনযাত্রা সহজ ছিল, তাই মনে হয় এটা আরও সহজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতনিয়মানুগ ব্যবহার বোলে বিশেষ ভাবেই চলিত ছিল।

যাই হোক এই ব্যাসঘাট বেশ বড় একটা পড়াও বা চটি বা গ্রাম যেখানে সাধু সন্ন্যাসীর অবস্থিতি লক্ষ্য করলেই মনে হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই পুণ্য ক্ষেত্রের আচার ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত একই ধারায় চলে আসচে। আমার মনে হয় এই ব্যাসঘাটের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের প্রভাবে এখানকার সকল কিছুই সার্থক করে তুলেছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য চারদিকেই। দৃশ্যের মহিমা বৃদ্ধি, তার প্রসারতায়। ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালে এপ্রসার, মনকে আমাদের অনন্তের পানে সবলে আকর্ষণ করে। নীলবর্ণটি নিজগুণেই দূরত্ব সূচিত করে। সেই জন্য নিকট পর্ব্বতস্থ বৃক্ষলতার গায় সবুজ যেমন প্রাণকে আনন্দে নাচায়, সেই হরিৎ ভূষিত গিরি যখন দূরে দেখা যায় তখনই সেই হরিতের সঙ্গে কি অপূর্ব্ব নীলের মেশামিশি। আবার যখন গিরিশ্রেণী বহুদূরে সরে গিয়েছে যে দূরত্বের সঙ্গে আকাশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ঘটে গিয়েছে তখন কেবলমাত্র হালকা নীলের প্রলেপ দেখা যায়, আরও দূরতর দৃশ্যে নীলাভ ধূসর হয়েপ্রাণকে টেনে নিয়ে যায় কোন সুদূরের পানে।

ব্যাস-ঘাটে যতক্ষণ আমি ছিলাম. কখনও ঘরের ভিতরে থাকতে পারিনি। ধর্ম্মশালাটিও সুন্দর তার সামনেই ঐ মনোরম দৃশ্য। চলতে ফিরতে নিরন্তর দেখাতে মর্ম্মস্থানে চিত্রিত হয়ে যায়। সঙ্গমের মুখেই গ্রামখানি, অপরূপ গৃহগুলি, মন্দির চত্ত্বর যা কিছুই দেখা যাচ্চে সব কিছুই হিমালয়ের মহিমা ঘোষণা করচে। কত স্থান এই ব্যাসের সঙ্গে জড়িত বলা শক্ত। হিমালয়ের সর্ব্বনিম্ন স্তর থেকে সর্ব্বোচ্য স্তরের মধ্যেও ব্যাসদেবের সম্পর্ক বর্ত্তমান, এখনও—।

আজ আমার রাত্রিবাস এখানেই। পরদিন প্রাতে যাত্রার পূর্ব্বেই দেখি কয়েকটি যাত্রী এলো কাণ্ডীতে ও ডাণ্ডিতে, কুলী বাহক মিলিয়ে অনেকগুলির এক দল। বোধ হয় ধনবান, বদরিকায় যাচ্ছেন। দুজন স্ত্রীলোক আছেন কাণ্ডিতে। বিহারের কোন জমীদার এরা। অবশ্য এদের বৈশিষ্ট্য যেটুকু তা তেমন চিত্তাকর্ষক নয়, তবে আজ আমরা যত যাত্রী এখানে জড়ো হয়েছিলাম এদের দেখে একটা কৌতূহল সবার চক্ষে লক্ষ্য করেই এদের কথা উল্লেখ করলাম। না হলে পথের মাঝে মাঝে এভাবের যাত্রী সবাই দেখে যারাই এপথে যায়।

এরাজ্যের যত বাহক, কাণ্ডিওয়ালা, ডাণ্ডিওয়ালা আবার ঝাপানওয়ালা এরা যাত্রীদের পরম বন্ধু। এমন সরল, অল্প কথার মানুষ, সত্যাশ্রয়ী, অকপট, নির্লোভ মানুষ আমরা আমাদের দেশভুঁয়ে দেখতে পাইনা বললে মিথ্যা বলা হবে, খুব কমই দেখতে পাই বললে ঠিক হয়। হরিদ্বারের পর হৃষীকেশে এদের একটা বড় দল থাকে, আগেই

বোলেছি। দেবপ্রয়াগেও থাকে আবার রুদ্রপ্রয়াগেতো থাকেই, মোটের উপর মধ্য পথে অনেক স্থানে তাদের পাওয়া যায়। যাত্রীদের প্রয়োজন মতই যেখানে যেখানে উঁচু চড়াই অনেক দূর, সম্ভবতঃ সেইখানেই এদের পাওয়া যায়। এরা ভারি চমৎকার মনস্তত্ববিদের মত হিসাব করে নিয়েছে যে, যাত্রীদের মধ্যে একশ্রেণীর শ্রমকাতর লোক আছে তারা প্রথমে হাঁটার দলে থাকে, তারপর অল্প দু পাঁচ দশমাইলের পর খানিক চড়াই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই এরা তারক ব্রহ্মরূপেই মূর্ত্তিমান হয়,—আর সেই যাত্রী পথের মাঝে এই ভাবের অপ্রত্যাশিত ভাবে বাহন পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যান।

যাই হোক আজ আমরা প্রভাতেই ব্যাসঘাট থেকে রওনা হলাম। সোজা সরল পথ পাঁচ মাইলের মাথায় উমারস্থ চটিতে আশ্রয় নিয়ে স্নানাদি ভোজন তারপর বিশ্রামান্তে আবার চলতে আরম্ভ করলাম সুন্দর পথ দিয়ে। এপথে পা দিলেই আর ধীরে ধীরে চলবার ইচ্ছা হয় না, পা আপনিই দ্রুত চলতে থাকে। চার মাইল পথ প্রায় দেড় ঘণ্টায় মেরে দেওয়া গেল। প্রায় পাঁচটার সময়েই আমরা দেবপ্রয়াগ নগরের দৃশ্য সামনেই পেয়ে গেলাম দেখতে।

এদের কাছে আরও একটি কথা শুনলাম,—ডাণ্ডি কাণ্ডি আর ঝাঁপান, সব দেশের যাত্রীরাই ব্যবহার করে তবে বাঙ্গালীর দলই বেশী ব্যবহার করে। আর মেয়েরাই নাকি খুব বেশী ব্যবহার করে।

নয় মাইলের মাথায় দেবপ্রয়াগ। এ পথে এইটি প্রথম প্রসিদ্ধ প্রয়াগ। অপরূপ দৃশ্যের মধ্যেই গ্রামখানি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি আশ্রম। অনেক পাণ্ডাদেরও মকান আছে। এইখানেই বদরীনারায়ণের পাণ্ডাদের ঘর, শীতাবাস বললেই ঠিক হয়। একটি অফিস অর্থাৎ রাজ সরকারের কাছারী আছে যেখানে রাজ তত্ত্বাবধানেই পাণ্ডাদের নিয়োগ, যথা সময় তাদের মন্দিরের কাজে যাত্রা তারপর যাত্রী ও পাণ্ডাদের যা কিছু নানা কথে তাদের দরকারী যত কিছু বিবরণ এখানেই পাওয়া যায়। সঙ্গমের খানিক তফাতে পুলটি, ঠিক লছমণঝুলার মতই দীর্ঘ আর প্রায় অতটা উচ্চে, জল থেকে প্রায় চল্লিশ ফিটের উপরে পুলটি।

সামান্য না হলেও হরিদ্বার থেকে প্রায় আটান্ন মাইল মাত্র এসে এই হিমালয়ের একখানি বড় গ্রাম বা ছোট নগর দেখলাম। নদী থেকে অনেকটাই উঁচুতে দেবপ্রয়াগ নগর। টেলীগ্রাফ, পোষ্ট অফিস, হাঁসপাতাল, কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা তা ছাড়া চটি, দোকান, বাজার এখানে সবই আছে। এখানে আরও একটি সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এখানকার প্রধান দেবতা রঘুনাথ, চমৎকার একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। সেই রঘুনাথের নামেই রঘুনাথ কীর্ত্তি মহাবিদ্যালয় নামে এই শিক্ষা বা বিদ্যাপীঠ।

বৃন্দাবনে প্রেম মহাবিদ্যালয় দেখেছিলাম এখানে ঐ রঘুনাথ মহাবিদ্যালয়। টিহ্রীরাজ-বংশীয় প্রতিষ্ঠান বোলে এর আভিজাত্যও কম নয়। তবে এখানে শাস্ত্র আলোচনার ব্যবস্থাও আছে ;—আরও আছে অনেকগুলি সাধু বা সাধকের আশ্রম।

এখানে আমরা গঙ্গার তীরে তীরে দুটি রাস্তা দেখলাম। গঙ্গার নামও এখান থেকে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল,—ভাগীরথী, যার সঙ্গে ভগীরথের সম্বন্ধ কারণ ঐ মহাত্মাই গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে এখানে এনেছিলেন তপস্যার জোরে, সগরবংশ উদ্ধারের জন্য। মুণ্ডনাদির পর সঙ্গমের উপরেই পিতৃ পিতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করাই নিয়ম। আমার এখনও বাবা রয়েছেন কাজেই অনধিকার। দেখতে বেশ লাগে, মুণ্ডিত মস্তক যাত্রী এক দল শ্রাদ্ধে বসেছেন। আটার পিণ্ডদান—আর গঙ্গার জল আর যতকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য —এই পর্য্যন্তই কথা। সেই ভাগীরথীর স্রোত ধরে সে পথ আমাদের বাঁদিকে, বরাবর চলে গিয়াছে, একেবারে গঙ্গোত্তরীর পথের শেষ গঙ্গা মন্দির পর্য্যন্ত। আর দক্ষিণে যে স্রোত তার নাম এখন থেকেই অলকনন্দা হয়ে গেল। অলকনন্দাও গঙ্গার অপর নাম। মোট কথা, এই রাজ্যে যতগুলি ধারা বা প্রবাহ আছে সকল গুলিই গঙ্গা, তবে স্থান বিশেষে ঐ নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনটি দুধ গঙ্গা, কোনটি পাতাল গঙ্গা, কোনটি হনুমান গঙ্গা, কোনটি কালী গঙ্গা কোনটি ধৌলী গঙ্গা এই ভাবের নাম হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে যমুনা আর পূর্ব্বদিক প্রান্তে অলকানন্দা এই দুই মহাপ্রাচীন মূল ধারার মধ্যে যতগুলি ধারা, ছোট বড় যত যত প্রবাহ, সারা উত্তরে হিমালয়ের গিরীসঙ্কটের রেখা আর দক্ষিণে অলকনন্দা,—বিশালক্ষেত্রই স্বর্গ বোলে অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ। আগে, অর্থাৎ ভারতের ইতিহাস যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তার পূর্ব্বে পৌরাণিক কালে এ সকল স্থানে সুর রাজ্য ছিল। বিশেষতঃ এক সময়ে দক্ষ প্রজাপতির অধিকারই সমগ্র মধ্য হিমালয়ের ভূ-ভাগে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার উপর-ভাগ দেব বা স্বর্গরাজ্য, সেটা গ্রেট হিমালয়ান্ রেঞ্জের সবটাই বুঝতে হবে। পুরাণের মধ্যে এই হিমালয় সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। অসুর রাজ্যগুলি সমতল ভূমি সংশ্লিষ্ট হিমালয়ের তরাই গুলিতে অবস্থিত ছিল। সেই অসুরগণ একবার নয় অনেকবারই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ এবং বিধ্বস্ত করেছিল এবং প্রত্যেক বারই দীর্ঘকাল যুদ্ধ এবং বিগ্রহের পর স্বর্গরাজ্য দেবতাদের পুনরাধিকার করতে হয়েছে। এই দেবাসুরের যুদ্ধে অনেক সমতলবাসী রাজারাও দেবপক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে আছে, উত্তর হিমালয়ে ও তিব্বতের স্থানে স্থানে।

এই দেবপ্রয়াগই প্রথম প্রয়াগ এখানে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গাতীরেই এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে যজ্ঞ হয়েছিল, পাণ্ডারা স্থানটি দেখিয়েই খালাস। কিন্তু, কোন মান্ধাতার আমলে সে যজ্ঞ হয়েছিল, তাঁর কোন চিহ্ন যদি থাকে। একটি উঁচু ঢিবি

দেখিয়ে বলে এটা বেদী, আর ঐ গঙ্গার ধারেই জলাশয়টি হোল কুণ্ড। হরিদ্বারেও ব্রহ্মকুণ্ড আছে—সেখানেও ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা। যাই হোক আমাদের দেখা শুনা সব কিছু প্রথম দিনেই হোলো। রামপ্রসাদ, আমার বিহারী সঙ্গী, সে স্নান কোরলে না। বলে স্পর্শ করলেই হোলো, কোন মন্দিরেও গেল না, বললে,—হামকো মানা ভৈল। আমরা কমলীবালার ধর্ম্মশালায় ছিলাম যদিও তখন সেখানে আরও কিছু যাত্রী ছিল কিন্তু খুব বেশী নয়। কারণ, এখানে ধর্ম্মশালা তিন চারিটি,—তা ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের বেশীর ভাগ চটিতেই থাকে কারণ,—দোকানদারেরা প্রথমেই তাদের দোকানের খরিদ্দার হিসাবেই একটু আদর আপ্যায়ন বেশী করে ডেকে নেয়।

ঐ চটিতে সওদা করতে গিয়ে আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের দুজন যাত্রীর সঙ্গে দেখা, তারাও যাচ্চেন কেদার বদরী। একজন প্রৌঢ় অপরজন যুবা,—জেঠা ও ভাস্তা বা ভাইপো। এই সুদূর তীর্থে একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে আর একজন বাঙ্গালীর যেই দেখা অমনি এক আত্মীয় মিলনের আনন্দ, তার পর পরিচয়ের পালা। পিতৃ পিতামহের নাম, ধাম, গাঁই, গোত্র সব কিছুই হোলো। এঁরা বেগের গাঙ্গুলী। বেশ তেজীয়ান বেঁটে খাটো-মানুষ ঐ জেঠামশাইটি। আমায় বললেন," চলেন,

আমাগোর সাথে, একত্রই যাওয়া যাক। যুবারও ইচ্ছাটা তাই। তাঁরা বদরীনারায়ণ থেকে মানাপাস দিয়ে কৈলাস মানসরোবরে যাবেন, আরও সেই জন্যই সঙ্গীর দরকার। আমার তখন ওদিকে যাবার কথা মনেই হয়নি। তা ছাড়া, বদরীনারায়ণ দেখবার পর আবার কোথাও যাওয়া বা বদরীর উত্তরে আরও কিছু আছে এ ধারণাই আমার ছিল না। তখন নারায়ণই পূর্ণ করে আছেন আমার অন্তর ক্ষেত্র, আমার মনে অন্য সংকল্পই ছিল না। কাজেই আমার অমতটা তাঁদের মনোমত হোল না। আমাদের কথাবার্ত্তা চলছিল এমন সময়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবতী বিধবা, প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স, কয়েকজনের সঙ্গে স্নান করে এসে দাঁড়ালো সেথায়, এবং জেঠাকে সম্বোধন করে কি বললে। মেয়েটির কাপড় পরার ধরণ ঐ পূর্ব্ববঙ্গের মতই, বেশ ফেরতা দেওয়া। মাথায় সিন্দুর চিহ্ন নাই আর সরু নরুন পাড়ের ধুতি দেখেই বিধবা সাব্যস্ত করেছিলাম। অবশ্য আমার অনুমান ঠিকই হয়েছিল। জেঠামশাই নিজেই পরিচয় দিলেন, আমার কন্যা, ঐ একমাত্র সন্তান আমার ; —আজ দুই বৎসর বিধবা হয়েছে, একটি ছয় বৎসরের পোলা নিয়ে আমার কাছেই আছে। আমি তীর্থে যাচ্চি, বলে, বাবা আমিও যাবো। তাই বলি, চল মা, ভগবান যখন তোমায় সংসার থেকে বঞ্চিত করলেন,—তখন তীর্থ ধর্ম্মের ফলটুকুতে আর বঞ্চিত করবো কেন? তাই সঙ্গেই আনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটি? সে তার দিদিমার কাছেই আছে,—তাঁর বাতব্যাধি, তিনি অশক্ত, এতদূরে তাকে তো আনা যায় না। —এতটা পথ, পায়ে হাঁটার ব্যাপার, দুই তিনশত মাইল ;—না কি ব্রজেন্দ্র? বোলে ভাইপোর সমর্থন চাইলেন, সে বোললে, হুঃ তাইতো।

৩

রাণীবাগ—শ্রীনগর—ছানটিখাল—রুদ্রপ্রয়াগ—৩৬॥০ মাইল

চমৎকার লাগলো, পিতা পুত্রী, এই কঠিন হিমালয়ের পথে হেটে তীর্থগুলি তখন ভ্রমণ করতে বেরিয়েচে। আমার মনে তখন ইচ্ছা হোয়েছিলো এদের সঙ্গে থাকতে। কিন্তু দুইটি কারণে সম্ভব হোলো না। প্রথম কারণ, সবাই এরা পাণ্ডার খাতায় নাম লিখিয়েছে,—ছাড়াছাড়ি নেই,—তার অধিনে থাকতেই হবে শেষ পর্য্যন্ত। তার পর এদের দলে অনেক লোক, মেয়ে ছেলেরা, বুড়ো বুড়ি সব মিলে ধীরে ধীরে বিলম্বিত গতিতে চলবে ;—আমরা স্বাধীন ভাবে যাবো, ইচ্ছা মত থাকবো ; যেখানে ভাল লাগলো সেখানে দুই একদিন রয়ে গেলাম, এই ভাব। কাজেই তাদের সঙ্গ আমার ঘটে উঠলো না। পথে আরও একবার দেখা হয়েছিল এই ব্রজেন্দ্র ও তার জেঠামশায়ের

সঙ্গে, সে কথা পরে। এখন আমরা আজ এখানে রাত্র যাপন করে পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করলাম অলকনন্দার তীরে তীরে, রাণীবাগের উদ্দেশ্যে।

আট মাইলের কিছু বেশী। চড়াই আছে বেশ খানিকটা, আনন্দও কম নয়। যেদিকে ফিরাই আঁখি, শ্যামল মুরতি দেখি;—আমাকে যেন আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। এ পথে টেলীগ্রাফের পোষ্ট বরাবরই আছে। এক একটা পোষ্ট উপরে তারের রেখা এ পাহাড় থেকে সেই দূরের এক পাহাড়ের উপর উঠেছে দেখা যাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। এই চড়াইয়ের শেষেই রাণীবাগ। চটিতে উঠে আমরা স্নান, ভোজন ও বিশ্রাম করে আবার চলতে আরম্ভ করলাম আজই শ্রীনগরে পৌঁছাতেই হবে।

পুরাণ বা ঐতিহাসিক কাহিনীর কোন ঋষী, মুনি, রাজা, রাজর্ষী, তাঁরা ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর যেদিককার অধিবাসীই হন না কেন এই হিমালয়ের কোন না কোনও স্থানে তাঁদের স্মৃতি হিসাবে একটি করে স্থান চিহ্নিত করা আছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এরা তো স্বর্গ রাজ্যেরই, আর ব্যাস বাল্মীকি, জহ্নু প্রভৃতি মুনিদের তো থাকবারই কথা ;—বিদেহ রাজ জনকেরও এখানে এক আশ্রম স্থান আছে। বোলেছি দেবপ্রয়াগ থেকে প্রথমে আমরা স্নান, পান—ভোজন সমাধা করে আবার রাণীবাগ যাত্রা করি। রাণীবাগের পর কোলটা একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম, পথের ধারেই প্রজারা থাকে। কৃষিক্ষেত্রাদি পেরিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল এসে জিনাসু বোলে এক গ্রাম পাওয়া গেল। এই খানেই নাকি জনকরাজার আশ্রম ছিল ;—তিনি এখানে তপস্যা করেছিলেন। অবশ্য চিহ্ন হিসাবে কোন স্থান বা বেদী বা একটু মন্দিরের আকার, কিছু কিছু আছেই। তবে কয়েকটি কুটির বাসী সাধু আছেন এখনকার দিনে তারাই জীবিত এবং জাগ্রত জনক বললে দোষ হবে না। যাত্রীরা কিছু দিয়ে যায় এ তাঁরা চান, না হলে এখানে তাঁরা বড় বড় ধার্ম্মিক, সেঠ, ধনপতিদের উপরেই নির্ভর করে থাকেন,—সেটা বারো মাসের বরাদ্দ। এঁদের মধ্যে এক স্থানে একটি বাঙ্গালী সাধুও দেখেছিলাম। কথায় বার্ত্তায় ধরবার যো নেই যে তিনি বাঙ্গালী। আমার ভাগ্যক্রমে, চিনতে পেরে একজন পরিচয় দিলেন তাই জানলাম।

এখান থেকে প্রায় চার মাইল উৎরাই চড়াইয়ের উপর বিল্ব-কেদার নামে শিব মন্দির আছে। এখানে অবশ্য বারোমাসের শিব উপাসনা তো আছেই, বেশীভাগ শিবচতুর্দ্দশীর সময় মেলা ধূমধাম হয় শুনলাম ; তখন দূর দূরান্তরের পার্ব্বত্য গ্রামবাসীরা এসে পূজা দেয়। এ গেল বিল্বকেদার শিবের কথা।—কিন্তু এখানে এক প্রবাহিনী, তার নাম ভিলান গঙ্গা এই অলকনন্দার সঙ্গে সঙ্গমে মিলেছে সুতরাং এক প্রয়াগেরও সৃষ্টি হয়েছে,—আবার তার নামও একটা হয়েছে, সেটি হোলো ঢুণ্ডপ্রয়াগ। তবে এ প্রয়াগে মাথা

মুড়াখার প্রথা নেই অথবা অন্যান্য পঞ্চ বা সপ্তপ্রয়াগের মত পাণ্ডাদের পূজা, শেষে স্পেশাল দক্ষিণান্তে তাদের শ্রীচরণে তীর্থের সুফল প্রার্থনার বালাই নেই।

এই যাত্রার মধ্যে যতগুলি গ্রাম বা নগর পেয়েছি একটি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য বোঝে এই শ্রীনগর সবার বড় এবং নগর নামের যোগ্য। কারণ এখানে অনেক ইমারৎ সরকারী আফিসাদি ফ্যাসানেবল দুই এক খানি বাড়িও আছে। এখন বৃটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী। পুরানো রাজ প্রাসাদ দেখবার জিনিষ। সেই প্রাচীন কালের প্রাসাদ, সেপাই সান্ত্রীর সংস্থান, দরবার প্রভৃতি সব কিছুই আছে ;—নাই কেবল একটা উন্নতি মুখী গতি। তার কারণ, কীর্ত্তি নগর। এই অংশ বৃটিশ অধিকারের পর গাড়োয়াল রাজ্যের নরপতি, এখন তাঁর শ্রীনগরের উপর টান থাকার কথা নয়, নূতন আকর্ষণ কীর্ত্তিনগরেরই উপর তাঁর প্রীতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। টিরী নগরই আসলে গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী,—গঙ্গোত্তরীর পথে দেবপ্রয়াগ থেকে চৌত্রিশ মাইলের মাথায় ভাগীরথী, আর ভিলাঙ্গনা নামে এক প্রবাহিনীর সঙ্গমের উপর ঐ প্রাচীন নগরটি, মহারাজ সুদর্শন সা কর্ত্তৃক স্থাপিত। তারও বহুপূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে মহারাজ অনঙ্গ পাল কর্ত্তৃক যখন এই গাড়োয়াল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন শ্রীনগরেই প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। তার পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে টিরীতে দ্বিতীয় রাজধানীটি, টিরী গাড়োয়াল নামেই স্থাপন করেছিলেন। এই দ্বিতীয় রাজধানীর উপর তাঁর দরদ ছিল বেশী, সে প্রায় একশো ত্রিশ বছরের কথা। তখন থেকেই এই শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠা কম হতে লাগলো। তারপর গত ১৯ শতাব্দীর শেষে ১৮৯৬ সালে মহারাজ কীর্ত্তিসা, ঐ টিরী নগরের ত্রিশ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে নির্ব্বাচিত স্থানে অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্পদের মাঝে ঐ কীর্ত্তিনগর স্থাপনা করেন। শ্রীনগরের প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে ঐ নগরটি অবস্থিত। এই রাজবংশের কারো কারো নিজ নামে নগর প্রতিষ্ঠার মোহ একটা বরাবরই আছে। বর্ত্তমান এই গাড়োয়াল নরপতি মহারাজা নরেন্দ্র সা, তিনিও নিজ নামে হৃষীকেশের কাছেই বনময় পর্ব্বত মধ্যে এক নগরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেটা লছমনঝুলায় আসবার পথের নিকটেই। বেশী ভাগ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই ঐখানকার অধিবাসী। এমন কিছু দ্রষ্টব্য স্থানও নয় তবে মহারাজের একটি প্রসাদের ক্ষুদ্র সংস্করণ সেখানকার বৈশিষ্ট্য, পর্ব্বতশীর্ষে দেখেছিলাম মুনিকি রৈতির ভিতর দিয়ে আসবার সময়, তা আগেই বলেছি। যাই হোক এখন এই গাড়োয়াল রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যাকিছু ঐ প্রাচীন হিমালয়স্থ তীর্থ স্থানগুলি নিয়েই যা সাড়ে চার হাজার স্কয়ার মাইল পরিধির মধ্যে, আর—আসল লোকসংখ্যা তিনলক্ষ, সাড়ে আঠারো হাজারের মত। রাজ্যে বন জঙ্গলই বেশী। কৃষিক্ষেত্র প্রায় নয়শত থেকে হাজার স্কয়ার মাইলের মধ্যে। সুতরাং বন সম্পদ আর ঐ মহৎ তীর্থ সম্পদই গাড়োয়াল রাজ্যের বৈশিষ্ট্য।

এখানে প্রাচীন একটি শিবমন্দির, তাতে আছেন কমলেশ্বর নামে শিবের লিঙ্গ মূর্ত্তি। এই মন্দির উৎপত্তির সম্বন্ধে এক রামায়ণের কাহিনী যোড়া আছে। যখন রামচন্দ্র একশো আটটি নীল পদ্ম দিয়ে শিব ও শক্তির পূজা করেছিলেন রাবণ বধের জন্য, পূজার সময় দেখা গেল একটি পদ্ম কম, সেটি পুরনের অন্য কোন উপায় না দেখে রামচন্দ্র নিজের কমল লোচনের একটি উৎপাটিত করে পূজা শেষ করবার মানসে যখন সত্যই কাজে অগ্রসর হলেন, তখন জগদম্বা রামের সামনে প্রকট হয়ে তাঁকে নিরস্ত করেন। রামচন্দ্রের সঙ্কল্প পরীক্ষার জন্য যে পদ্মটি তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন খুসী হয়ে তখন সেটি বার করে দিলেন। সেই থেকে এখানে কমলেশ্বর শিবের পূজা চলে আসচে। আশ্চর্য্য ব্যাপার, রামচন্দ্রের দেবীপূজা সেতুবন্ধের কাছে,—সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র তীরে। সময় অকাল সেই জন্য তার নাম অকাল বোধন,—সে পূজার চিহ্ন ঐ খানেই রামেশ্বর নামে বিখ্যাত প্রাচীন মন্দিরের শিব এখনও বর্ত্তমান ;—সেই ঘটনাকে এখানে এই অঞ্চলে হিমালয়ের মধ্যে এনে ফেলতে কোন দ্বিধা নেই কারো। পাণ্ডারা ও পূজারী এই গল্প শুনিয়ে নর নারী সকল যাত্রীর মনোহরণ করচে।

শ্রীনগরে মুসলমানও বেশ কিছু আছে। বৈকালে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরী করে অনেক কিছুই দেখে ফিরছিলাম। এক দরজীর দোকান, পথের ধারে।—আমার সঙ্গী রামপ্রসাদ সেও আমার সঙ্গেই বেরিয়েছিল। সঙ্গে আসতে আসতে হঠাৎ আমায়, একটু এগিয়ে যেতে বললে। আমি আসচি, বোলে সে দরজীর দোকানে ঢুকলো। আমি খানিক দূর এসে দাড়িয়ে আছি, ভাবছিলাম, তার হয়তো জামার দরকার, তাই ওখানে গেল। কাছেই একটা ভগ্ন-প্রায় মকান, তার বারান্দার কাটগুলি ঝুলচে, একতলের ঘর হা হা করচে, ভিতরে গোটা কতক ছাগল। সেই খানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করচি আর কত কি সে ভাবচি তার ঠিক নাই। সে আর আসেই না। বিরক্ত হয়ে ফিরে আবার সেই দরজির দোকানেই গেলাম আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর। গিয়ে দেখি একটি ছোট ছেলে বসে বসে যেন কাঁচি নিয়ে কি করচে, রামপ্রসাদও নেই দরজি মিঞাও নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, খলিফা গেল কোথায়? সে বলে, ভিতর ঘরমে গেয়া, এক মেহমান আয়া, খানা পাকাতে। জিজ্ঞাসা করলাম, বো মেহমান কহাঁ? সে বলে ও ভি ভিতর গেয়া।

ব্যাপার কি? রামপ্রসাদ কি শেষে দরজীর মেহমান হোলো নাকি? আমি ছেলেটিকে বললাম, ভিতরে গিয়ে মেহমানকে একবার ডেকে নিয়ে এলোতো, বলবে এক দোস্ত এসে ডাকচে। আমি বসলাম, সে চলে গেল। ফিরে এসে বললে, ও সাহেব অভি আনে নহি সেকতে। খানা পিনা, হো জায়গা তব নিকালেঙ্গে। আমি শনৈ শনৈ পা বাড়ালাম পথে। আশ্চর্য্য লাগলো। ধর্ম্মশালায় গেলাম,—মনের মধ্যে

একটা অবসাদ নিয়ে,—শুয়ে পড়লাম। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘুম ভেঙে গেল। কৈ এখনও রামপ্রসাদ এলোনা তো! আমার বাহককে জিজ্ঞাসা করলাম সে এসেছিল কিনা,—সে বললে, এসেছিল একবার; তাড়াতাড়ি এসে তার কাপড় চোপড় নিয়ে তার থালা ঘটি চাটু সব কিছু নিয়েই চলে গিয়েছে। যাবার সময় বাইরে থেকে, বাহককে বোলে গিয়েছে, হাম, আপনেই যায়েগা, কোইকো সাথ নহি যাবেগা।

অবাক! তার কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি সেই দরজীর দোকানের দিকে ছুটলাম। কি জন্য ছুটলাম তাও আমি জানি না। তখন সবে আলো জ্বালা হয়েছে। একটা ঝোলানো জুয়েল ল্যাম্প জেলেচে তারই তলায় দরজী মিস্ত্রা দোকানেই ছিল, টুলে বসে মেসিনে ব্যস্ত। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে, কৌন রামপ্রসাদ ও তো মুসলমান, গুলাম হানিফ্ এলেমদার আদমী, গোরক্ষপুর রহনেবালা; ইধার আয়া, অব ইয়ে পাহাড়কো সফরমে। গোস্ খানেকো বাস্তে হমারে ইঁহা আয়াথা আজ পাঁচ সাত রোজ গোস্ খায়া নহি, চলে কৈসে?

আঘাতের উপর আঘাত পেয়েই এখন বুঝলাম, সে কেন কোন সঙ্গমেই স্নান করেনি কোন মন্দিরে তাকে প্রবেশ করতে দেখিনি, কেন এমনধারা আড়ো আড়ো, ছাড়ো ছাড়ো, ভাব ছিল তার। কিন্তু তার সুকণ্ঠ ভজন সঙ্গীতেও তার কেরামতি কম ছিল না। তাজ্জব ব্যাপার। আবার হৃষীকেশে সাধু সেজে কিছু দান গ্রহণ, সব মিলিয়ে স্বীকার করতে হোলো যে নিশ্চয়ই চালাক ছোকরা,—চমৎকার সংযোগ বটে। তবে তার উপর আমার যে একটা আকর্ষণ জন্মেছিল সেইটাই এখন আঘাত বা বেদনা হয়ে স্মৃতির মধ্যে ধরা রইলো। মনে হোলো, একটা হিন্দুর ছেলে মুসলমান সেজে পারতো কি এমন ভাবে চলতে? বোধ হয় পারতো না। কেন পারতো না, এ একটা প্রশ্ন আমার মধ্যে তখন থেকেই রয়েচে। মুসলমান হিন্দু সেজে ভিক্ষা করতে ফয়জাবাদ ও খাস অযোধ্যাতেও দেখেছি। রামাওরাৎ সাধুর মত কপালে ফোঁটা কাটা গোঁফের সবটাই কামানো কেবল গাছ কয়েক চুল মুখের বা ঠোঁটের দুদিকে রাখা যা লোকের নজরে সহজেই পড়ে না। রামসীতা বা রামলক্ষ্মণ বা হনুমান মন্দিরেতো ঢুকতে পায় না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে তিন চারজন মিলে, যেই যাত্রীরা মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসে অমনি আক্রমণ করে। জবরদস্তিও করে, অনেক দূর অবধি ধাওয়া করে যাত্রীদের। এতে তাদের ধর্ম্মের হানী হয় না। পশ্চিমাঞ্চলের মুসল ও বাঙলার মুসলের মূল পার্থক্য তাদের ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে বাঙলার শতকরা নিরানব্বই জন ধর্ম্মান্তরীত হিন্দু, এ যারা মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু গোঁড়ামিতে বাঙলা পশ্চিমকে পরাজিত অনেককালই করেছে।

বাঙ্গালায় দেখেছি যখন কোন প্রকারেই আর ভেদরাখা সম্ভব হয় না তখন উলটো কলাপাতে ভাত খেয়ে পার্থক্য রক্ষা করে। এখানে কিন্তু এরা পার্থক্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে না। অন্ততঃ এক সময় থাকত না।

শেষ কথা এই শ্রীনগরটির মহিমা এই যে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের মধ্যে গঙ্গার পবিত্র উপত্যকার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন নগরটি আমাদের যাত্রা পথে একটি পরম আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল।

আমার এখন সঙ্গী রইলো এই বাহক। এ ব্যক্তি রুদ্র প্রয়াগ পর্য্যন্তই যাবে। তবুও এ আঠারো মাইলের সঙ্গ। অবশ্য সঙ্গী চাইলে শত শত না হোক দশ বিশজন পাওয়া যায়। রোজই দেখি কোন পড়াওতে এক দল আছেই তার মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশের যাত্রীরও অভাব নেই। সঙ্গ হিসাবে অনেক পাওয়া যেতে পারতো। কিন্তু স্রধুই সঙ্গের জন্য আমি কাকেও চাইনি। দেশের সঙ্গী যদি থাকে তাহলে কথা পাঁচ মিনিটের জন্যও বন্ধ থাকবে না, অবিরাম, অকারণ, অনাবশ্যক বাক্য বিন্যাস একটা মহা অশান্তির কারণ। তা ছাড়া একলা পথ চলার স্থখে আমি অভিজ্ঞ। নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যাওয়া,—নিজ চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলার সে আনন্দ তা কাকে বুঝাবো, বুঝবেই বা কে? হয়তো গর্ব্বিত অথবা মূর্খ-দাম্ভিক ভাববে আমাকে। তা ভাবুক, কিন্তু আমি এটা ছাড়তে প্রস্তুত নই বা দল বেঁধে যাওয়ার পক্ষপাতি হতে পারিনি। তবে একথা সত্য এই দৃশ্যময় হিমালয়ের পথে এসে দাঁড়ালে একজন বাচাল-মানুষও স্থির ধীর সৌন্দর্য্য উপাসক হয়ে যাবেন।

ভোরের বেলাই আমরা রওনা হয়ে গেলাম। চড়াই, প্রথমে কম, তারপর ক্রমে ক্রমে তার বিস্তৃতি। বাঁকের পর বাঁক বাড়তে লাগলো, এক মাইল, দু মাইল করে তিনটি মাইল চড়াই উঠে বহুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা আরম্ভ। চার মাইল পেরিয়ে শুক্রাতা। এখানে কিছু জলযোগ করে আবার হাঁটা। নানা দৃশ্যের মধ্যে আমরা আজ এই কঠিন চড়াইয়ের সব টুকু শেষ করে বেলা প্রায় একটার সময় নয় মাইলের মাথায় ছটিখাল পর্ব্বৎ শীর্ষে ডাক বাঙ্গলার বারান্দায় আশ্রয় নিলাম। একটু নীচের দিকে চটি ছিল,—কিন্তু চটির অবস্থা দেখে সেখানে থাকবার উৎসাহ রইল না। আজ এখানে রাত্রেও থাকবো যখন এই স্থানটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সরকারি ডাক বাঙ্গলা যেখানে যেখানেই আছে সেখান থেকে যে দিকেই দেখা যায় সে দৃশ্য মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। ছবি আঁকবার সরঞ্জাম সঙ্গে থাকলে এই ডাক বাঙ্গলা আশ্রয় করে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট কাজ করা যায়; দুঃখের মধ্যে কাগজে আর শিশার পেন্সিলে যা সম্ভব সেইটুকু করেই মনকে আমার প্রবোধ দিতে হয়েছে। এখানকার এরা পর্ব্বত শৃঙ্গকে খাল বলে। এই খাল থেকে তিন দিকের দৃশ্য আমাদের প্রাণে শক্তি যোগান দিয়েছিল।

আমরা পৌঁছাবার পরই সেপাইয়ের পোষাকে এক ঘোড়-সওয়ার এলেন আর তার পিছনেই ডাণ্ডিতে এক দুর্ব্বল শরীর গৌরবর্ণ কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হবেন, এসে পৌঁছালেন। ডাক বাঙ্গলার চাপরাশী আমাকে তখন বলে কি—আপলোককো আভি তো নীচে যানা পড়েগা-ই, সাহেব লোগ আপকো ইঁহা রহনে নহি দেঙ্গে।

কোন মতেই নড়বার ইচ্ছা আমার ছিলনা,—বললাম, অব্ তোম চুপরহো জি, পিছে দেখা যায় গা। তারপর দেখতে দেখতে পাঁচ ছয় কুলীর বোঝা এসে পড়লো, ছুটি খালের ডাক বাঙ্গলা গুলজার হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

আমি গুটি গুটি গিয়ে সেই সম্ভ্রান্ত মূর্ত্তির কাছে সবিনয়ে তখনকার রাজ ভাষায় নিবেদন করলাম যে, বাঁরান্দায় আমার মত একজন থাকলে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে কি? আমায় কোন কথা না বোলে, তিনি সেই সৈনিকের দিকে লক্ষ্য করে তীব্র চেরা গলায় ডাকলেন, অ কেশব, এই দেখো, ইনি আবার কি বলেন।

ওমা! ইনি বাঙ্গালী,—মনে বড়ো আশা আনন্দ এমন কি এক উত্তেজনা এসে গেল। কেশব এলেন, কি বলছেন, বোলে দাঁড়িয়ে যেতেই আমি, আমার কথাটা আবার বললাম। কেশব বললেন, একথা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন, আপনি বারান্দায়ই বা থাকবেন কেন, আমাদের সঙ্গে ঘরেই থাকবেন। দু খানা ঘর তো। যদিও আমার মা আছেন, এখনই তার ডাণ্ডি আসবে, তা হোক। আপনি কি করেন? আমার উপজিবীকার কথা শুনে ভারি খুসী হয়ে, বোললেন, বেশ হবে, আনন্দে থাকা যাবে। ইতি মধ্যে মা এলেন। বর্ষিয়সী হলেও যেন রাজেশ্বরী, কি সদানন্দময়ী মূর্ত্তি। এঁরা কলকাতার লোক, ঝামাপুকুরের মিত্র বংশীয় এর বেশী আর পরিচয় দরকার ছিল না।

নাম কি আপনার? কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শুনেই জোড় হাতে, ব্রাহ্মণ? বোলেই নমস্কার করলেন, কেশব কিন্তু নিজ সম্ভ্রম চমৎকার রক্ষা করলেন মালপত্র ঠিক এসেছে কিনা তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করে। যাই হোক আমার, এবার রন্ধনের ব্যবস্থায় আর মাথা ঘামাতে হোলো না কেশব বললেন, আমাদের সব ব্যবস্থাই যখন আছে তখন আপনি আবার কেন হাত পোড়াতে গেলেন। আপনি আপনার কাজ করুন, ঠিক সময়ে খবর দেবো। সঙ্গে তাদের বামন চাকর সবই ছিল, তা ছাড়া স্থানীয় জমাদার অনেক কিছু ব্যবস্থা করে দিলে। প্রথমে চা, তার সঙ্গে রুটি টোষ্ট মাখন, সন্দেশ প্রভৃতি হোলো, তারপর তিনটা নাগাদ অন্ন ব্যঞ্জন, দধি প্রভৃতি বেশ পরিতোষ ভোজন। তারপর খানিক বিশ্রাম, শেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত পথের উপর খানিক ঘোরা ফেরা হোলো কয়েকখানি স্কেচও করলাম মন দিয়ে। রাত্রে আমরা সবাই একত্র বোসে গল্প গুজবে খানিক কাটালাম। কেশব শ্রীনগরের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। শিকারের

কথা হলো, সঙ্গে রাইফেল ছিল :—বলাই বাহুল্য সখের শিকার একটি পাখীর ঝাঁকে গুলি মারার উপর আর কিছু নয়।

এই যে সঙ্গ, আমার একটু বন্ধনের কারণ ঘটবার মত যেন দেখা গেল যখন রাত্রে খেতে খেতে কেশব প্রস্তাব করলেন কাল কখন এখান থেকে যাত্রা করচেন? আমি বললাম, ভোর বেলাই তো ভালো। কেশব বললেন, এই ঠাণ্ডায় এত ভোরে কেন, বেলায়, চা টা খেয়েই ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। আমি বললাম, কাল সকাল সকাল রুদ্র প্রয়াগে পৌছে যদি পারি দুটো নাগাদ ওখান থেকে কেদারের পথে পাড়ি দিতে হবে; অন্ততঃ সেই চেষ্টাই করতে হবে আমায়। শুনে কেশব তবুও বললেন, অত তাড়াতাড়ি কেন, না হয় কাল থেকেই যাবেন ওখানে এমন সুন্দর স্থান, রুদ্র প্রয়াগে থাকবার যায়গার অভাব হবে না। অর্থাৎ তাঁরাও কাল যখন ঐখানে রাত্রবাস করবেন তখন আমার ওদের সঙ্গেই থাকার কথাটাই হোলো আসল। সুবিধার বিষয় এই যে এঁরা আগে বদরীকাশ্রমের পথেই যাবেন, পরে ফিরবেন কেদার হোয়ে। কিন্তু নানা কৌশলেও এড়াতে পারলাম না, তিনি নিমন্ত্রণ করে বসলেন কালকে সারা দিন রাতের সঙ্গে থাকা আহারাদির ব্যাপারেও। যাই হোক সেই রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করা গেল।

এখানে শীত ছিল। রাত্রে কম্বল ব্যবহার করতে হয়েছিল আর সকালে গরম কাপড়। রুদ্র প্রয়াগের পথে আমরা যাত্রা করলাম বেলা আটটা নাগাদ,—উৎরাই প্রায় সারা পথটাই। কেশব ঘোড়ায় গেলেন না, আমার সঙ্গে হেঁটেই চললেন। তিনি এমন সুন্দর সংযত কথাবার্ত্তায় পথ চলতে লাগলেন আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গ ত্যাগের চিন্তাও অসম্ভব হয়ে পড়লো। দেখলাম তিনি নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, কোন্‌টি আমায় মুগ্ধ করে তাই লক্ষ্য করছিলেন। শেষে স্বামী বিবেকানন্দের কলম্বো টু আলমোড়ার কথায় আমায় মুগ্ধ করলেন। দেখলাম শিক্ষিত তিনি বটেই কারণ তা না হলে অমন উদার মন কেমন করে হবে। জমীদার চরিত্র যদি বিদ্যাহীন হয় তার ভাবই আলাদা তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে,—শিক্ষিত হলে তার ভাব যে অন্য ভাবের হয় সে পরিচয় এই কেশবের মধ্যেই পাওয়া গেল। তারপর থেকে স্বামীজির কথাতেই আমাদের কাটলো। আমরা এই নয় মাইল পথ সহজেই অতিক্রম করে বেলা এগারোটা হবে রুদ্র প্রয়াগে এসে পৌছে গেলাম।

চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতমালা, মধ্য স্থরেই পথ। আমরা এখানকার বড় ডাক বাঙলোতেই প্রথমে এলাম, কিন্তু সেটা অধিকৃত দেখলাম,—কাজেই একটি ভাল ধর্ম্মশালায় উঠতে হলো। কালী কমলিওয়ালার ধর্ম্মশালাও পছন্দ সই ছিল, কিন্তু ভীড় ছিল বেশী তাই স্থান হোলোনা, সুতরাং নূতন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখেই একস্থানে মালপত্র নামাতে

হোলো। এখন আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় তীর্থে বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাহক বাবাজি তার রান্না বান্নার যোগাড়ে গেলেন আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন এখান থেকে কেদার বদরীনারায়ণের বাহক তিনি ঠিক করে দিয়ে তবে বিদায় নেবেন। কেমন যেন তারও

একটি মায়া পড়েছিল আমার উপর, দেখলাম, সে নিজে থেকে আমার এই সুবিধাটি করে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করে দিলে যদিও এখানে কুলী পাওয়া মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।

অলকনন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমেই রুদ্রপ্রয়াগ। তিন দিকেই পর্ব্বতমালা তার বুকের উপরেই পথের রেখা, সুদূর প্রান্তে অদৃশ্য হয়েছে। মধ্যে গভীর নিচে অলকনন্দা, খরতর বেগে প্রবাহিতা, তার উত্তর দিকেই সঙ্গম; সেই সঙ্গমে স্নানই এখানকার পুণ্যকর্ম্ম। অলকনন্দার অনেকটা উপরেই পাহাড়ের কোলে মন্দির, ধর্ম্মশালা চটি ও অন্যান্য সাদা চুনকাম করা ইমারৎ যাকিছু। সেই মূল পথ থেকে পাষাণের ধাপ বরাবর নীচে গঙ্গার সৈকত, বালি ও নোড়া নুড়িতে ভরা,—কোথাও কোথাও স্তুপাকার হয়েছে,—সেই সৈকত ভূমি ছাড়িয়ে অনেকটা নীচে পর্য্যন্ত সিড়ি নেমেচে। জলস্রোত আরও কতক দূরে। সেই বিশাল সৈকত ভূমির স্থানে স্থানে প্রায় সোজা পাহাড়, পথ পর্য্যন্ত উঠেছে। আসপাশে অসংখ্য বড় বড় পাষাণ খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। বড়ই গম্ভীর দৃশ্য;—স্থানটি শিবের। এখানে রুদ্রনাথ বা রুদ্রেশ্বর শিব মন্দিরই প্রধান। লোক সমাগমও ছিল, বড় কম নয়।

এখান থেকেই কেদারের পথ মন্দাকিনী তীরে তীরে। অনেকেই এখান থেকে কেদারনাথে যাবে আর দক্ষিণ দিকে যে পথ অলকনন্দার তীরে তীরে বরাবর চলে গিয়েছে পূর্ব্ব দিকে সেটা বদরীকাশ্রমের পথ। কেদার, এখান থেকে চুয়াল্লো মাইল মাত্র। নারদের তপক্ষেত্র, এখানকার স্নান এবং মন্দিরে শিব দর্শন,—তারপর সেই বিশালতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। স্নান ভোজনের পর অনেকক্ষণ ঘোরা গেল। অনেক যাত্রী এসেছে এদিকে স্রজ্। পথটা বেশ সর গরম ছিল। পোষ্ট অফিসে গেলাম, তাড়াতাড়ি দুখানা পত্র লিখে ডাকে দেবার পর ফিরে এসে আমার সেই বাহক বন্ধুর সঙ্গে মেটাতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। তিনি এবার যে বাহক আমার জন্য ঠিক করলেন সে কেদারনাথ হয়ে বরাবর বদরীকাশ্রম এবং শেষ পর্য্যন্তই থাকবে। দু-কুড়ি টাকা তার পারিশ্রমিক আর রোজ চার আনা খোরাক। নামটি তার জাঠা বা জেঠা বা জেঠরাম। আমাদের যেমন বেচারাম কেনারাম এদের তেমনি জেঠারাম। ভারী ভাল মানুষ,—বেশ শক্ত, মাথায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, অনেকটা চেহারায় নেপালী ধরণের, খুব কমই তফাৎ দেখলাম, কেবল এর নাকটি একটু টিকল। গোঁফে দুদিকে কয়েক গাছা চুল আছে দাড়ির নাম গন্ধও নেই।

রাত্রে কেশবের সঙ্গে একত্র খাওয়া দাওয়া যখন হয় তখন একবার তিনি তাঁর সঙ্গে বদরীর পথে টানবার চেষ্টা করলেন। আমি যখন কিছুতেই প্ল্যান চেঞ্জ করলাম না—তখন তিনিও দুঃখীত হয়ে বললেন,—আমাদের প্ল্যান যে আর চেঞ্জ হবার নয় না হলে ঠিক বদল করে আমরা কেদারের দিকেই যেতাম।

ছাতোলী, সোরগড়, অগস্ত্যমুনি, চন্দ্রপুরী, ভাটোয়ালচেরী—২০ মাইল

আমি হিসাব করে দেখলাম হৃষীকেশ থেকে আজ আট দিনের মাথায় রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ করে ছাতোলীর দিকে চললাম। জেঠামশাইকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিলাম, পথ ঘাট সব জানা আছে তো? সে বলে, বহোত। রাস্তা সোজা কোন কষ্ট নেই, চমৎকার, প্রায় সমতল পথ। অপূর্ব্ব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে, পর্ব্বতের প্রায় যেন মধ্যস্থল দিয়েই পথ চলেছে, দূর নিকট সব স্থানই সমান, একটানা পর্ব্বত রাজ্য; কেবল এক একটা বাঁকের মুখেই পিছনের পথ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। প্রায় চার মাইল এলাম দেড় ঘণ্টার মধ্যে,;—জেঠা মশাই তো ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা খানেক পর ছাতোলীতে পৌছে বোঝা রেখে নিশ্বাস ফেললেন।

ছোট গ্রাম, মুদির দোকান আছে চটিও আছে, যাত্রীদের রাঁধাবাড়া করে খানিক থাকবার ব্যবস্থাও আছে। তবে ক্ষুদ্র রকমের সব কিছুই। গ্রামের পথে ছেলেরা খেলা করচে। ঘৃত ভাণ্ড ঝুলিয়ে লাঠি কাঁধে কৃষক চলেছে বোধ হয় রুদ্রপ্রয়াগ কিম্বা কোন জনবহুল গ্রামের দিকে বিক্রয়ার্থে। এই রকমই এক কৃষকের কাছ থেকে কিছু ঘি আমি নিয়েছিলাম তবে এখানে নয় আরও উপর দিকে। আমরা ছাতোলীতে কিছু জলযোগ করে সোরগড়ের দিকে পা চালালাম। এ পথে খানিক চড়াই আছে এক মাইল বোধ হয়, বেলা একটার মধ্যেই পৌছে গেলাম। জেঠা বললে, উপর মে তো ডাক বাংলা মিলি। ভয় হোলো যদি ছাল্টিখালের মত হয়। যদিও এখানে চটি, দোকান সব কিছুই থাকায় সুবিধা নীচেও ছিল তবুও ডাকবাঙ্গলার দাওয়া বা বারান্দার চমৎকার পরিবেশ, দৃশ্য দেখবার পক্ষে ডাকবাংলাই চমৎকার স্থান। জেঠাকে বললাম, তাহলে সব কিছুই তোমাকেই নীচে থেকে কিনেকেটে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। সে বললে, পরোয়া নহি। কাজেই আবার ডাক বাঙ্গলার দাওয়ায় গিয়ে উঠলাম। জমাদার বড় ভাল লোক, আর কোন অধিকারীতো ছিল না কাজেই খুবই সুবিধা হয়েছিল। যারা কেদার বদরী বেড়াতে আসবেন যদি সম্ভব হয় তা হলে যেন ডাকবাঙ্গলার সুযোগ না ছাড়েন। এই বাঙ্গলা থেকে যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে তার তুলনা নেই।

চটি যে খারাপ তা নয়। কালী কমলীয়ালার ধর্ম্মশালাও চমৎকার বিশেষতঃ মিরু-হিমালয়ের তীর্থ সম্পর্কে ধর্ম্মশালাগুলি চমৎকার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই দেখেছি তবে, এখন বেশী ভীড় বোলে বানিয়াদের চটিগুলি মাত্রেই অপরিষ্কার, যারা ব্যবহার করবে তারাই প্রেটেখুটে পরিষ্কার করে নিয়ে ব্যবহার করবে। তারপর যখন তারা চলে যাবে

তখন কর্ত্তৃপক্ষ আর সে দিকে দেখবে না,—নূতন যাত্রীদল এসে দরকার মনে করলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা তাদেরই গরজ। এই ভাবেই চটির অবস্থা হিমালয়ের মধ্যে। সেই কারণেই দেখেছি প্রাণটা ডাকবাঙ্গলার পানেই টানে। তবে পয়সাকড়ি না থাকলে,—জমাদারের অনুগ্রহের উপর, বাঙ্গলার বারান্দায় থাকাও সব সময়ে সুবিধা নয়। কোন সাহেব থাকলে তো কথাই নাই এক ধাপও ওঠা যাবে না সিঁড়ি দিয়ে বারান্দার উপর। যাই হোক আমরা এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে অগস্ত্য মুনির পথে যাত্রা করলাম।

পথ সোজা, ভালো, কিছু উৎরাই আছে চড়াই নেই বললেই হয়। অগস্ত্যমুনি দুই মাইল পথ। মন্দাকিনী থেকে দূর হলেও যেন তপোবন চারিদিকেই কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, নানারকম গাছ দেখলাম চারিদিকেই। বিশেষতঃ দূরের বনভূমি এখান থেকেই বেশ যেন ঘন হয়ে গিয়েছে, সামনে দেখা যায়। আমরা দেড় ঘণ্টার মধ্যেই অগস্ত্যমুনিতে পৌঁছে গেলাম। আর না এগিয়ে আজ এইখানেই ক্যাম্প করলাম। ভাগ্যক্রমে এক ভদ্র গাড়োয়ালবাসী ইনেস্পেক্টার অফ পুলিশ, সঙ্গে তিন চার জন প্রহরী নিয়ে ক্যাম্পে ছিলেন। বেশ আলাপ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হলো। দেও নারায়ণ নামটি তাঁর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসচি। একে তখন সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে বাঙ্গালী পড়েছে, স্বদেশী আর বন্দেমাতরম মন্ত্র সারা ভারতেই ছড়িয়েছিল। খুদিরামের ফাঁসী তো সম্প্রতি হয়ে গিয়েছে। তাই বড় ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিতে হোলো,—কিন্তু দেখলাম ফল হোলো অন্যরকম। বাঙ্গালী শুনেই একেবারে খোলাখুলী কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন। কি উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পেলে তার আলাপে। রাত্রে ভোজনের কোন প্রবন্ধ না করি, তাঁর অতিথী হবার নিমন্ত্রণ করে একেবারে আপন করে নিলেন। পূজা, জপ, ধ্যান এ সব তাঁর খুব বেশী রকমই দেখলাম। আমার জীবনে অনেক পুলিশ ইন্‌সপেক্টর দেখেছি, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীও কম ছিল না, তা ছাড়া বন্ধু বান্ধবও কম নেই কিন্তু কারো সন্ধ্যাহ্নিক বা পূজা, জপ, ধ্যান এ সবের বালাই আছে বোলে জানি না। বোধ হয় এটা স্থানের গুণ।

তখনকার পরিস্থিতিতে, রিভলিউশনারী দলের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় বাঙ্গালীই লিডিং পার্ট নিয়েছিল সেটা সর্ব্ব ভারতেরই মন্তব্য, কাজেই যাদেরই একটু দেশাত্ম বোধ আছে—তারাই বাঙ্গালীর উপর প্রসন্ন,—বাঙ্গালীর তখন বড় খাতির সর্ব্বত্রই ছিল। সুতরাং পুলিশ বিভাগের লোক হলেও তাদের বাঙ্গালীদের সঙ্গে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে, বেশ শ্রদ্ধা রেখে কথা কইতে দেখেছি। তবে আমার কথা অর্থাৎ আমার মত একজন নন-পলিটিক্যাল, শিল্পী লোকের কথা সতন্ত্র। আমার এই পরিচয়টাই সর্ব্ব দোষ হরণ

করেছিল এ ধরণের সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছে। এ কথাও শুনলাম, এই হিমালয় বৃটিশ গাড়োয়াল পুলিশের উপরেও নোটিশ জারি করা ছিল যে বাঙ্গালী দেখলে, তাদের উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়। হৃষীকেশের কথাতো আগেই বোলেছি।

ইনসপেক্টার সাহেব যেখানে ছিলেন তার অল্পদূরেই একটা জঙ্গল ছিল, নানারকমের গাছপালা। তার মধ্যে এমনই অদ্ভুত একটি গাছ দেখলাম এমন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় গাছ জীবনে দেখিনি। সাপের মতই অঙ্গ, প্রায় জড়ানো তার সকল দিকের ডালপালাও ঐ ধরণের, পাতাগুলি খেজুর পাতার মতই, তবে তীক্ষাগ্র নয়, গোল। একপিঠ সবুজ অপর পৃষ্ঠ দুধের মত সাদা কিঞ্চিৎ নীলাভ। তার কিছুদূরে বড় বড় কয়েকটি গাছের নীচে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গলেব মত। সেদিকে দেখিয়ে দেও নারায়ণজী বললেন, এখানে বাঘের নিশানা পাওয়া যায়। ছাগলটা ভেড়াটা ছোট ছোট বাছুব মাঝে মাঝে ধরে। যখন এদিক থেকে মাল নিয়ে ব্যবসায়ীরা কেদারের পথে যায়, হয়তো কাছেই তাদেব তাঁবু থাকে, তাঁবুতে কুকুরও থাকে তাদের চৌকী দেবার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐভাবে আক্রমণ করে। এদিকে আরও একটু উপরে কৃষিক্ষেত্রও আছে আবার নীচেব দিকেও আছে।

তারপর আয়ুর্ব্বেদের কথা হোলো। তিনি বললেন এই বৎসরে কথা হয়েছে এখানে একটা বিদ্যালয় করা যায় কিনা, খানিক নীচে একদিকে দেখিয়েই বোললেন, এই বৎসরেই দুই তিন জন বৈদ্যশাস্ত্রী পণ্ডিত এখানে এসে ছিলেন দেখে গিয়েছেন।

পরমানন্দে অগস্ত্যের এই তপোবনে রাত কাটিয়ে আমরা প্রভাতেব সঙ্গে অগস্ত্য মুনির মন্দিরকে প্রণাম করে, সামনের পথে যাত্রা করলাম। এবার গুপ্তকাশীই আমাদের লক্ষ্যস্থল অবশ্য মধ্যে আছে চন্দ্রপুরী চটি। দেও নারায়ণজী শুভযাত্রার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন। বিদায় ব্যাপারটি বেশ ঘনিষ্ট ভাবেরই হয়েছিল। আমি যেন কত আপন লোক এমনই তার ব্যবহার যা ভুলবার কথা নয়, নিশ্চয়ই মনে থাকবে। সঙ্গে কিছু খাবারও দিয়েছিলেন এই বোলে যে, গুপ্তকাশীর পথে চড়াই আছে, কিছু জলযোগ করে নেবেন। এই ভাবে ভগবানের দয়ায় আমরা পথে বন্ধু পেয়েছিলাম যা ভুলে যাবার কথা নয়।

পথে সুন্দর দৃশ্যে নয়ন সার্থক করতেই চললাম। আমাদের ব্যবহারে যত কিছু রং আছে দেখি এই পর্ব্বতের মাঝে সেই সকলবর্ণের সার্থকতা। সারাদিনই সকাল থেকে পরিবর্ত্তনের খেলা সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। দূর হেতু পর্ব্বতশ্রেণীর রূপের বিলাস আকাশের সঙ্গে মিলনের ফলে যেন অসীমের আভাষ জাগাতে আমাদের সামনেই বর্ত্তমান। সেইজন্যই দূরস্থ কোন দৃশ্যের এতটা মহিমা। অন্তরে অনন্তের আভাষ জাগানোই তার কাজ। পথে আমাদের চন্দ্রপুরী চটি। চার মাইলের মাথায় এমন সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান এপথে অগস্ত্য

মুনির এত কাছে যে দেখবো মনেও ভাবিনি। কতকটা এসেই একটি খর ধারা পেলাম জঙ্গলের পাশ দিয়েই সশব্দে চলেছে, নামটি তার চন্দ্রা। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হে ধারা! তুমি এই বন পর্ব্বত ভেঙ্গে এত দ্রুত কোথায় চলেছ? চন্দ্রা, বেগ তার দুর্দ্দমণীয়— তীব্রগতি সংযত না করে, চলতে চলতেই বলবে; ঐ যে, সামনেই পাহাড়ের কোলে মন্দাকিনী আমার জ্যেষ্ঠা, তারই সঙ্গে মিলতে যাচ্ছি। আমাদের এই মিলনেই প্রয়াগ

সৃষ্টি হবে তোমরা স্নান করে ধন্য হবে সে তীর্থে। এই চন্দ্রা ও মন্দাকিনী সঙ্গমেই চন্দ্রপুরী, তীর্থও বটে চটিও বটে। তাছাড়া চন্দ্রাদেবীর একটি পুরাতন ক্ষুদ্র মন্দিরও হেথায় আছে। ভেবেছিলাম এটা জঙ্গলপূর্ণ স্থান হবে। তার বদলে দেখি যেন একখানি বিশাল বাগান বাড়ি মন্দাকিনীর তীরে। চটি বলতে তিনতলা বারান্দা-ওয়ালা সাদা চুণকাম করা প্রায় সবগুলি মকান। এখানে আরও দুটি মন্দির আছে, ভীম-দেও, গদাপানি মধ্যপাণ্ডব আর শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরাম অবতার এখানকার দেবতা।

মন্দাকিনীর ওপারে বিস্তীর্ণ পর্ব্বত অঙ্গে শস্যক্ষেত্রের শোভা, এপার থেকে দেখলাম

বিশালকায় ঐ ক্রমে উর্দ্ধে অভ্রভেদী, বহুদূরে মিলিয়ে গিয়েছে, তার রূপই অপূর্ব্ব। এখানে এসে মনে হোলো এবেলাটা এমন সুন্দর স্থানে কাটালে কেমন হয়? জেঠামশাইকে প্রস্তাব করতেই তিনি এই বোলে সাবধান করে দিলেন যে, আহ্লাদে অতটা লম্ফ ঝম্ফ করা ভাল নয়, সামনেই বেশ চড়াই আছে। তাতেই বুঝলাম এখানে দীর্ঘকাল দৃশ্য উপভোগ তার মনঃপুত নয়। সুতরাং একটু জলযোগ করেই আমরা চলতে নামলাম পথে। আমার সঙ্গে জেঠার ব্যবহার অনেকটাই গার্জেনের পর্য্যায়ে পড়ে।

খানিক এসে একটি ধারা পার হয়েই চড়াই অর্থাৎ প্রথম চড়াইটি পেলাম। মাইল খানেকের উপর হবে চড়াই, কঠিন চড়াই নয় সহজ চড়াই এইটি। তারপরেই ছোট একখানি গ্রাম, তবে চটি কিনা সন্দেহ আছে। সেই ছোট গ্রামখানি পার হয়ে বনপথে খানিক উঠানামার পর ভিরি চটির চড়াই পেলাম। তারপরই আমাদের এবেলাকার আশ্রয় ভাটওয়াল চেরী, সেটা অগস্ত্যমুনি থেকে নয় মাইল, তার মধ্যে তিন মাইল চড়াই পথ। আমরা এই দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আজ মাত্র নয় মাইল এগিয়ে এসেছি কেদারনাথের দিকে। কাঁকর ভরা, পাহাড় ভাঙ্গা পাথরের টুকরায় পরিপূর্ণ শেষের পথটা, খালি পায়ে চলার সুখ যত এরকম পথে দুঃখও তত। পায়ের তলায় একটা ধারালো পাথরের টুকরা ফুটে খানিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। এখানে এক ধারায় বসে বেশ ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফালি কাপড় খানিকটা বেঁধে তবে অন্য কাজ। বেশ ফুলেছিল, একটু ভয় ছিল, এই তুচ্ছ একটা আঘাত ওবেলাকার যাত্রা বন্ধ না করে।

গুপ্তকাশী, নল, কালিকা-মঠ, মধ্য-মহেশ্বর—২৪ মাইল

ভাটওয়ালচেরী থেকে গুপ্তকাশী চার মাইল পথ, পায়েতে আঘাতের ক্ষত সত্ত্বেও সহজেই সন্ধ্যার অনেকটা পূর্ব্বেই আমরা গুপ্তকাশী পৌছে গেলাম। মধ্যে কুণ্ড চটি নামে একটি গ্রাম পার হয়ে এলাম। সেখানেও দোকান, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি যাত্রীবর্গের স্বচ্ছন্দে রাত্রবাসের ব্যবস্থা ছিল দেখেছিলাম, আবার যাত্রীও অনেকগুলি দেখলাম। তার মধ্যে বাঙ্গালী যাত্রী নর-নারীও কম নয়। যাই হোক, কুণ্ড চটির সুখকর পরিস্থিতির কথা মনেই রইলো না পরে। ঐ কুণ্ড চটি থেকে গুপ্তকাশীর পথ সবটাই বড় কঠিন চড়াই। উত্তীর্ণ হয়ে অবসন্ন শরীরে শীর্ষদেশে পৌছে গেলাম। শুভাদৃষ্ট এটা নিশ্চয় যে, ঐখান থেকেই গুপ্ত কাশীর যে দৃশ্য দেখলাম তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেলাম।

কাশী, নামটির মাহাত্ম্যই এখানে খুব বেশী কাজ করে আমাদের মধ্যে। কাশী যেমন অর্দ্ধ চন্দ্রাকার গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত এ গুপ্তকাশীও সেইরূপ প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রা

নদীর আবেষ্টনীর মধ্যে। হিন্দু মনে কাশীবিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা যেমন সংস্কারগত হয়ে আছে, শিবের ক্ষেত্র এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই একজনের মনকে প্রসারিত করে কোন অদৃশ্য লোকের দেবতা, পরম মঙ্গলময় সেই শিব, বিশ্বেশ্বরের পানে। এখানে এসে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক পবিত্র ভাবের নেশা যেন আমায় চালিত করতে লাগলো, প্রাণ আমার একটি আনন্দময় অবস্থার মধ্যে ডুবে যেতে চায়। এই ভাবটি যে গুপ্ত-কাশীর মহিমা, এ বিষয়ে মনে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। অপূর্ব্ব আনন্দময় এই অবস্থাকেই মনে মনে স্থান মাহাত্ম্য বোলেই ধরে নিয়েছিলাম।

এখান থেকে ওপারে বহুদূর পর্ব্বতের অঙ্গে উখিমঠের যে ক্ষীণ ধূসর রূপ দেখা যায় তা যিনি দেখবেন এই দৃশ্য মাহাত্ম্য তাঁরই অনুভবের বিষয়, যেহেতু একজনের দেখার বর্ণনা শুনে আর একজনের মন ভরে না। মনে মনে তখনই এক ছবি ফুটে উঠলো যেন এক সপ্তাহ পরেই কেদারনাথ থেকে ফিরে আমরা ঐ উখীমঠেই গিয়েছি; তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ হয়ে বদরীনারায়ণের পথে চামোলীতে, অলকনন্দার কোলে পড়বো তারপর।

আজ যখন আমাদের, এই পূণ্যতীর্থে, শৈবক্ষেত্রে অবস্থিতি, রাত্রবাস, সুতরাং রাত্রে আহারের আয়োজন আছে,—তাইতেই এখন লাগতে হোলো। ভোজনান্তে সুখনিদ্রা। পরদিন প্রাতে মনিকুণ্ডে স্নান হলো। এখানেও দুইটি ধারা আছে নামটি তাদের গোমুখী আর যমোত্রী। শিবের ক্ষেত্র, চন্দ্রশেখর শিব মন্দিরে দর্শন হোলো, পাণ্ডা বা পূজারী বললেন, এখানে গুপ্তদানের অশেষ ফল। এতটা ভীড় সত্ত্বেও এখানকার চটি ও ধর্ম্মশালাগুলিও যেন পবিত্রতা মাখানো, যেমন সুন্দর ঘরদ্বার তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এ পথে এত সুন্দর সুরক্ষিত আশ্রয় গৃহ আর কোথাও দেখিনি। মনের আনন্দেই সারাদিন দেখেশুনে বেড়ালাম। শীতের প্রভাবটা এখানে বেশ জানিয়ে দেয় যে আমরা হিমালয়ের উচ্চস্তরে প্রায় এসে পৌছে গিয়েছি। এযাবৎ সকল স্থানে দিনে বেশ গরম আর ভোরবেলায় গা টা শীত শীত করতো যা একখানা চাদর টেনে গায়ে দিলেই চলে যেতো কিন্তু এখানে শীত ছিল বেশ, রাত্রেও গায়ে কাপড় নিতে হয়েছিল। এদিক ওদিক যে দিক দেখ, আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল, যেন স্বাস্থ্য ও মুক্তির আগার। এখানকার আকাশ বাতাস, নগ্ন পাষাণ আর ঘন বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন বনানী সত্যসত্য ভুলিয়ে দিল আমার নাম, ধাম, গাঁই গোত্র; এমন কি আমার অস্তিত্বটাও ভুলিয়ে দেবার যোগাড়,—কিজন্য এখানে এসেছি আর পরে কোথায়ই বা যাবো। এর পর আর কথা নেই। তবে এইটুকু বলে রাখি ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁরা, অপরাপর শারীরিক দুঃখ্যের প্রভাব বর্জ্জিত, মুক্ত প্রাণে এখানে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে যেন বিচার করেন যে কিগুণে এখানকার সব কিছুই আমি এতটা সুন্দর ও পবিত্র দেখেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম। গুপ্তকাশীর মাহাত্ম্য এইটিই,—তারপর শিব

মন্দিরে আরতি যারা দেখেছেন তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। এ আরতি কাশীতেও হয় কিন্তু এখানে এই নির্জ্জন হিমালয়ে তার প্রকৃতি এবং প্রভাবই আলাদা, এক অপার্থিব অস্তিত্ব যেন অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়—আমায় দৈবভাবে উন্নীত করে। প্রাচীন কীর্ত্তি দেখবার মত অনেক কিছু না থাকলেও যা আছে তার মূল্যও কম নয়। শিবের মন্দির এই হিমালয়ে অসংখ্য সবাই জানে। এখানকার চন্দ্রশেখরের যে মন্দির, বিশালকায় না হলেও প্রাচীন কীর্ত্তির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোলেই দেখলাম। এই চন্দ্রশেখর শিবের তুলনা নেই। দেখলেই এই প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে আসে, ঐ লিঙ্গরূপী দেবতাটি মহাদেব কেন? মহাদেব তো আর কেউ নয় কেবল এই দেবতাই মহাদেব নামে অভিহিত হবার যোগ্য, আর কোন দেবতার সম্পর্কে একথা বলা যায় না। আরও একটি মূর্ত্তি, এক প্রাচীন মন্দিরে স্থাপিত আছে, কতকাল থেকে আছে এরাও বলতে পারে না, সেটি অর্দ্ধ নারীশ্বর। এর সঙ্গেও ঐ মহান দেবতা শিবের ইতিবৃত্ত জড়িত। এখানেও দুধারা প্রবাহ মনিকর্ণিকা তার নাম, ঐ কুণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত যেখানে স্নান করে যাত্রীরা তৃপ্ত হয়। তার মধ্যেও শিল্পকীর্ত্তি বর্ত্তমান।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে কেদারনাথ তুষার শৃঙ্গটি দেখা যায়। তারপর দেখা যায় সামনেই শ্রেণীবদ্ধ ঐ দেওদারের রূপ, উপর দিকে সারি সারি, দেব মহিমা প্রচারের জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। এইখান থেকেই হিমালয়ের উচ্চ স্তরের ঐশ্বর্য্য, আমাদের সারা পথ উৎসাহ বাড়িয়েছে আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছে, একথা একটুও অতি ভাষণ দুষ্ট নয়। কি জানি কেন ঐ দেওদার গাছটির উপর আমার মোহ আছে, বিশেষ রূপেই আছে,—সত্যই। তাছাড়া আমার আরও মনে হয় উদ্ভিদ রাজ্যে ঐ গাছটিই শিব বা মহাদেবের প্রতীক অথবা সমপর্য্যায়ের। অবাক হয়ে যেতে হয় ঐ গাছটির পানে তাকালে তার ঐ অপরূপ আকার দেখে, জটাজুটধারী মহাত্যাগী বিশালকায়, যোগীবর আপন আসনে সমাহিত। তা ছাড়া যা কিছু, কালের মধ্যে দিয়ে হিমালয়ের এদেশে ঘটেচে, ঘটছে ও ভবিষ্যতে ঘটবে সর্ব্ব অবস্থায় সাক্ষীস্বরূপ। বৃক্ষরূপী শিব, তাই দেওদারের এতটাই মাহাত্ম্য। এইভাবে গুপ্তকাশীকে অন্তরে অন্তরে নানাভাবে গ্রহণ করে একরাত্র এখানে কাটিয়ে আমরা ধন্য হয়েছিলাম।

পরদিন আমরা নলচটির দিকে যাত্রা করি। প্রথমেই আমরা একেবারে খাড়া চড়াই পথই পেলাম গুপ্তকাশী ত্যাগ করবার পরে। যথার্থ পথের সুখ নলচটিতে যাবার পথে আর ছিল না; চড়াই উঠতে উঠতে দেড় মাইলের মাথায় নলচটি। নলচটিটা এ অঞ্চলে বিখ্যাত একটা জংসন। পৌরাণীক কাহিনীর কথায় কাজ নেই আসলে এটা একটি বড় সংযোগকেন্দ্র। এখান থেকেই একটি পথ উখীমঠ হয়ে মধ্য

হিমালয়ের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ অতিক্রম করে চামোলী বা লালসাঙ্গায় অলকনন্দা তীরে উঠেছে,—এক কথায় এই পথটাই এদিক থেকে যেমন ওদিক থেকেও তেমনি কেদার ও বদরীর সংযোগ বর্ত্ম। দৃশ্য মাধুর্য্যও বর্ণণাতীত সেইজন্য আর বেশী কিছু বোলে কাজ নেই,—তবে এটুকু বলতেই হবে যে দেওদার মাহাত্ম্যে এই নলচটি মাননীয়, মননীয় এবং স্মরণীয়। এখানেও শিব মন্দির আছে, আর একটি শক্তি মন্দিরও আছে।

ধর্ম্মশালাতো ভর্ত্তি একদল আগে থেকেই ছিল, তারপর আমরা দুজন যখন গেলাম তখন বেলা ন'টা বাজেনি। চারদিকেই লোক, পথে ঘাটে যাত্রী স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিচারে বিচরণ করচে। পৌঁছে স্নানাদি ভোজন ব্যাপার চুকিয়ে একটু বাইরে দাড়িয়েছি,—দল ঠিক নয়, দুজন যাত্রী আর দুজন বাহক—এলো। কেদারনাথ তীর্থ সম্পূর্ণ করে তারা আগেই এসেছিল, এখন শুনলাম তারা কালীমঠ থেকেই আসচে। ইতিমধ্যেই আমি আকৃষ্ট হলাম এই ছোট্ট একটি বাঙ্গালী পরিবার দেখে। দুটি মাত্র মানুষ তারা,—একজন বৃদ্ধা বিধবা আর একজন যুবা। বৃদ্ধা বলছি প্রায় পয়ষট্টি বৎসর বয়স তাঁর, যেটা দৃষ্টি মাত্রেই আমার অনুমান ছিল পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন। জিজ্ঞাসায় জেনেছিলাম তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। যুবা, তাঁর পৌত্র বা নাত্তি, নামটি ভূপতি রায় চৌধুরী,—ঠাকুরমাকে নিয়ে কেদার বদরী করে, তুঙ্গনাথ রুদ্রনাথ হয়ে ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন শেষে এখন পথে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে নেমে যাচ্চেন হরিদ্বারে। জীবনে এমন দৃঢ় শরীর বৃদ্ধা দেখিনি। এখানে উঠেই, স্থান ঠিক করে, বাহকের পিঠের মালপত্র যথা স্থানে রাখার ব্যবস্থা হলেই ;—অ-ভূপতি, চল আগে চান করে আসি, তারপর দর্শনে যাবো। গত কাল এখানে এসেই, কালীমঠ দেখতে গিয়েছিলেন, রাত্র সেখানে থেকে আজ সকালে যাত্রা করে এই মাত্র এখানে পৌছালেন।

বুড়ি তাকে বোলবো না ,—কারণ বুড়ি বোলতে যে মূর্ত্তি আমাদের স্মৃতিতে ধরা আছে তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। লাল টক্‌টকে রং আসলে উজ্জল শ্যামা, পরিশ্রমেই লাল হয়ে গিয়েছে, মাথার চুলগুলি শুভ্র ;—এ যাত্রায় আসবার সময় প্রয়াগে মুণ্ডন করে ছিলেন, তা এই এক দেড়মাসে যতটা সম্ভব ততটুকুই বড় হয়েছে। তাতে মুখশ্রীতে যেন উজ্জল ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট, নিঃসঙ্কোচ সরল অথচ ক্ষিপ্রগতি। এই ভূপতির ঠাকুরমার কি চমৎকার কর্ম্মব্যস্ত মূর্ত্তি, দেখে আনন্দে আমার প্রাণ টানতে রইলো তাঁর পানে। আমারও ঠাকুরমা আছেন, দিদিমাও আছেন, তবে এর সঙ্গে আমার দিদিমার সামঞ্জস্য এমনই ঘনিষ্ঠ,—যে বোধ হয় তাঁর প্রত্যেক নড়াচড়া টুকুও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। এখন ঠাকুরমার নিঃসঙ্কোচে যথাসম্ভব স্বল্পকালের মধ্যে স্নান, সেই সঙ্গে ভূপতির স্নান শেষ হলো তারপর চটির মধ্যে যথাস্থানে রান্না চাপানো। সব কিছুই নিজেদের আনা,—নুন,

তেল, ঘি, আটা, চাল গ্লাস, ঘটি, বাটি, কড়া, খুন্তি, ঝাঁজরা চাটু চাকি বেলন গৃহস্থালীর কিছুরই অভাব নেই ছখানা আসন পর্য্যন্ত। পরে রান্না শেষে ভূপতিকে খাইয়ে নিজের অংশ ঢাকা ঢুকি দিয়ে রেখে, পূজায় বসলেন। দেখলাম আস পাশে আর যাত্রী সবাই নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত, তাদের হৈ চৈ, কি রকম বৃথা উচ্চরবে কথাবার্ত্তা, তার মধ্যে ঠাকুরমার কর্ম্মকুশলতা। ভাতটি চাপিয়ে জপমালা নিয়ে বসা। আমার মনে সর্ব্বক্ষণই যেন দিদিমাকে দেখছিলাম তাঁর মধ্যে।

ভূপতির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, ঠাকুরমার সঙ্গেও হোলো, নলচঠিতে আসা যেন সার্থক হয়ে গেল। রিপণে ফোর্থ ইয়ার পড়ছে ভূপতি। কলকাতার মানুষ,—তার পিতা উকিল হাইকোর্টের; পটল ডাঙ্গায় বাড়ি। গরমের ছুটিতে ঠাকুরমাকে নিয়ে হিমালয়ের প্রসিদ্ধ তীর্থ ঘুরতে এসেছে। অবস্থা তাদের যথেষ্টই সচ্ছল, তবুও ঠাকুরমা ডাণ্ডিতে গেলেন না, হেঁটেই নারায়ণ দর্শন করবেন প্রতিজ্ঞা। এতলোকে হেঁটে যাচ্ছে, আমি হেঁটে গিয়ে নারায়ণের মুখ দেখতে পারবোনা? ভূপতি বললে, ঠাকুরমার গোড়া থেকেই এই ঝোঁক। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক পায়ে হেঁটে সচ্ছন্দেই করে এলেন সব, বাকী এই কটা মাত্র তীর্থ দেখে হরিদ্বারে পৌঁছে যাবেন। এর মধ্যে তাঁর ক্লান্তি দেখিনি। আমি পোর্টস্ম্যান, একজন খেলোয়াড় হয়েও বড় বড় চড়াই উঠতে বেশ কষ্ট পেয়েছি,—কিন্তু দেখেছি,—ঠাকুরমা অম্লানবদনে চড়েছেন, অবশ্য যথেষ্ট বিশ্রামও করেছেন সত্য কিন্তু আঃ উঃ, এসব করতে শুনিনি। উনি বলেন, শরীরের কষ্টকে অতটা বড় করতে নেই। শেষে ভূপতি বললে, আমায় বোলেছেন ঐ ডাণ্ডি না কাণ্ডির দাম যা লাগে সেই টাকাটা, কত গরীব দুঃখী আছে হরিদ্বারে চুপি চুপি তাদের দিয়ে গেলেও হবে, আর সেইটাই ভালো হবে। গতর থাকতে জীবন্ত শরীর নিয়ে মানুষের কাঁধে চেপে নারায়ণ দর্শন, মাগো কি ভয়ানক কথা।

প্রাণটা চাইছিল তাঁকে ঠাকুরমা বোলে ডেকে একটু পায়ের ধুলো নেবো, তা তিনি হতে দিলেন না, বললেন, ঠাকুরমা তো বটেই তা তুমি বলো না ভাই, কিন্তু পায়ের ধুলো টুলো কেন ও সব?—ব্রাহ্মণ, নারায়ণ। যতক্ষণ আমরা একত্র ছিলাম, আমায় নারায়ণ বোলেই সুখী, খাওয়ালেন রাত্রে। মনে হয় আজ, আমার জন্যই তিনি নলচটিতে থেকে গেলেন; না হলে কথা ছিল বিকালে গুপ্ত কাশীতে গিয়ে রাত্রবাস করবেন, তা হোলো না।

পরদিন ঠাকুরমাকে নিয়ে ভূপতি চলে গেল গুপ্ত কাশীর পথে, আমি চললাম কালী মঠের দিকে। ঠাকুরমা ঘুরে এসেছেন কালীমঠে, তাঁরই কাছে শুনলাম ঐ পীঠস্থানে নাকি আমাদের বাংলাদেশেরই ব্রাহ্মণ, বংশানুক্রমে তাঁরা কালীর পূজারী। এখান থেকে তিন মাইল পথ, সেই জন্য আমি যাওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারি নি। জেঠা-মশাই অবশ্য একটু নারাজ হয়েছিলেন প্রথমে বললেন, ও সব বাজে জায়গায় ঘুরে কি

হবে, কেদার আর বদরীই হোলো আসল; সেই কেদারই এখনও হোলোনা। সেখানে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, এখন কোথাও যাওয়া উচিৎ নয়। অবশ্য আমায় শেষে বোলতে হোলো আমাদের দেশের দেবতামায়ীকে কি করে উপেক্ষা করব, অতএব যাত্রা ছাড়া উপায় কি?

আগা গোড়াই বনপথ। পাক-ডাণ্ডির রাস্তায় খানিক চড়া, নামা, এ পাহাড়ের গা ঘেঁসে গিয়ে শেষে, অপর এক পর্ব্বতের কোলে দুটি পথ। বাঁ দিকের পথ, মধ্য মহেশ্বরের দিকে গিয়েছে আর সামনে বা দক্ষিণের পথটাই আমাদের, কালী নদীর তীরে তীরে। আমরা বেশ সহজেই এই তিন মাইল অতিক্রম করে প্রায় দশটা নাগাদ কালী নদীর উৎরাই মুখে কালী গঙ্গার তীরে কালীমঠ গ্রামখানি পেয়ে গেলাম।

কোথায় বাঙ্গলার সহর কল্‌কাতা আর কোথা মধ্য হিমালয়ের এক বন বেষ্টিত পার্ব্বত্য রাজ্যের মধ্যে কালী গঙ্গা নামক গিরি নদী, তার তীরে কালীমঠ নামক দেবস্থানে আমরা ভ্রমণে গিয়েছি, কেবল মা কালী, জগদম্বার বিশেষ ঐ নামটির আকর্ষণে। কালী আমাদেরই ঘরের দেবতা কিনা। একথা ধ্রুব সত্য, দুর্গা ও কালীর সঙ্গে বাঙ্গালীর যত ঘনিষ্ঠতা এমন বুঝি কোন প্রদেশের নয়। কি জানি কেন, শিশুকাল থেকেই দুর্গা আর কালী নাম দুটির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এমন কোন দেবতার নামের সঙ্গে ঘটে নি। কোথাও যাত্রা কালে দুর্গা দুর্গা, কালী, কালী। তারপর অনেক বড় হোলে মধুসূদন এবং নারায়ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটেছে। শিবকে কখনও কালী কিম্বা দুর্গা থেকে আলাদা করতে পারি নি। কালী মূর্ত্তির সঙ্গেই শিবের অস্তিত্ব জড়িত আর দুর্গা প্রতিমার উপরস্থ চালচিত্রে শিব আছেন। কাজেই শিশু কাল থেকেই ঐ দেব দেবীর সংস্কার যদি মজ্জাগত বলি তা হলে কিছু অযথা বলা হবে কি?

নলচটিতে আসে তো কেদারের সব যাত্রীই কিন্তু কালীমঠের দিকে যায় কটি? বোধ হয় এক সহস্রের মধ্যে একটি যায় কি যায় না যায়। একটা ভয় আছে ঐ ভীষণা দেবী মূর্ত্তির উপর, এ দেশের লোকেরা হয়তো মানে, কিন্তু ভয়েই মানে। আমরা বাঙ্গালী, এমনেই কালীঘাটের আওতায় মানুষ, তার জন্য কালীর সঙ্গে আর যে সম্বন্ধই থাকনা কেন ভয়ের সম্বন্ধ বোধ হয় নয়। তার উপর পরমহংসদেব এসে কালীকে আমাদের হৃদয়ের দেবতা করে দিয়ে গেছেন, এ কি পাতানো মা রে, এ আসল মা যে। এ কথা উপেক্ষার নয় ভুলবারও নয়। অদ্ভুত এই যোগাযোগ। আমার মধ্যে যদিও তা আগে ধারনা ছিল এখন সম্প্রতি ঠাকুরমা এসে সেটা একেবারে প্রাণের উপরকার স্তরে তুলে দিয়ে গেলেন। কাল, কথা প্রসঙ্গে আমায় বললেন কি? কালীমঠ তো যাবেই, নিশ্চয়ই যাবে। আমরা দেশে এক রকম দেখি মা কালীকে, এখন এখানে এসে নিজ স্থানে মায়ের কিরকম ভাব (রূপ নয়) দেখবো না? ভূপতি ছেলেমানুষ অত জানে না, তাকে অবাক হয়ে চেয়ে

থাকতে দেখে, বললেন, হাঁরে অবাক হয়ে গেলি যে, জানিস নি এই হিমালয় রাজ্যটাই যে মায়ের নিজ স্থান,—এখানেই বাপের বাড়ি, এখানে তাঁর শ্বশুর বাড়ি, এখানেই তো মায়ের কীর্ত্তি কর্ম্ম সবই। কত দানব, চণ্ড মুণ্ড, মৈষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ বধ, যত কিছু লীলা, সবই তো এইখানেই,—জানিস নি? আমাদের দেশে-ঘরে বাঙ্গালীরা তো মায়ের ছেলে, ভক্ত, ভক্তির জোরে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছে। মায়ের উপর ছেলের জোর এত যে সেই খানেই পীঠ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, এ সব অঞ্চলে আর যেন তেমন আঁটা নেই। বাঙ্গলা দেশেই মা যেন জ্বল জ্বল করচেন।

ঠাকুরমা এমন সহজ ভাবে বললেন যেন তিনি তাঁর নিজের বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ির কথা বোলছেন। আমরা স্তম্ভিত। তিনি আবার বলতে লাগলেন, ঐ ত্রিযুগী নারায়ণে কি দেখে এলি,—ঐখানেই তো শিবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল উমার, বিয়ের পুরুত কে? স্বয়ং নারায়ণই তো পুরোহিত, আর ঐ আগুনেই তো হোম হয়েছিল, এখনও জ্বলচে। এ সব দেখে শুনেও কি তোদের ঠাকুরের উপর ভক্তি আসে না? এই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্চে। ঠাকুরমা তাঁর হাত, গা দেখালেন। চমৎকার, এমন ঠাকুরমা হিমালয়েও পাওয়া যায়, কিন্তু মহাভাগ্যে।

৬

কালীমঠ ৩ মাইল

জগদম্বার মহিমায় প্রাণ পূর্ণ হয়েই ছিল, যখন আমরা মহাকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। ঠিক যেন নিজ স্থানে এলাম।

অনেকের ধারণা হিমালয়ে কেবল শিব এবং বিষ্ণু নারায়ণেরই মন্দির বা পূজা হয়। কিন্তু এখানে শাক্ত তান্ত্রিকদের এতবড় এক মহাপীঠ আছে একথা অনেকেরই জানা নেই। নল থেকে তিন মাইল উৎরাই মুখে কালীনদীর তীরে এই কালীমঠ অতীব প্রাচীন। এখানে যেভাবের শক্তিপূজা হয় সেভাবের শাক্তমতে পূজা মধ্য হিমালয়ের আর কোথাও হয় না। অবশ্য মন্দিরের ছাঁচ মধ্য হিমালয়ের অপর মন্দিরের মতই। এখানে মহাকালীর মন্দিরটিই প্রধান এবং কেন্দ্রস্থ শক্তি বললেই ঠিক হয়। এখানে প্রতিদিন পশুবলি দিয়ে পূজা হয়,—যথার্থ শাক্তমতে পূজা। আগে নাকি এখানে নরবলী হোতো তা উঠে গিয়াছে বহুকাল। এখন দুর্গাপূজায় মহিষ বলি হয়। মেষ মহিষ ছাগল, এই তিন বলিই এখানে নিয়মিত। এখানকার পূজারী বাঙ্গালী বংশ যদিও এখন রূপে গুণে আচার ব্যবহারে কোন চিহ্নই নেই বাঙ্গালীর। ভূপতির ঠাকুরমার মন্তব্য শুনেছিলাম,—এস্থানের মাহাত্ম্য খুব, কিন্তু আমাদের কালীঘাটের কালী মূর্ত্তির মত এমন

মায়ের রূপ কোথাও নেই। এখানে মহাকালীর মূর্ত্তি বলতে ছোট একটি সোনার মুখস্ আর আপাদ কণ্ঠ রাঙ্গা কাপড় ঢাকা; আমাদের কালীঘাটের কালীর মত অমন বিচিত্র গম্ভীর প্রভাবশালী মূর্ত্তি নয়। মূর্ত্তি গঠনেও একটা গুরুতর ধ্যানের ব্যাপার আছে, যা না থাকলে শিল্পীর মূর্ত্তি গড়া কখনও সার্থক হতে পারে না। সুতরাং একথা ধ্রুবসত্য এখানকার মহাকালীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরমার যে মত, আমি তার সঙ্গে একই মত পোষণ করি।

এখানে তিনটি প্রধান মহাদেবীর অবস্থিতি, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, তিনটি পৃথক মূর্ত্তি,—কিন্তু মূর্ত্তি গড়ার মধ্যে রূপের অস্তিত্ব গৌণ, আসলে এগুলি যেন সিম্বল অর্থাৎ প্রতীক মাত্র। যদিও সাধন শাস্ত্র অনুসারে এর ত্রুটি মোটেই নেই। আমি একে বাঙ্গালী, তারপর শিল্পী, তার উপর আমারও ধ্যানানুসারী মূর্ত্তির উপর অনুরাগ প্রবল—সেই কারণেই এপ্রকার পার্থক্য বিশ্লেষণ যোগ্য বোলেই মনে করলাম। আর সর্ব্বান্তর্য্যামী যিনি তিনিতো সবার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং আমার কথাও জানেন। এই ত্রিশক্তির মন্দির দেখা হলে গৌরী শঙ্কর মহাদেবের মূর্ত্তি দেখলাম, শিব আর শক্তির রাজ্য এই হিমালয়, এখানে দেব বিষ্ণু বা নারায়ণ পুরোহিত মাত্র। তিনি যেন দূর পশ্চাদবর্ত্তী হয়েই আছেন। তা থাকুন, এই আর্য্য ধর্ম্মক্ষেত্রের যা কিছু শুভ, তা মূলে পুরোহিতের গুণে বা কৃপায় বা গুরুত্বে, তা ছাড়া সৃষ্টি রক্ষা, তাতো ঐ নারায়ণেরই অধিকার। এই শিব যখন আর্য্য সম্প্রদায়ের বাইরে ছিলেন তখনকার কথা আজ আর কারো মনে নেই। আর্য্যধর্ম্মাশ্রিত নৃপতিগণের দম্ভে কোথাও যথার্থ আত্মা বা ব্রহ্ম উপাসনা ঘনীভূত হতে পারে নি, বাহ্য ক্রিয়াকর্ম্মেই অন্তঃসার শূন্য হয়ে ছিল তাই না শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর মিলনের সূত্রে আর্য্যমণ্ডলে যোগ, সঙ্গীত, নৃত্য, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্বিদ্যা, সংস্কৃতির উচ্চ অধিকার লাভ ঘটেছিল? এখনকার আর্য্য সভ্যতা থেকে শিবের দান যদি পৃথক করে দেওয়া যায় তা হলে আর্য্য ভারতের থাকে কি?

এখানে ভৈরব ও আছেন, তিনি কালরূপী ভৈরব, কাশীতেই যিনি কালভৈরব। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগলো এইটুকু এখানে গণপতির অস্তিত্ব নেই। কেন? বুঝলাম না। সিদ্ধির দেবতা না থাকা আমার ভাল লাগলো না। মহাকালী আছেন, মহালক্ষ্মী আছেন মহাসরস্বতী আছেন কিন্তু মহা না থাক শুধু গণপতিরই অভাব রৈলো কেন? পুরোহিত মশাই কিছুই বলতে পারলেন না।

সন্ধ্যার পর আমরা বসে একটু জগদম্বার কথা আলোচনা করছিলাম। তাতেই এখানকার পূজারী যিনি তিনি বললেন, এই হিমালয়ের মন্দাকিনীর ধারা পথ আর ও দিকে অলকনন্দার ধারা, উত্তরে হিমালয়ের শেষ আর দক্ষিণেও অলকনন্দার প্রবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এই কালী মায়ের সিদ্ধ ক্ষেত্র, এখানে কত কত তান্ত্রিক পীঠস্থান যে

ছিল, তার মধ্যে বেশী ভাগই নষ্ট হয়েছে কালের হাতে, ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারে নি, এখন এই কয়টিই আছে। দুর্গা মায়ের যা কিছু লীলা এই ক্ষেত্রের মধ্যে,—শিব ও দুর্গার স্থান বোলে এখনও অনেক কিছু দেখা যায়, শুনাও যায়। কিছু দিন আগেও অনেক শক্তির মূর্ত্তি নেপালে নিয়ে গিয়েছে। এসব স্থানের তুলনায় নেপাল অনেক ভালো সেখানে মায়ের ভক্ত আছে, পূজা হয় আর রাজাও শাক্ত। প্রতিবৎসর এখানে লোক পাঠান,—ভেট উপহার,—অনেক কিছুই দিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে চণ্ডীর কথাও কিছু হোলো। চণ্ডীর মাহাত্ম্য এখানে কালী নামের মধ্যে দিয়েই প্রকট, চণ্ডীর পৃথক পূজা নেই।

তারপর এখানে হোলো ভজন। একটি সারেঙ্গি আছে,—মৃদঙ্গ আছে, মোটকথা চর্চ্চা আছে। একটি ছোকরা, বেশ ভক্ত, চমৎকার গাইল,

দনুজ দলনী, নিজজন প্রতিপালিনী শ্রীকালী।
চণ্ডমুণ্ডে খণ্ডে খণ্ডে, মহিষাসুর ছিন্নতুণ্ডে,
শুম্ভ নিশুম্ভ সুভট সমরে নিমিখে মহাকালী।
ধ্যায়তো তোঁহে পাওয়াত, সুর নরমুণ অষ্ট সিদ্ধি,
ধরম অরথ চতুরবরগ দিজে কৃপালী।

ভারি সুন্দর গানটি, আমরা মুগ্ধ হলাম। পূজারী তখন আমায় একটা ভজন করতে অনুরোধ করলেন। আমার বাঙ্গলা গান, তারা বুঝতে পারবে না বোলে গাইছিলাম না। ওই সহি, আপনে বাঙ্গলা ভজন করনা, শুনেগা। আগে আমি পুরানো একখানা কালীর ভজন গাইতাম, এখন সেই গানখানাই গাইলাম। গানটি,—

দীন তারিণী, দুরিতবারিণী, সত্ত্ব রজতম্ ত্রিগুণ ধারিণী, সৃজন পালন নিধনকারিনী, সগুনা নির্গুনা সর্ব্বস্বরূপিণী। ইত্যাদি গানখানি প্রকাণ্ড, রাজা রামকৃষ্ণের রচনা। সবটাই গাইলাম। যখন শেষ করলাম,—বৈশেষিক বেদান্ত, নাহি পায় অন্ত, অনন্ত তোমারে চিনিতে পারেনি। তখন সবাই, বিশেষতঃ সন্ন্যাসী, আনন্দে বোলে উঠলেন, বহোত আচ্ছা, বাঙ্গলা গান, সমঝনে কুছ কঠন নহি।

গান শেষ হলে আমাদের অনেক কথা হোলো, বেশীভাগ কথা পঞ্চ কেদার সম্বন্ধে। দেখলাম এরা একটু বেশী কেদার ভক্ত। পঞ্চ কেদারের মধ্য মাদ—মহেশ্বরটাই কঠিন ইত্যাদি অনেক কথা। তারপর প্রসাদ পেয়ে সেখানে রাত্রযাপন করলাম। বড়ই আনন্দে আমাদের দিন ও রাত্রটি কাটলো, যেন আমার অতি আপন জনের আশ্রয়েই ছিলাম। ভূপতির ঠাকুরমার কাছে ঐ সকল কথা না শুনলে আমি এই তীর্থে বঞ্চিত থাকতাম, একথা সত্য। পরদিন প্রাতে আবার যাত্রা করলাম নলের উদ্দেশ্যে।

এই পথেই আমাদের মাদ-মহেশ্বর তীর্থে যাবার সম্ভাবনার কথা উঠলো এখন সেই কথাই বলচি।

মধ্য-মহেশ্বর তীর্থে যাবার আগে এর বিরুদ্ধে যে সব কথা শুনেছিলাম সেইগুলি বলে রাখি, যাঁরা যাবেন তাঁরাই বুঝবেন, আর যাঁরা যাবেন না তাঁরা যাবার কল্পনাও করবেন না। প্রথমত আঠারো থেকে বিশ কিম্বা বাইশ মাইল পথ। পথে চটি বোলে কোন পদার্থই নাই। ধর্ম্মশালাও নাই এপথে, অন্ততঃ তখনতো ছিলই না তবে পৌছালে জীবন ধারণোপযোগী মালগুলি পাওয়া যাবে। পথের খবর দেবার লোক কম, কারণ যাত্রী খুব কম। দুটি পর্ব্বত শ্রেণী পেরিয়ে যেতে হয়, আর দুইটিই চড়াই আর উৎরাই ছাড়া অন্য কোন রকম পথই নেই। জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ভালুক তো আছেই; একজন বললে সিংহও নাকি আছে তবে তাদের দেখা পাওয়া যায় না। দেখা পাওয়া যায় না যে সিংহ, সেতো দেবতারই সামিল আমাদের ভারতবর্ষে।

নল থেকে যে পথ দিয়ে কালীমঠে যেতে হয় বোলেছি, প্রায়ই কালী-গঙ্গার তীরে তীরেই জঙ্গলের পথ। কতকটা এলেই একস্থানে দুটি পথের সংযোগ দেখা যায়, ডানদিকেই কালীমঠের পথ আর বামদিকের পথটি মধ্য-মহেশ্বর তীর্থে যাবার। সেপথের কতক পূর্ব্বে একটি অপূর্ব্ব সঙ্গমও আছে যেখানে চির তুষার মণ্ডিত মধ্য-মহেশ্বর শৃঙ্গ থেকে এক তুষার প্রবাহ এসে কালীগঙ্গার সঙ্গে মিলেছে; সেও একটি প্রয়াগ তবে তেমন বিখ্যাত নয়; আর সেই প্রবাহিনীর নামটিও মধ্য-মহেশ্বর গঙ্গা। মধ্য-মহেশ্বর তীর্থে যাবার পথটিও ঐ নামে গঙ্গা বা প্রবাহিনীর ধারা ধরে, প্রায়ই তীরে তীরে চলে গিয়েচে যেমন কালীগঙ্গার ধারার সঙ্গে কালী-মঠে যাবার পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এ পথ মধ্য মহেশ্বরের দিকে, যদিও আরো সতরো কিম্বা আঠারো মাইলের বেশী নয়, তাহলেও বেশী লোক ওদিকে যায় না;—কেবল সাধু সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরাই ঐ তীর্থের গুরুত্ব বুঝেন এবং গিয়ে থাকেন। তবে ঐ তীর্থে সাধারণের বিমুখতার আসল কথাই হোলো, দু'টি তিন মাইলের, প্রত্যেকটি বড়ই বন্ধুর চড়াই ভাঙ্গতে হয়, তার উপর, পথে দৃশ্যের মধ্যে জলের প্রচুর্য্য থাকলেও চলার সময় জল পাওয়া দুর্ঘট। শুনেছি এই পথে ভীল কুঠিরে এক রাত্রের আশ্রয় মিলে! ঐটিই মধ্য-মহেশ্বরের মধ্য পথ। অনেক সিদ্ধযোগী এখনও ঐ তীর্থে আছেন যাঁদের দর্শন মহা-সৌভাগ্যের যোগেই ঘটে। মহেশ্বরের ঐ উচ্চতম শৃঙ্গটি দেখলে কৈলাস মনে হয় যেখানে শিবের আদি নিবাস। অঞ্চলটি দেব ভূমিতো নিশ্চয়ই পরন্ত সিদ্ধভূমি বোলেই অনেকে জানে। সেই সিদ্ধ—গনেরই ইচ্ছায় সাধারণ যাত্রীরা ওদিকে যায় না, যেতে ইচ্ছাই করে না ঐ চড়াই পথের ভয়টাকে উপলক্ষ্য করে। এসব কথা কালী-মঠেই শুনেছিলাম। কালীমঠের একটি সন্ন্যাসী গিয়েছিলেন;—তাঁরই মুখে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পেয়ে আমার মনে মনে প্রবল

বাসনা হোলো,—ঐখানে সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে। সেইখানেই অনুভব করলাম প্রবল একটি টান, যেন আমায় টেনে নিয়ে যেতে চায়, এমনই অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটলো। যাঁদের এভাবের অভিজ্ঞতা আছে সুধু তাঁরাই বুঝবেন, এ টান কি রকম, তার বর্ণনা নেই। সেরাত্রে আমি জেঠাকে কিছুই বললাম না।

পরদিন প্রাতে নলের দিকে আসতে আসতে সেই ভীষণ জঙ্গলের মাঝ বরাবর এসে এক জায়গায় দু'জনেই বসেছি। তারপর একটু জলযোগ করে ঠাণ্ডা হয়ে ধীর শান্ত মনে আরম্ভ করলাম,—জেঠাজি, মধ্য-মহেশ্বর যাওগে? একেবারে সোজা কথাই ভালো। আমি দেখেছি, দুজনের মধ্যে এভাবের একটা কাজে একজনকে নিজ মতানুবর্ত্তি করবার পক্ষে একেবারে সোজা আসল কথাটায় ঘা দেওয়াই ভালো, ফল তার প্রায়ই আশানুরূপ হয়েই থাকে। আমার কথায়, নিঃসঙ্কোচ প্রস্তাবটাই শেষ পর্য্যন্ত তাকে যেন বাধ্য করলে, যদিও সে তখনই চট করে, হাঁ, বললে না। তার আসল ভয়ের কথাটাই বললে,—আমরা রুদ্র প্রয়াগবাসী, বরফান মুলুকে যাওয়া নিষেধ, তবে আমি তোমার সঙ্গে সব জায়গায় চলতে রাজী হয়েছি কেবল তীর্থ করতে। আগে অনেকবারই আমি কেদার বদ্রীতে এসেছি বটে কিন্তু এ সব জায়গায় আমার যাওয়ার ইচ্ছাই হয়নি। তারপর আমার স্ত্রী যখন মারা যায় আজ ছয় সাত মাস হয়ে গেছে আমার কোন তীর্থেই যাওয়া হয়নি তাই কেবল কেদার বাবার কাছে ও বদ্রী নারায়ণে যাবার জন্যই তোমার সঙ্গ নেওয়া। তুমি কেদার যাবার পথে এ সব ফালতু জায়গায় গিয়ে সময় নষ্ট করচ কেন? আমার দিকেও দেখা উচিত। তুমি যওয়ান, আমি তো যওয়ান নয়? এই সব বলে, যখন দেখলে আমি আর কোন বাদ প্রতিবাদ করলাম না, তখন সে আপনিই বললে,—আপকো বাত মৈ ঠেল নহি সেকতে, চলিয়ে যাঁহা যাবেগা, ময় তৈয়ার হুঁ।

সংযোগ পথটা তার জানাই আছে দেখলাম। যেতে যেতে সেই সংযোগপথে এসে পড়তেই সে বললে, চলিয়ে ইধার। আর নলের দিকে না গিয়ে চললাম মধ্য-মহেশ্বরের পথে। সেই সঙ্গমও পেলাম, স্নানও করলাম। জেঠাও করলে। তারপর আহার হোলো সঙ্গে যে খাবার ছিল, তারপর যাত্রা। আমাদের সামনে এবার বড়ই কঠিন পথ পড়লো। জঙ্গল তো ছিলই কারণ মধ্য-মহেশ্বরের সঙ্গমের পরেই জঙ্গলে চড়াই আরম্ভ হয়ে ছিল। বাঘ ভালুকের জঙ্গল যাকে বলে সেই জঙ্গল। তারপর যতই উচুতে যাই জঙ্গল তত কমে আসে কিন্তু কি বিশ্রী মস্ত মস্ত স্তূপাকার পাথর আর যেন সেই পাথর ফুঁড়ে গাছ। যখন মধ্য পথে আমরা এক জায়গায় বসে দমনিচ্ছি, জেঠা টপ্ করে এক পাহাড়ী বিচ্ছু পাকড়াও করে ফেললে। ধরলে ঠিক তার বিষ পুঁটলীটার নীচে, প্রায় তিন ইঞ্চি হবে লেজ সুদ্ধ আর মিশমিশে কালো। তার কি ছটফটানী, দাড়া দিয়ে জেঠার আঙুলটা

ধরবার চেষ্টা করচে, দেখলাম জেঠা অম্লানবদনে তার ঐ চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করলে খানিক। আমি চাইলাম, ওটা আমায় দাও দেশে নিয়ে যাবো।

আমার জিনিষ পত্রের মধ্যে জেঠার ছোট থলিতে, পঞ্চাশটা সিগারেটের খালি টিন, ভিতরে ভরাছিল নুন, কাসুন্দী, পুরানো তেতুঁল এই সব, পথে কিছু খরচাও হয়েছিল। সেটা এখন জেঠা বাঁ হাত দিয়ে নিজেই বার করে দিলে। সহজেই পাওয়া যায় এমন ভাবেই বাইরের দিকে রাখা ছিল। তা থেকে মালটা বার করে তখনই ভিতরটা যথা সম্ভব শুকনো ঝরাপাতা দিয়ে কতকটা সাফ করে নিয়ে বললাম, এর মধ্যে ফেলে দাও। যেই ফেলা অমনি ঢাকন এঁটে দিয়ে পাছে ঠেলে খুলে ফেলে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হোলো তারপর একটা পুঁটলীর ভিতর রেখে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তারপর যাত্রা আরম্ভ হোলো আবার।

এই বিচ্ছুকে সম্বল করে চলতে আরম্ভ করলাম, কতক আসবার পর সন্ধ্যার কথা ভাবতে হোলো, আমরা থাকবো কোথায়? জেঠা বললে এখানে ভীলদের গ্রাম থাকবার কথা, শুনেছিলাম এই জঙ্গলের মধ্যেই সেটা আছে। পথ তো নেই, পাহাড় পার হতে হবে সেই হিসাব করেই চলা হচ্ছে। জেঠা যে কি হিসাবে চলছে তা সেই জানে, আমি কিন্তু কোথাও, বিশেষতঃ সেই সঙ্গমের পর থেকে পথ বলে কল্পনা করতে পারি এমন কিছুই দেখিনি। যাই হোক এখনও অনেক পথই বাকী আছে যখন, তখন চলাই ভালো জেঠার পিছনে পিছনে। একটা স্তূপ দেখা গেল খানিক দূরে, তার পাশেই একটা গাছ, যেন একটি মানুষ, গৈরিক রং এর কাপড় খানি তার, গাছের গুড়িতেও খানিক ঢাকা পড়েছে তার দেহ। জেঠাই বোললে, বো দেখো,— বলেই আমাকে দেখালে। একটু পা চালিয়ে চললাম, চক্ষের ভুল না হয়। সত্যই এমন যায়গায় মানুষ পাওয়া গেলে সৌভাগ্য। এবার যেন উপবিষ্ট মূর্ত্তি উঠে দাঁড়লো, আমাদের দিকে লক্ষ্য করছে বোধ হোলো।

হাঁ, একটি সাধুমূর্ত্তিই বটে তো। নারায়ণ! বোলেই তিনি উঠলেন। নমস্কার হোলো, বললেন, ঔর থোড়ে উপর রহনেকো জাগহা মিলেগা, চলনাই আচ্ছা হৈ। চলতে চলতে পথে কোন কথাই হোলো না। যদিও এসময়ে এখানে এক নারায়ণের দর্শনে আনন্দের প্রবাহ চেপে রাখা দায় হচ্ছিল। যাইহোক অনেকটাই উঠে সন্ধ্যার ঠিক আগেই দুই একখানা ঘর,—চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি স্থান আমরা পেয়ে গেলাম। দীর্ঘ শরীর তার হাতে কাঠিতে জড়ানো কতকটা দড়ি নিয়ে একটি পুরুষমূর্ত্তি সেইখানেই দেখা গেল। সাধুকে সে প্রথমেই ভূমিষ্ঠ হয়েই প্রণাম করলে,—আমায়ও করলে, জেঠাকে করলে না। সাধু কি একটা কথা বললেন,—সেও কিছু উত্তর দিলে, তারপর চলে গেল। সাধুর কাছেই পরে শুনলাম, সরকারি জঙ্গল রক্ষা বিভাগের এই

রকম আড্ডা মধ্যে মধ্যে আছে। তিন চার জনে এখানে থাকে তারা ভীল জাতীয় লোক। দেখতে লাল, বিশেষ দীর্ঘ না হলেও বেশ মানানসই আড়া, দেখবার জিনিষ হোলো তার পেশী শক্তি, আর দেহের অপরূপ ছন্দ। তার হাত দুখানি, তার বুকের ছাতি, কৌপিন পরা সুতরাং শক্ত পা দুখানিও তেমনই সুগঠিত ভারি সুন্দর দেখতে। এই শ্রীমান শরীরটি আমাদের দেখার সঙ্গেই সম্বন্ধ, যেহেতু আমাদের শরীরের গঠন তার ঠিক বিপরীত।

দুতিনখানি ঘরের কথা বলেছি,—তার একখানি সে আমাদের দেখিয়ে দিলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুখানা খাটিয়া পাতা। মাটি পাথর দিয়ে তৈরী দেয়াল। একখানা ভোজালী, একটা বর্শা, ধনুক, চামড়ার তুনীর একটা;—তাতে কতকগুলি পালক দেওয়া তীর, এইভাবের কয়েকখান কাঁচা শুখানো হরিণের ছাল, একটা শৃঙ্গধর হরিণের মুণ্ড এই সব দেয়ালে ঝুলচে। কথা হোলো খুবই কম, কিন্তু আমাদের সব কিছুই ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এক ঐ কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছু খারাপ ছিল না। কাছেই একটি ঝরণা, এই ঝরণাই এখানে মানুষের বাস সম্ভব করেছে। যাই হোক, আমরা এই জঙ্গলে একটু আশ্রয় পেয়ে গেলাম। আটাতো সঙ্গেই ছিল, সাধুর জন্ম কিছু আটা সে জোর করেই দিলে। জেঠামশাই চমৎকার রোটি, ডাল পাকালে। শেষে একটু গুড় দিয়ে ভোজন শেষ করলাম। তারপর দুর্গা বোলেই শয্যাশ্রয়।

পরদিন প্রাতে উঠেই যাত্রা। চড়াই এখনও শেষ হয়নি; সুতরাং আমরা উঠতেই রইলাম; এইভাবে অনেকটাই উঠে আমরা সকাল থেকে আন্দাজ ছয় সাত মাইল চলে, সোজা পথ পেলাম। সোজা পথটার পরেও চড়াই দু' মাইল হবে,—তারপর তিনটি মাইল উৎরাই, তারপর অল্প খানিক গিয়ে মধ্য-মহেশ্বরের এলাকায় পৌছে গেলাম।

এই যে সাধুটীর সঙ্গে যোগাযোগ, ইনি আসছেন ত্রিযুগী-নারায়ণ থেকে। মধ্য-মহেশ্বরে ইনি পূর্ব্বেও এসেছিলেন এখন তিনি এখানে দীর্ঘকাল থাকবেন বোলেই আসচেন। আমরা ভাগ্যক্রমেই পথে তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। না হলে কি যে হোতো তা জানি না। আমরা এপথে কেবল নীরস জঙ্গলের কথাই বোলেছি কিন্তু যেখানে যেখানে পথ দুর্গম, ঠিক সেই সকল স্থানেই বিধাতার এমনই অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মায়ার অস্তিত্ব তা এখানে এসে দাঁড়িয়ে যিনি না দেখবেন বর্ণনায় তাঁকে বুঝানো শক্ত। এই পথে যে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য এবং উপভোগ্য স্থান আছে এমন এদিকে অন্তপথে দেখিনি। আমাদের সেগুলি অতিক্রম করেই যেতে হোলো—থাকবার কোন সম্ভাবনা ছিল না কারণ, লক্ষ্য আমাদের ঐ মধ্য-মহেশ্বর। যদি এমনটা হোতো যে, যেখানেই ভাল লাগবে সেইখানেই যতক্ষণ ইচ্ছা থাকবো তাহলে যে কি সুখের হোতো সে আর বলবার কথা নয়। কিন্তু এভাবের যাওয়া আসাতে তা ঘটে না কারণ আমাদের সে সংস্থান নেই।

আমি ভেবে দেখেছি এটা অসম্ভব নয়,—তবে একটু ব্যয়সাধ্য বটে। কারণ মধ্য-মহেশ্বর যেতে মধ্যপথের ব্যাপার তো সাধারণের ভালো জানা নেই, সে যে কি দুর্গম এবং জনমানবের গতিবিধি শূন্য স্থান। কাজেই এমন স্থানে থাকতে গেলে প্রচুর লোকজন সাথে সহজ বস্ত্রাবাস অর্থাৎ তাঁবু সঙ্গে, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতে হয়। তা ছাড়াও আরো কিছু চাই। যদি অ-হিংসার মনোবল না থাকে তবে হিংস্র জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ আগ্নেয়াস্ত্রও চাই। কাজেই এভাবের ভ্রমণ, সঙ্গে এত ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়ে, তারপরও কিন্তু আছে,—সবগুলির সুব্যবস্থা। এইসব নিয়েই উৎকট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। রাজসিক ভ্রমণ সত্য বটে যা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। তবে নানা মুনির নানা মত। আমার মনে হয় দলবল নিয়ে ভ্রমণের সার্থকতা তাঁদেরই যাঁরা উচ্চস্তরের কর্ম্মী এবং সামাজিক মানুষ, যাঁরা নানাদেশ, দৃশ্য, নানা স্থানের বৈচিত্র্য, মানুষ সমাজের বৈশিষ্ট্য নিজে উপভোগ শুধু নয় শিল্প ও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রচার করে দেশের ও দশের উপকার করবেন। অবশ্য তাতে প্রথম ও প্রধান উপকার তার নিজেরই হবে—আর ঐ আনন্দের অংশভাগি হবেন তাঁরাই যাঁরা তাঁর লেখা পড়বেন। আমরা কিন্তু সেদিক থেকে সঙ্কীর্ণমনা। কারণ শুধুই যে প্রচুর অর্থের অভাবে ঐ সকল স্থান এবং সুন্দর ক্ষেত্রে বাসের উপভোগে বঞ্চিত হয়েছি তা নয়—আমার কথা এই যে দলবল নিয়ে ভ্রমণের অনুপযুক্ত আমি।

সেকথা যাক,.এখন যেসব স্থান অতিক্রম করে এলাম অত্যন্ত খাড়া খাড়া দুটি চড়াই, আর জঙ্গলে, পথের চিহ্নহীন বিস্তৃতি ছাড়া নিন্দার কিছুই ছিল না। তবে, মধ্যে জলের অভাব, আর ঐ জন্তু জানোয়ার, সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, ভালুক, বন্য বরাহ এই সকল ছাড়া আর ভয়ের কিছুই ছিল না, কিন্তু যে সকল দৃশ্য উপভোগ ঘটেছিল তার তুলনায় ওসব ভয় মোটে উল্লেখযোগ্যই নয়। পূর্ব্বে একটা চমৎকার পথই ছিল এবং তখন অনেকেই মধ্য-মহেশ্বরে যাওয়া আসা করতো শুনেছি; মধ্যে গত উনিশ শতকের শেষ দিকে ভীষণ বরষার সময়ে ভূমিকম্পের ফলে কয়েক জায়গায় এমনই ভয়ানক ধস নামলো তাতে অনেকগুলি প্রাণহানিও হয়েছিল;—সেই সূত্রেই সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে সারা পথের সকল কিছু সুখশান্তি চলে গেল। তখন থেকেই মধ্য-মহেশ্বরের পথে লোক বা যাত্রী চলাচল প্রায় বন্ধ রয়েছে। সে চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের কথা তখন থেকেই আর ভাল পথও হোলো না, আর যাত্রীদের মধ্য-মহেশ্বর দেখার সুযোগও সহজ রইলো না।

মধ্য-মহেশ্বর, মধ্য-মহেশ্বর করতে করতে আমরা বড় বড় তিন চড়াই উত্তীর্ণ হয়ে যখন পর্ব্বতের উপর তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়েছি তখন যথার্থই মনে হলো, আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়ে গেল। মন্দির খুব বড় নয়, কিন্তু কি চমৎকার পরিবেশ, সে-বায়ুমণ্ডল

একমাত্র ঐ মহাদেবতারই নিজ ভূমি বোলে তখনই ধারণা হয়ে যায়। সারা ভাব জগতের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জ্ঞান যা কিছু উচ্চ ভাব আছে মানুষ মনে, তাই দিয়ে পরমেশ্বরকে আকর্ষনের কথা আমরা জানি, কিন্তু স্থানের গুণেও সেই আকর্ষণের কাজটা হয়ে যায় তার প্রমাণও এই ক্ষেত্রটি। জয় শিব শঙ্কর বোলে এক স্থানে বসে পড়লেই, অন্তরতম প্রদেশ থেকে আত্মসমর্পনের একটা গভীর প্রেরণা অনুভব করা যাবে। প্রথমেই আমি একটু চঞ্চল হয়েছিলাম দেখে জ্যেঠামশাই মৃদু হেসে সেই মন্দির প্রাঙ্গনে বোঝা নামালেন।

এখানে বাবা কালীর ধর্ম্মশালা তো নাইই, এবং অন্য কোন চটির চিহ্নও নাই। তবে সাধারণ যাত্রীরা কেউ গেলে আশ্রয়ে বঞ্চিত হবে না;—মোটামুটি সবই আছে। গ্রামখানি ছোট, দশ থেকে পনেরো খানা মকান দেখলাম। যাত্রীবর্গের জন্য সাধারণতঃ যা যা দরকার তা সবই আছে একখানি দোকানে। আমি কিন্তু যাত্রীদের সুখ স্বচ্ছন্দের পরিচয় কথা বেশী বোলবোই না, স্বধু এর আগে যা বলেছি তাইই শেষ পর্য্যন্ত বলবো, কারণও সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলবার নেই।

আমরা গিয়ে পৌছালাম দ্বিপ্রহরের পরে। পথে, মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পৌছালাম। এক পাঠশালের কাছে, অনেকগুলি নয় ছয় আটটি ছেলের কলরব শুনে এবং দেখেই আমার তাকে পাঠশালাই মনে হোলো। একটি চত্তর বেশ বড়, তার একদিকেই মধ্য-মহেশ্বরের মন্দির। খুব প্রাচীন, জীর্ণ বিবর্ণ মন্দির, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। এ পর্য্যন্ত অমন প্রাচীন মৌলিক স্থাপত্য বেশী চক্ষে পড়ে না। ধর্ম্মশালা হীন মন্দির ছাড়া যতগুলি গৃহ, পাঁচ থেকে ছয় খানি মাত্র, সবই গ্রামের অধিবাসীদের। ছোট গ্রাম কাজেই শান্তি পূর্ণ। একটি ছোট ধারা আছে স্নান করবার, কুণ্ডও আছে স্নান করতে ইচ্ছা হলে করতে পারো তুমি। গরম জল দশবৎসর আগেও পেতে পারতে কারণ তপ্ত কুণ্ডও ছিল কাছেই এখন তার ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানে শক্তি, পার্ব্বতী মূর্ত্তিও আছে, প্রাঙ্গনে ষাঁড়রূপী নন্দী আছে যেমন থাকে শিবের সামনে। তারপর, আমাদের এই মন্দির ও চৌতারার মধ্যে অবস্থিত সবকিছুই দেখা হোলে স্নানাহারের পর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। অল্পকাল বিশ্রামের পর উঠে সামনেই মধ্য-মহেশ্বর শৃঙ্গের পানে চেয়ে দেখলাম, এইখানেই শিবের যে মূর্ত্তি আছে শিবের ঐ রূপই আমরা অন্তর দিয়ে ভালবাসি। এখানেও নাটমন্দিরের মধ্যে ধুনী জলে এবং জ্বলছে ততদিন, যত দিন মধ্য-মহেশ্বর মূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা শুনলাম শঙ্করই এখানকার সকল শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

যে কয়খানি ঘর আছে তার মধ্যে পুজারীর গৃহখানি ওর মধ্যে একটু প্রশস্ত, তার

পাশেই যাত্রীশালা যেখানে আমরা উঠেছিলাম। আসলে এখানে দাঁড়িয়ে চার দিক দেখা, এই দেখাতেই মধ্য-মহেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি হবে। জেঠা মশাই দুবার আমায় শুনিয়ে দিলেন, এখানে আজ রাত্রটুকু থেকে কাল সকালেই ফিরতে হবে, এটা ত্রিরাত্র কাটাবার জায়গা নয়। আমি বললাম, হাঁ নিশ্চয়ই ফিরবো কিন্তু আজ ঘুরে ফিরে, যা দেখতে এসেছি সব যদি দেখা হয়ে যায় তবেই,—

আসবার সময় বড় কষ্ট করে আসা হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া পুরা দস্তর আরম্ভ হল প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ;—অর্থাৎ কিনা সুখে অবতরণ আর দুদিনের যায়গায় একটি পুরা দিনে বেশ উজ্জ্বল দিনকরের আলো থাকতে থাকতেই নল চটিতে প্রত্যাবর্ত্তন। কিন্তু একেবারে ফুললো আর মোলোর মত ব্যাপার নয়, মাঝের কথা, কিছু বলবার বিষয় আছে।

আমরা এলাম যেখান দিয়ে গিয়েছিলাম ঠিক ঠিক সেখান দিয়ে নয়। ভীলদের যে কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম এলাম তার খানিক নীচে দিয়ে। সেটা পাইনের জঙ্গল, দেওদারও ছিল কিছু কিছু, কিন্তু জঙ্গলটি চীড় জাতীয় পাইনের। মনোরম পরিবেশ তো নিশ্চয়ই তার উপর সে পথের, পথ বোলে যদিও কিছু ছিল না তবুও যখন সেখান দিয়ে এসেছি তাকে পথই বোলবো,—সে পথের কখনও দক্ষিণে কখনও বাঁ দিকে যে ভীষণ গর্জন, বোধহয় বিশাল গিরি পাদমূলে প্রবাহিনী, কত দূর নীচে ঐ মধ্য-মহেশ্বর গঙ্গা, কি তার গর্জ্জন আর ঝড়ের বেগে চলেছে; সেখান থেকে নগ্ন পাষান, খাঁজে খাঁজে প্রায় সোজা উঠেছে, শীর্ষদেশ তার এতটাই উঁচু, দেখতে গেলে মাথার টুপী বা পাগড়ী খসে পড়ে যায় পিছন দিকে। আমার বাঁদিকেও দেয়ালের মতই পাহাড়, তাতে জঙ্গলী গাছ ভরা অনেকটা উঠে আবার ঝুঁকে সেটা এমন ভাবে কতক মাথার উপর হেলেছে, নীচে থেকে দেখছি,—যদিও সেটা মাথায় পড়বার কোন সম্ভাবনাই নেই কিন্তু দেখলে ভয়ের উদ্রেক করে। বোধ হয় আধ ঘণ্টা বসে বসে দৃশ্যটি দেখেছি, নড়তে পারি নি। নীচে নেমে যখন সেই নদী কূলে পুলের নীচে দাঁড়ালাম তখন মনে হোলো যে ছোটর সম্পর্কে বড়,—তার বড়, তার বড় করে কতো বড়ই আছে এই ভুবনে, যা ধারণার অতীত আবার বড়ো থেকে ছোট, আরো ছোট করে অনু পরমাণুতেই তার পরিণতি,—আমাদের অবাক করবার জন্যই আছে। অ-বাক হবারই কথা, নির্ব্বাক,—বাক রোধ হয়েই যাবে তোমার, যখনই ঐ বিষয়ের সামনে আসা যায়। দৃশ্যের মধ্যে ঐ পাওয়া সম্বল করেই আজ নল চটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম দুই আর একে তিন রাত্র কাটিয়ে। বেশী মাল এখানেই রেখে গিয়েছিলাম আমাদের বোঝা হালকা করতে।

এই ভাবে বড়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরে আরও একরাত্র বড়ই নিশ্চিন্ত মনে এখানে

ছিলাম। পর দিন প্রাতে যাত্রা করি। এই নল চটির মাহাত্ম্য যেটুক তা আমরা বেশী উপভোগ করতেই পারিনি কারণ এখানে এসেই কালীকা ক্ষেত্রে বা কালী মঠেই যাত্রা তারপর দিন মধ্য-মহেশ্বর ক্ষেত্রের পথে এবং পর দিন রাত্রে মধ্য-মহেশ্বরে। পরদিন সন্ধ্যায় আবার পথের সবটা মাড়িয়ে এখানে এসে পৌছেছি;—কাজেই এখানকার যা কিছু এই সকালেই যেটুকু সম্ভব তাই দেখে এবং শুনে নিলাম।

৭

ফাটা, মৈখণ্ড, রামপুর ও ত্রিযুগী নারায়ণ—১৭ মাইল

এখানে বহুকাল থেকে একপ্রথা আছে সেটার গুরুত্ব অন্তর্জাগতিক;—যাঁরা কেদার যাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে যদি এমন বোঝা কিছু থাকে যা তাঁরা সঙ্গে নিতে অনিচ্ছুক কারণ পথে সে সবে তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই, তিনি স্বচ্ছন্দে সেগুলি এখানকার অধিকারী জমাদার বা চৌকীদারের কাছে রেখে যেতে পারেন, তার কাছ থেকে রসিদ পত্র পাবেন যে এইগুলি তার জিম্মায় রইলো। এব্যবস্থা যাত্রীদের অনেক শ্রম লাঘব করে।

এ অঞ্চলও কৃষি প্রধান, এখানকার চটি, ধর্ম্মশালা, দোকান, গৃহস্থের ঘর-দ্বার সবকিছুই একটু বৈশিষ্ট্য পূর্ণ, যা অন্য ক্ষেত্রে দেখিনি। নলচটিতে ঘরগুলি অনেক সুন্দর দেখলাম। এই গ্রামখানির লোকালয় ছাড়িয়ে কতকটা উপরের দিকেও গিয়েছিলাম;—কারণ একটা ধারণা এই হয়েছিল এখানে নিশ্চয়ই সাধু মহাত্মা আছেন,—কোন না কোনপ্রকার সাধকের দর্শন মিলবেই যত্ন করে খুঁজলে। সেই আশায় আমি অনেকটাই উপরে উঠেছিলাম। তার ফলে কি দেখেছিলাম সেই কথা বোলেই নলচটির কথা শেষ করে দেবো।

যে রাস্তায় আমরা এখানে প্রবেশ করি, সেই পথেই গ্রামের বাইরে এসে আরও খানিক গেলে সেই পথ থেকেই একটি সরু বনপথ দেখা যায় উপরদিকে উঠে গিয়েছে। একলাই ঘুরে ফিরে একটি তপোবনের মতই স্থানে এসে পড়লাম সেই পথ ধরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেন বিশেষ যত্নেই রাখা স্থানটি। একটা উঁচুস্থানে উঠবার কয়েকটি ধাপ, পাথরের উপর পাথর দিয়ে রচনা। আট দশটি ধাপ উঠে একটি প্রায় সমতল প্রাঙ্গণের মত, তিনদিকে তার গুহার আকারে কয়েকখানি বাসগৃহ মনে হয় তার মধ্যে মানুষ আছে। তাই ভেবে সামান্য কয়েক পা গিয়ে একখানির ভিতরের দিকে লক্ষ্য করলাম। উচু বেদী তার উপর বেশ শয্যারচনা করা, উপরে মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত, উপরে স্থির সুখাসনে সাধক সমাহিত, বহির্দৃষ্টি নেই। সাবধানে, যথেষ্ট ধীর পাদক্ষেপ করছিলাম, কারণ শান্তিভঙ্গের ভয় ছিল। গুহার ভিতরে ঐ মূর্ত্তি দেখেই তৎক্ষণাৎ সরে এসে দ্বিতীয় গুহায় দেখলাম,

সামনের চাতালেই সাধু বসে আছেন, সামনে পাথরের কাটোরায় কোন পদার্থ রয়েছে,—সেটি কি বস্তু বুঝলাম না। তিনি আমায় দেখলেন, প্রসন্নবদনে হাত তুলে যেন আশীর্ব্বাদ করলেন। আমিও প্রণাম করলাম, তিনিও প্রণাম গ্রহণ করে বললেন,—ইহাঁ সাধু সন্তকো জাগহা, যাত্রী লোকনকো বাস্তে নহি। আমি বললাম, মৈ জানতাহুঁ মহারাজ, সিরফ্ দর্শনকো আয়া। উত্তরে তিনি বললেন, বো আচ্ছী বাত্, দর্শন করো ঔর চলা যাও, ইধার মৎ ঠাহরো। ব্যাস্। এখানে দেখলাম এইটুকুই নলের জনবিরল উপরস্তরে তপস্বীদের জন্য বেশ প্রশস্ত একটি সুরক্ষিত স্থান আছে।

পরদিন আমরা যাত্রা করলাম প্রভাতেই, ফাটা নামক প্রসিদ্ধ পড়াও বা আশ্রয়ের উদ্দেশে। পথ-সোজা, মাঝে একখানা ছোট গ্রাম। পরে সেটা ঐ চড়াই পথে বেশ পেরিয়ে খানিক উঠে আবার যে চটি পেলাম সেটি ঝুলন চটি। এক সুন্দর ঝুলা আছে এখানে। উপরে মোটা রলার দুদিকে বিশাল দুই দণ্ডের মধ্যে শিকলে বাঁধা ঝুলা ঝুলছে। গ্রামের নর নারী সবাই সারা বছর দোল খায়, আর ঝুলন পূর্ণিমার দিন কেবল বিগ্রহ সাজিয়ে এনে দোল খাওয়ানো হয় সারা পূর্ণীমা তিথি কালটুকু। যাত্রীদের কিছু দক্ষিণা দিতে হয় ঝুলায় উঠলে। যাই হোক আমরা এখানে একটু দমনিয়ে মৈখণ্ডের পথে যাত্রা করলাম।

খানিক গিয়েই পথে অল্পব্যবধানে ভেতা দেবীর মনোরম স্থানটি। আমরা সেখানে আর দাঁড়াইনি শুধু চক্ষু বুলিয়ে নিলাম, দেখলাম। একটি প্রাচীন কুণ্ড ও প্রাচীন মন্দির একটি তার সামনেই অবস্থিত। গুরু গম্ভীর একটি ভাব এখানে আছে যা স্থানে এসে দাঁড়ালেই অনুভূত হয়। এখন সেই স্থানটি পেরিয়ে সোজা পাঁচ মাইলের মাথায় মৈখণ্ডিতে পৌছে গেলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা, এ বেলা এখানেই আড্ডা।

মৈখণ্ডী চটি, আসলে অতি প্রাচীন তীর্থ এবং তার পিছনে অনেক কিছুই কাহিনী জড়িত আছে তাই এটা সুধু স্নানাহার-বিশ্রামের স্থান মাত্র নয়,—আরও মাহাত্ম্য আছে; দৃশ্যসম্পদেও অতুলনীয় স্থানটি। তা ছাড়া স্থানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় এখানে দৈব সম্পদ কিছু আছে। এখানকার মানুষগুলিও যেন একটু পৃথক ধরনের, যেভাবের মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রয়ে দেখে এসেছি ঠিক সেরকম নয়। স্থানটিতে শক্তির প্রভাব স্পষ্টই অনুভূত হয়। নলচটি থেকে সাড়ে পাঁচ মাইলের মাথায় এই মৈখণ্ডী গ্রাম বা তীর্থ।

আমরা ঐখানে যখন পৌছে গেলাম, সেখানে একদল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ধর্ম্মপ্রাণ শেঠ শ্রেণীর যাত্রীদল, উপস্থিত একটা বিশেষ কিছু উৎসব বা আনন্দের ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। তিনজন মানুষ, তার মধ্যে একজনই কর্ত্তা। তাছাড়া কয়েকজন কর্ম্ম ব্যস্ত মানুষ তারা, বেশী রকম চঞ্চল এবং উৎসাহপূর্ণ মনোভাব নিয়েই চলাফেরা করছিল। যিনি শ্রেষ্ঠ বা মুরুব্বি তাদের মধ্যে সকলকার শ্রদ্ধার পাত্র, তিনি সামনে ঐ চত্তরের উপর বসে বসে

পাঁচজনের উপর হুকুমদারী করছিলেন,দেখতে তেমন লক্ষ্যনীয় নয়, রূপেও নয়, ব্যক্তিত্বেও নয়। ছেলেমানুষ একদল যারা কাছে পিটে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের মধ্যেও অপরূপ শ্রী, তার মাঝে কর্ত্তাকে শ্রীহীন, এমন কি দোকানদার যারা বৈশ্য, তুলনায় তারাই যেন শ্রীমান। কিন্তু ধন একটা কতবড় শক্তি, ধনীর মূর্ত্তি যেমনই হোক না কেন,—প্রত্যেকেই তার সঙ্গে সম্ভ্রমের ভাবেই কথা কইছিল,—আর এমনই বিনয় প্রকাশ করছিল যাতে একজন সহজেই ধরে নিতে পারে এখানে কে প্রভু এবং কে আজ্ঞাবাহী। বলেছি রূপের দিক থেকে তাদের কোন আকর্ষণই নেই,—তাদের সবারই ছোট ছোট চুল আর পশ্চাতে দীর্ঘ শিখা গ্রন্থিবদ্ধ,—ঘন এবং দীর্ঘ চুলের জন্য সে শিখারও একটা ভার আছে মনে হয়। মোটাসুতার উপবীত প্রত্যেকেরই তাতে রিংএর মধ্যে কয়েকটি চাবি ঝুলছে। প্রত্যেকেরই কানে সোনার মাকড়ি, কেবল একজনের সেটা হীরার। এইখানকার হালুয়াইর দোকানে পুরী, কচৌরী মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজ্য প্রভূত পরিমানে তৈরী হচ্ছিল। বেলা তিনটা নাগাদ অনেক লোককে মহিষ-মর্দ্দিনীর মন্দির প্রাঙ্গণে ভূরি ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে এক একখানা লাল পাড়ের ধুতি দান করলে। সুধু ব্রাহ্মণ ভোজন নয়, এই পাক্কি ভোজনে আমন্ত্রিত হতে বোধ হয় গ্রামের কেউ বাকী ছিল না। এমন কি ধর্ম্মশালায় যারা উপস্থিত ছিল তাদেরও আবাহন করা হোলো, অনেকেই গেল। আমার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল তাই গেলাম না। জেঠামশাই জানতো ব্যাপারটা তাই সে প্রস্তুত ছিল। কাযেই যথা সময়ে ভোজন, তারপর ধুতি ও চাদর আর চার আনা দক্ষিণা লাভ করলে। শেষে প্রফুল্লমুখে সে আমায় বললে, ইলোক বহোৎ বড়া ধরমবীর, ঔর পুণ্যাত্মা। এই দিনেই আমি জানতে পারলাম জেঠামশাই একজন ব্রাহ্মণ সন্তান; দেখলাম এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই ভোজনে বোসলো আর তাদেরই সঙ্গে ভোজনান্তে বস্ত্র ও দক্ষিণা নিয়ে উঠলো। যাই হোক যে ধার্ম্মিকগণ, আজ এখানে বাস এবং সবাইকে তুষ্ট করলেন শুনা গেল এঁরা যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই ঐ ভাবে ভোজন ও বস্ত্র দানে সেখানকার সবাইকেই তৃপ্ত করে অশেষ পুণ্যার্জন করেছেন। আবার যেখানে যাবেন এইভাবেই করবেন। আজ রাত্রবাস করে কাল এরাঁ চলতে সুরু করবেন, যেখানে পৌঁছাবেন সেইখানেই আরম্ভ হয়ে যাবে ঐ ভাবের সমারোহ। তাঁদের সঙ্গে প্রায় পঁচিশটি মজুর বা বাহক, প্রত্যেকেই এক থেকে দেড়, কেউ কেউ দুমন পর্য্যন্ত বোঝা নিতে সক্ষম।

এইবার আমাদের কথা বলি। মৈথণ্ডীর সংস্কৃত নাম মহীখণ্ড। মহী কথাটা মহিষের সংক্ষিপ্ত রূপ, অথবা পৃথিবী অর্থে, তা জানি না। এরা বলে এইস্থানেই দেবী মহিষাসুরকে যুদ্ধে নিহত করেন সেই জন্যই স্থানের ঐ নাম। এখানে মহিষাসুর মর্দ্দিনীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। তারপর, এই গ্রামের নীচে মন্দাকিনী নদীটি

পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তার, তার উপর প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরী একটি পুল বা ঝুলাও আছে যাকে ধরে ওপার থেকে এপারে আসা যায়। এই দড়ির পুলটি সেই লছমন ঝুলার বৈমাত্র ভাই, যদিও এখন আর সেখানে ঝুলা নেই, তবে এটি দেখলেই সেটি কেমন ছিল জানা যায়।

এই গ্রামখানির উপরে আর একটি ছোট পাহাড় আছে, তাতে একটি চমৎকার স্থাপত্য,—কিন্তু তা জীর্ণ হয়ে এসেছিল, একটু মেরামতের হাতও দেখলাম। পাহাড়ের চূড়ায় স্থানটি। অনেকেই পূজাদিতে আসে নীচে থেকে। এখানে এসে দাঁড়ালে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না। এই যে প্রাচীন স্থানটির কথা বলছি, ভিতরে তার সবটাই অন্ধকার, দ্বার পথ একটি মাত্র, তাও পাথর দিয়ে বন্ধ,—ভিতরে দেবীর মূর্ত্তি আছে শুনেই এতটা চড়াই ভেঙ্গে উঠলাম। কিন্তু তার মধ্যে ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না।

কিন্তু আমাদের উপরে চড়া নিরর্থক হয়নি। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কারই ছিল। উত্তর পূর্ব্বে, উত্তরে এবং উত্তর পশ্চিমে কি অপূর্ব্ব তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত মালা। এখান থেকে এত সুন্দর দেখায় তা রং দিয়ে আঁকতে লোভ হয়। কিন্তু একটা মোটা বালীর কাগজের খাতা আর পেন্সিল আর রাবার ব্যতীত আমার আর কিছু সরঞ্জাম ছিল না তো।

কাজেই, আজ এখানে আমায় স্থধু পেন্সিলস্কেচ করেই প্রাণের সাধ এক রকম মেটাতে হোলো। মোটের উপর মৈখণ্ডির যে দৈব মাহাত্ম্য তা আমার এই মোটা ছবিতে ধরবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কালীমঠে যা দেখেছিলাম সে একরকম আর এই মহিষ খণ্ডে যা দেখলাম তা সম্পূর্ণই পৃথক,—কিন্তু এই পার্থক্যের মধ্যেও কোথায় পরস্পর মিলনের এক যোগ সূত্র আছে খুঁজে সেইটাই বার করতে হবে। তবে এখনই যে সেটা ভেবে চিন্তে আমায় আবিষ্কার করতেই হবে তা নয়,—কিন্তু তবুও আজ সারা দিনটা এরই পিছনে ছিলাম,—এই বিষয়টাই আমার গোপন মনের বিষয় হয়েই রইলো।

ভোজন বিশ্রামের পর যখন বৈকালে,—এখানকার পথের ধারে একটা আড্ডার মত সেইখানে গিয়েছি, দেখি একজন দীর্ঘ শরীর মনোহর জটাজুট সমাযুক্ত, কপালে ত্রিবক্ক্, আছে মধ্যে সিন্দুরের ফোঁটা। হাতে কপাল পাত্র, তার মধ্যে যেন কিছু রাখা আছে। কতকালের জীর্ণ রক্তাম্বর, তা শতছিন্ন, চার দিকেই ঝুলছে। বাঁ হাতে এক ত্রিশুল সিন্দুর রঞ্জিত। দেখলাম চক্ষু রক্তবর্ণ, তিনি আপন মনেই, ধীর বিলম্বিত পদে আসচেন এই দিকেই ;—তাই না দেখে আমি ঐখানেই আটকে গেলাম।

সেখানে এখানকার গ্রামবাসী দু চার জন ছিল। তাঁকে দেখেই, ইয়ে দেখো বাবা আয় গেয়া,—বোলেই সবাই তটস্থ হয়ে আজ্ঞার অপেক্ষায় রইলো। তিনি এসেই, একটা-

বিস্তৃত শীলার উপর বসলেন। সবাই তখন একে একে তাঁর কাছে ঘেসতে আরম্ভ করলে। আগে এটা দেখিনি এখন দেখলাম প্রত্যেকের হাতে কিছু দ্রব্য আছে, একটা বেল, একটা কলা, একটা ন্যাসপাতি ফল। এই ভাবেই যার যেটা ছিল বাবার সামনে রেখে প্রণাম করলে। আমার হাতে কিছুই ছিল না। এখন কিনে এনে দেওয়ারও সময় নেই। আর কিছু করবারও ছিল না, কিন্তু আমি তা বলে চুপ করে স্থানুবৎ বসেও থাকতেও পারলাম না। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে প্রাণের আবেগে একটি প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়ালাম।

তিনি চেয়ে দেখলেন. একটু মুচকী হাসলেন, ফিরে আসপাশের গ্রামবাসীদের দিকে চেয়ে বললেন, বো সন্ত দেখো শ্রীকেদারকে যানে বালা। বৈঠে, বৈঠো, বোলে প্রসন্ন মনে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন,—আমি বসে পড়লাম। তখন তিনি সকলকেই, বৈঠো বৈঠো বোলে আদেশ করলেন তাতে সবাই যখন বোসলো, তিনি নিজেই দাঁড়ালেন। কি দীর্ঘ শরীর, নীচে বসে দেখছি,—বোধ হয় সওয়া ছয় ফুট লম্বা। এবার প্রসন্ন মুখে,— এ বাচ্চা, ভুখ লাগা কি নহি? বোলে, বালকদের মধ্যে যেন কাকে আহ্বানও করলেন।

একটি বারো চৌদ্দ বৎসরের বালক, হাঁ স্বামী, কুছ খিলায় দো। তখন, ক্যা খাওগে? জিজ্ঞাসা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটি তাঁর বাঁ কাধের ছেঁড়া লম্বা লম্বা ফালী ঝুলচে তার মধ্যে গেল। বালকটি তখনই বললে, কেলা, বাবা, একটো কেলা খিলাও। হাঁত তাঁর, একটি সুপুষ্ট, প্রায় বিঘৎ লম্ব একেবারে পাকা কলা নিয়ে বার হোলো,—ছেলেটা তখনই সেটা নিয়ে খেতে সুরু করলে। তারপর এক প্রৌঢ়, মাথায় টুপী, নেপালী ধরনের দেখতে,—তাকে জিজ্ঞাসা হোলো,—এ লৌণ্ডে, তুম ক্যা খাওগে? বুড়োকে লৌণ্ডে বলায় হেসে উঠল সবাই,—কিন্তু সে হাসলে না মোটেই, সে বোললে, খানেকো অব নাচাহি, চার পাঁচ রূপেয়া হোতে তো বহুৎ কাম হো যাতে। জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবার হাতটি আবার ঠিক সেই খানেই গিয়েছে, আর যেই টাকার কথা বলা অমনি সেই হাত বেরিয়ে এলো ছেঁড়া ফালি থেকে,—লে তোহার রোপেয়া, বোলে, তার হাতে ঝম্ করে পাঁচটি টাকা পর পর ফেলে, দিলেন। টাকাটা হাতে পেতেই সবাই ঝুকে পড়ে দেখতে গেল,গৃহীতা সবাইকে দেখালে তার টাকাগুলি। আমিও দেখলাম, টাকাগুলি চক্ চক্ করচে একটু ময়লা নয় করকরে নুতন, ১৯১২ সালের ছাপা। তারপর মেয়ে একটি এলো, কোন বাড়ির ঝিউড়ীই হবে, মাথায় চুড়া বাঁধা, দশ বারো বৎসরের মেয়েটি।

হামিকো এক চম্পা ফুলতো দো, বাবা। তাকে আসতে দেখে, আগে থেকেই বাবার হাত সেই জায়গায় ঠিক হাজির, বলবা মাত্রই একটি কনক চাঁপা, বেশ বড় আকার ফুল এ অঞ্চলে যা প্রায়ই হয় না সেই ফুল এলো বেরিয়ে;—সঙ্গে সঙ্গে তার গন্ধ, জায়গায়

আমরা যতগুলি বসে ছিলাম সবাই পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে হাতটি আবার সেই স্থানে গিয়েছে। এবার আমারি দিকে ফিরে, কিদার নাথ যানেবালা জি! ফির বোলো তুমারা ক্যা চাইয়ে? আমি মনে মনে স্থির হয়ে,কি চাইব যতই ঠিক করতে যাই কিছুতেই একটা বিশেষ বস্তু মনে স্থির হয় না,—সবাই হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে,—শেষে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—এক মৌরসিং মুঝে দে না। সঙ্গে সঙ্গে মৌরসিং এসে গেল আমার হাতে। যন্ত্রটি আমায় দিয়েই, তিনি বললেন, বাজাও তো ফির ক্যাসে বাজাতে। অথচ আমি বাজাতে ভাল জানি না, মোটামুটি যা জানি বাজালাম। শুনে তিনি খুশী হলেন না। দোঃ, বলে আমার কাছ থেকে নিয়ে, মুখে রেখে বাজাতে আরম্ভ করলেন;—কি সুন্দর সুর বার করলেন, সারঙ্গ রাগিনী, স্বর্গের সুর তাতে আছে, আমরা মুগ্ধ হয়ে সবাই শুনছিলাম। এই মৌরসিং হোলো দুই ইঞ্চি লোহার ত্রিকোণ মাঝে একটা তারের লাইন, যন্ত্র বিশেষ।

সবাইকে মুগ্ধ করে তিনি যন্ত্রটি আমার হাতে দিয়ে এক পা এক পা চলতে লাগলেন মন্দিরের দিকে। আমিও ছিলাম পিছনে পিছনে। আর সবাই যে যার কাজে গেল। আমি যখন একটু ফাঁকা পেলাম তাঁকে প্রণাম করে বললাম, বাবা, আজ ক্যা ম্যাজিক দেখলায়া। মুচকে হেসেই বললেন, আরে ইয়েতো দিল্লেগী সমঝো, উসিমে কুছহৈ নহি, জপ ধ্যানমে মন লাগাকরো, সব কুছ হো যায়গা। তার পর মুখের দিকে চেয়ে হাতখানা আমার মুখের সামনে এনে, দুই ভ্রুর মাঝখানে তাঁর তর্জ্জনীর একটু টিপ দিয়ে বললেন,—যাঃ অব যা,—আপনা রাস্তেমে।

সে রাত্র অদ্ভুত চিন্তা এবং নানা কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনে মৈখণ্ডিতে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন ভোরে উঠেই যাত্রা। মৈখণ্ডী থেকে ফাটা অনেক দূর তো নয়ই বরং কাছে বলা যায়, দুমাইলের মধ্যেই, তা ছাড়া এমন চমৎকার পথ, দূর থেকে দেখলে লোভ হয় চলতে। তবে কাছে যাওয়ার পর দেখা গেল চলবার পথটা প্রায়ই সোজা বটে কিন্তু মোটেই সুখকর নয় কারণ জীর্ণ পাথরের কাঁড়ির উপর দিয়ে সারা পথটা। কিন্তু এমনই সুন্দর তার পরিস্থিতি, যে যে স্থানের ভিতর দিয়ে পথটা গিয়েছে সর্ব্ব স্থানেই যেন স্বর্গের পবিত্রতা বিরাজমান। যদিও স্বর্গের সঙ্গে কখনই দেখা নেই আমাদের, অথবা তার কাল্পনিক ছবিও স্থির চিত্ত পটে আঁকাও নেই,—তা না থাক, তবু যখনই কোন উচ্চ স্তরের ভোগ অথবা স্থান মাহাত্ম্যের কথা আমাদের বুদ্ধিতে আসে কিম্বা অসাধারণ ক্ষেত্রে উপভোগ্য কোন তুলনাকেও আকর্ষণ করে আনে, তখনই স্বর্গের সঙ্গে ঐ দেশের মিল নিয়েই না আমরা দম্ভভরে মেতে উঠি! আর যতক্ষণ না আমার মানস স্বর্গের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারি ততক্ষণ ভাষার সপিণ্ডকরণ করতে থাকি। যাইহোক আমরা ফাটায় পৌঁছে গেলাম অল্পক্ষণেই। বেশ সুন্দর এবং প্রকাণ্ড স্থান এই ফাটা চটি।

ফাটা চটির কোথাও ফাটা নেই, সবটাই নিরেট আর তপোবনের মত চিত্তাকর্ষক, ধর্ম্মশালাও বড় চমৎকার। ডাক বাংলা যেমন হয়ে থাকে সেই রকম, চমৎকার পরিস্থিতির মধ্যে। এ দুই মাইল পথ আনন্দে বেশ ধীর বিলম্বিত লয়ে পার হয়ে এখানে যখন এলাম তখন নটার বেশী বেলা নয়। মৈখণ্ডে ঐযে আমার, রাত্র বাস সেটা শক্তির ক্ষেত্রে যদি কিছু পাওয়ায় যায় সেই আশায়,—এটা জেঠার ভাল লাগেনি। তার ইচ্ছা ছিল যখন এতটা লাভ এখানে হোলো, ভোজন, বস্ত্র ও উত্তরীয় লাভ, আবার দক্ষিণালাভ, তারপর আর এখানে থাকবার দরকার কি তখনই চলে এসে তো ফাটাতেই রাতকাটালে হোতো। তাতে রাজি হইনি, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাত্রবাস করলাম, তাহাতেই জেঠা অপ্রসন্ন ছিলেন আমার উপর। তাই, এখন ফাটা জায়গাটা আমার ভাল লাগলেও তিনি আমায় থাকতে দেবেন না।

ফাটাচটি, নামটি বিশ্রী কিন্তু স্থানটি ঠিক তার বিপরীত। নীচে নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল,—সেই স্রোতের তীরে স্তরে স্তরে শস্য ক্ষেত্রগুলি পাষান খণ্ড দিয়ে চিহ্নিত, স্তরে স্তর গিয়ে উপরে পথে শেষ হয়েছে। নদীতীর থেকে দাঁড়িয়ে উপর দিকে যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে তার সত্ত ফল এইটুকু দেখেছি মন থেকে ক্ষুধা তৃষ্ণা তো স্থুল কথা আমাকে অমর লোক পানেই টানে। গ্রাম খানি ঐ উপরে পথের একপাশে। তার পিছনে অত্যুঙ্গ হিমালয়ের ঐ স্তরে দেওদার শ্রেণী বিশাল পর্ব্বতের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। গগণস্পর্শী গিরিশীর্ষে সাধু তপস্বীদের গুহা এবং কোথাও কোথাও একখানি নিভৃত কুটিরে অস্তিত্ব সার্থক করে নরলোকের দৃষ্টির অন্তরালে সেই কুটিরের অধিবাসীকে বিশ্বরহস্যের কতভাবেই সন্ধান দিচ্চে।

একটি নারী, অনেকটাই উপর থেকে, আমি নীচে নদীর কুলেই দাঁড়িয়ে দেখচি, তর্ তর্ করে বোধহয় স্নান করতেই নেমে আসচে। কতকটা দূরে, উপর থেকে একটি ধারাও বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এসে দুর্দ্দান্ত মন্দাকিনীর এই ধারার সঙ্গে যেখানে সবেগে মিলেছে প্রায় তার কাছেই একটি চালাঘরের মতই ছোট্ট একটি গৃহ, তার মধ্যে মানুষ নেই, কিন্তু ঐ যে উপর থেকে মেয়েটি তর তর করে নেমে এলো, হাতে তার ধামার মত একটি পাত্রে, গম। কৌতূহলী হয়ে এবং একটু সাহস করে, কাছে গিয়ে আমি সোজা সুজি যখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ই কা বা? সে বললে, ই পানচাক্কি। অর্থাৎ জলস্রোত চালিত গম পেষা জাঁতা। এরা হাইড্রো ইলেকট্রিকের নাম জানে না, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই পার্ব্বত্য নির্ঝরের শক্তি নিয়ে জাঁতায় গম পেষনের কাজে লাগিয়েছে। একটি লোহার চাকায় পাঁচ ছ খানা কাঠের পাটা আঁটা, স্রোতের বেগ সেই এসে পাটাওয়ালা চাকাটি ঘোরায়, আর সঙ্গে গিয়ার সংলগ্ন থাকায় জাঁতা ঘুরতে থাকে, আর জাঁতার উপর দিকে গহ্বরে গম থাকে। সেই গোধূম চূর্ণ প্রত্যহ

গ্রামবাসীদের আহার। গ্রামের প্রধান ঠিক করে দেয় কোন দিন, কোন গৃহস্থ জাঁতাটি গম পেষানোর কাজে লাগাবে। দেখলাম, মেয়েটি ঐ ধামার গম বেশ তৎপর হয়ে যথাস্থানে ঢেলে রাখলে তারপর জাঁতার নীচে থেকে আটার রাশি সেই পাত্রে সংগ্রহ করলে, সেটা তার পিছনে কাঁধের উপর রেখে ধামার কিনারাটা হাতের মুষ্টিতে এঁটে ধরলে তারপর পায়ে পায়ে উঠে গেল উপরে, গ্রামের পথে। পানচক্কির কাজ দেখে আমার আনন্দ হোলো এই ভেবে যে, সভ্য সমতলভূমির নগরে নগরে যেটা এত বিদ্যুৎ খরচ করে ঘটাতে হচ্ছে এই সুদূর হিমালয়ের ক্ষুদ্র পল্লিতে তা সহজেই হয়ে যাচ্ছে।

আমার অত তাড়াতাড়ি চলে যাবার উদ্দেশ্যই ছিল না। যাবো তো সকল মহান তীর্থে, আমার চাকরির তাড়া তো নেই, যেখানে ভাল লাগে সেখানে যদি কিছু বেশীক্ষণ না থাকতে পাই তাহলে কি সুখে এতটা ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করে বেরিয়েচি? কিন্তু আমার এই মুরুব্বির উদ্দেশ্যই আলাদা সে অতশত বোঝে না;—এখানে এত সকাল সকাল যখন এসেছি তখন আরও চলো, পরবর্ত্তী চটিতে পৌছাও। যতটা পথ এগিয়ে থাকে ততই ভাল, এই হোলো তার সরল হিসাব।

এ-বেলাটা এখানেই থাকা যাক আমার এই ছিল মনে। কারণ, জায়গাটা আমার চক্ষে অত্যন্ত সুন্দর, চারিদিকেই মনোরম দৃশ্য, আর এতটা বেলাও হয়েচে, বেশ অনেকক্ষণ বেড়ানো, ঘুরে ফিরে দেখা যাবে। যে সব কারণে আমার এতটা আগ্রহ জেঠামশাইয়ের সেদিকে লক্ষ্যই নেই; তিনি বলেন, আজ আরও সাড়ে তিনটি মাইল যেতে পারলে রামপুর পৌছানো যাবে, রাস্তাও ভালো, চড়াই নেই। সেইখানেই ত থাকা ভালো। তারপর কাল প্রাতেই সাড়ে চার মাইল গেলেই ত্রিযুগীনারায়ণ ফুর্ত্তি করেই পৌছে যাওয়া যাবে;—সেখানে যত পারো থাকোনা কেন।

আমার কথাটা রইলো না সুতরাং জেঠামশায়ের যুক্তি, উপদেশ, সিদ্ধান্ত এবং দৃঢ়-পণের জয় ঘোষণা করে উঠতে হোলো রামপুরের পথে চলবার জন্য। চমৎকার সোজা পথ। ভেবে দেখলাম জেঠামশাইয়ের কথা যথার্থই হিতকর। চলতে চলতে দৃশ্যের আনন্দ উপভোগ ছিল। বেশ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে প্রায় মাইল দেড় আসবার পর খানিক নেমে একটি বেশ বড় ধারা পার হয়েই চড়াই আরম্ভ হোলো। শেষ দিকে এই চড়াই যে ছিল জেঠামশাই সেটি বেমালুম গোপন করে আমায় সুন্দর, সোজা ও সহজ পথের লোভ দেখিয়ে এই যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এখন খানিক চড়াই উঠে এক জায়গায় বসে একটু দম নিচ্চি—জেঠা এসে পৌছালেন। তখন বললাম, ইয়ে চড়াইকো বাৎ হামকো বোলা তো নহি? অম্লান বদনে একটু মুচকে হেসে তিনি বললেন, শুনো, বিন ইয়ে চড়াই উতার তেহুয়ে রামপুর যাওগে কৈসে? ইয়ে তো ছোটা, ইসসে ভি বড়হা চড়াই হৈ, ঔর আগে, ত্রিযুগীনারায়ণ পে পৌছতে। বেশ চমৎকার মানুষটি, সদানন্দ

ভাবটি তার ভালো—বেশী কথা না বোলে চড়তে গেলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আড়াই মাইলের চড়াই, পর্ব্বতশীর্ষে যখন পৌছালাম তখন সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। বড় বড় পর্ব্বত, তার শিখর বোলতে একথা যেন কেউ মনে না করেন সত্যই সেখানে শেষ। বরং বিপরীত, কারণ,—ঠিক তার সঙ্গেই বিশালকায় অপর এক ভূধরের আরম্ভ দেখতে পাবেন। অবশ্য আজ আর আমাদের সে পাহাড়ে উঠতে হোলো না কারণ,—আমরা অল্প একটু উপর নীচে করে গোধূলী লগ্নে রামপুর পৌছে গেলাম।

গঙ্গোত্তরী থেকে একটি পথ এখানে মিলেছে উত্তর কাশী হয়ে, ইচ্ছা করলে সে পথে কেদারনাথে আসা যায়। আবার যিনি ত্রিযুগীনারায়ণ দেখে কেদার যেতে না চান গঙ্গোত্তরীর পথে যেতে চান, অথবা যিনি ত্রিযুগীনারায়ণ যেতে বড় চড়াইয়ের শ্রম এড়াতে চান তিনি এই রামপুর থেকেই সোজা গৌরীকুণ্ডের পথ দিয়ে কেদার যেতে পারেন, বাধাই নাই। যাই হোক রামপুরে আমাদের আজ রাত্রিবাস,—এটা এয়োদশ রাত্র। এখানে একটু জলকষ্ট আছে, তবে ঝরণার জলে সকল কাজই সেরে নিতে হয়।

অনেক পর্ব্বতের উপর ভাগে প্রায় সমতল কতক ভূমির মত থাকে তার পরেই আবার এক মহামহিম শৃঙ্গধরের আরম্ভ। ফলে হয়কি, ঠিক এই দুটির সংযোগস্থলে অর্থাৎ এক পর্ব্বতশীর্ষ ও আর এক পর্ব্বতের পাদভূমিতে উপত্যকার মধ্যে এক প্রবল স্রোতস্বিনী মূর্ত্তির উদ্ভব দেখা যায়, আর তার উৎপত্তি হয় ঐ পিছনের বিশাল পর্ব্বত থেকেই। এমনই স্থানে রামপুর পার্ব্বত্য গ্রামখানি। দশ পনেরোখানি গৃহ আছে,—চটি আছে,—মুদীর দোকানও আছে, ধর্ম্মশালাও আছে কাজেই পড়াও হিসাবে তার অস্তিত্ব আছে। তা ছাড়া এখানকার জলবায়ুরও গুণ আছে,—সবারই শরীর ভালো, যাকে দেখি স্বাস্থ্যবান, এমন কি বিশেষ আশি পঁচাশী বয়সের বৃদ্ধারাও ডাঁটো, ক্ষেত্রে কাজ করে, হাতে লাঠি নিয়ে চলেনা। ব্রাহ্মণ ছত্রী, বয়েশ অর্থাৎ বৈশ্য ঘরের মেয়েরা সুন্দর, কারও কালো রং দেখিনি। এদিকে কালো বলে তাকে, যার লালচে, খানিক তামাটে রং; গাঢ় রক্ত পরিশ্রমী শরীর, রৌদ্র-বৃষ্টিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাই বর্ণ অত উজ্জ্বল থাকতে পায় না,—তাবোলে লাবণ্যের অভাব নেই। মেয়েরা সহজেই পথে চলাফেরা করচে। এ দিকটায় দেখেছি, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারের পথ পর্য্যন্ত মুসলমানদের বর্ব্বরতার হাত থেকে আগে থেকেই রেহাই পেয়েছে। গাড়োয়াল রাজ্য সে দিক থেকে কতক সৌভাগ্যশালী কিন্তু কুঁমাউ জেলা সেদিক দিয়ে মহা-দুর্ভাগ্যবান। অবশ্য তার জন্য ওখানকার হিন্দু রাজারাই দায়ী কারণ বড়ই অত্যাচারী হয়েছিল শেষদিকে পীড়িত হিন্দুর প্রয়োচনায় মুসলমানদের আগমন ও অঞ্চলে। ফলে সেই রাজবংশ উচ্ছেদও হয়েছে। গাহেভয়াল, অর্থাৎ গাড়োয়ালের রাজারা এখনও

পর্য্যন্ত বংশপরম্পরায় রাজ্যও বজায় রেখেছে হিন্দু রাজ্য পালনের সুনামও রেখেছে। যদিও ইংরাজের হাতে এ রাজ্য পরিত্রাণ পায়নি,—নির্ব্বিরোধী হলেও রাজ্যের কতকাংশ বৃটিশ গাড়োয়ালের নামেই অধিকার ছাড়তে হয়েছে। আরামপ্রিয় মুসলমানরা সারা হিমালয় রাজ্য বিশেষতঃ পাঞ্জাবের উপর থেকে হিমালয়ের মধ্যভাগ, তারপর নেপাল সিকিম ভুটান, এমন কি আসামের কোল পর্য্যন্ত সারা হিমালয়ের মধ্যে কোথাও প্রবেশ করেনি,—পাহাড় পর্ব্বত রাজ্য আক্রমণ কঠিন কাজেই সে সব অধিকারের মেহনত তাদের ধাতের সঙ্গে মেলে না, ঐ কুঁমাউর নিম্নাংশ পর্য্যন্তই তাদের গতি। সেইজন্য আলমোড়া জেলা বা কুঁমাউ বিভাগে সামান্য যা কিছু মুসলমান দেখা যায় তার তুলনায় গাড়োয়াল রাজ্যে অনেক কম। তা ছাড়া নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের সঙ্গে হিমালয়ের যে সম্বন্ধ ধর্ম্মের সেই পবিত্র সম্বন্ধের গভীরতার কিছুমাত্র হদিস মুসলমান রাজারা পায়নি সেইজন্য তখনকার ত্যাগি, ধর্ম্ম-জীবন সাধু-সন্ন্যাসীরা এই হিমালয়ে, বিশেষ গাড়োয়াল ও নেপাল রাজ্যের মধ্যেই আত্মরক্ষার সুযোগ পেয়েছিল;—সেইজন্য আরও কুঁমাউ বিভাগের চেয়ে সংখ্যায় বহু ধর্ম্মস্থান প্রসিদ্ধ মহাতীর্থ, সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রয় এই গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত। কৈলাস মানস সরোবর, ভস্মাসুরপুরী প্রভৃতি তীর্থ তো তিব্বতের মধ্যে, বাকী কাশ্মীরের অমরনাথ, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী কেদারনাথ বদরীনাথ থেকে নেপালের পশুপতিনাথ হয়ে আসামের পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত সকল তীর্থক্ষেত্রই হিন্দু অধিকারে বোলেই রক্ষা পেয়েছে এবং এখনও অপবিত্র হয়নি। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে ধর্ম্মবীরত্বের নামে যে নারকীয় বর্ব্বরতা নিয়ে ঐ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করেছিল শতাব্দির পর শতাব্দি কেটে গিয়েছে,—এখন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসেও তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। আজও তাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় দলপতিদের প্ররোচনায় তাদের নিরক্ষর সম্প্রদায় গ্রামকে গ্রাম হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ, ঘর-জ্বালানো নির্ব্বিচারে নরনারী শিশু হত্যা নারীধর্ষণ দলবদ্ধ-ভাবে চালিয়ে যাচ্চে,—কোন ব্যতিক্রম নেই। বৃটিশ আমলেও বন্ধ হয়নি তারপর ভারত বিভক্ত হবার পরও পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় নির্ম্মমভাবেই চলেছে;—তাই বলছিলাম ধর্ম্মের নামে একি অদ্ভুত পরিণতি ঐ সম্প্রদায়ের। অথচ এই হিন্দু আর মুসলমানেরা ঐ একই ভগবান মানে, পূজা করে নিজ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে।

ত্রিযুগীনারায়ণ—৪॥০

রামপুরের মায়া কাটিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণের পথে পা বাড়ালাম। গাইড হিসাবে জেঠামশাই একেবারে মাষ্টার গাইড। যখন দেখলে আজ এই পথটা সাড়ে চার মাইলের সবটাই বুকফাটা চড়াই, আর প্রথম নদীতীর থেকেই আরম্ভ হয়েছে তখন, সোজা কথায় আমায় ধীরে ধীরে চলতে উপদেশ দিলেন আর পিঠে বোঝা

নিয়ে তিনি যেমন সংযত পদে উঠছেন আমায় দেখিয়ে দিলেন,—এই সা উঠো, জলদি চঢ়োগে তো থক্ জাবেগা। ঔর মনমে ত্রিযুগীনারায়ণ স্মরণ করতে করতে চলো। ভূপতির ঠাকুরমা যখন চড়েছিলেন তখন যে মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করেছিলেন আমি নিশ্চয় বোলতে পারি। এক মাইলের মাথায় একটা বোর্ডে, ত্রিযুগীনারায়ণ, ৪ মাইল লেখা আছে।

এই পথের সবটাই বনপথ, আর রাস্তা বোলতে পাকডাণ্ডিই বুঝতে হবে। কখনও টিরী দরবার থেকে এই পথকে রাস্তার মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। এক পয়সা খরচ করবার দরকার হয়নি। এ পথ তীর্থ যাত্রীরাই আবিষ্কার করেছে, আর সেই আবাহমান কাল থেকে নিত্য নিত্য যাত্রীবর্গের পাদস্পর্শে যে স্থানটুকুতে জঙ্গল জন্মাতে পারেনি সেই অপরিসর স্থানটুকুই পথ হয়ে রয়েছে; আজ আমরা তারই উপর দিয়ে নারায়ণ দর্শনে চলেছি। কষ্টকর পথ সত্য কিন্তু পাশে ও উৰ্দ্ধে, দৃষ্টি ফেরালে যে সুধাময় দৃশ্য আমাদের চক্ষের উপর ধরা দিচ্ছে তাইতেই পথশ্রমের কথা আর চেতন মনে উঠতেই দিচ্ছে না। কিন্তু তা সত্বেও একটা দুঃখ্য চাপাদেবার উপায় নেই, সেটা তৃষ্ণা। এ পথে একটি মাত্র ধারা বা ঝরণা আছে, শুনেছিলাম মাঝখানে, কাজেই যতক্ষণই পথের সেই মাঝখানে না আসচি ততক্ষণ মাঝখানের নির্ঝর কোথায় পাবো? এই তৃষ্ণার প্রাবল্যে মরীচিকা দেখিয়ে ছিল। জঙ্গলময় পথে চড়াই, উঠে যাও আর কোন কথাটি নাই।

একটি পাহাড়ের পথে চড়তে চড়তে মনে করচি এবার শিখর দেশে উঠে একবার চারদিক ভাল করে, বহুদূর দূরান্তর দেখে নেবো, কি চমৎকারই হবে শিখর দেশে উঠলে। উঠলাম এই পর্ব্বতের শিখর দেশে কিন্তু কোথায় শীর্ষ? কোথায় সে দৃশ্য? সামনেই দেখি আবার একটা অত উঁচুই অভ্রভেদী, দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেও পাহাড়, কেবল একটা দিকে ফাঁক অনেকটা দূর দেখা যায়। বুকটা গুর গুর করে উঠে ঐ দৃশ্যের পানে তাকালে। একই সঙ্গে আনন্দ আর ভয় অন্তরে যুগপথ ক্রিয়া করতে থাকে এমনই এই স্থানটি আমাদের ত্রিযুগীনারায়ণ পর্ব্বতের মধ্যে। বুঝা গেল এই যে এই যে চড়াই পথটি, একটি নয় উপরি উপরি তিনটি পর্ব্বত অতিক্রম করতে হয় আর শেষ পর্ব্বতের নাম ত্রিযুগীনারায়ণ,—ঐ খানেই নারায়ণের স্থায়ী কীৰ্ত্তি ঐ যজ্ঞাগ্নি, যা নাটমন্দিরের মধ্যে রাখা আছে।

মধ্যে একটু কষ্টকর পথ, যথার্থ চলার পথটার ধ্বস নেমেই এমনটা হয়েছে, তা বুঝতে কষ্টহয় না, কষ্ট হয় ঐ স্থানটা অতিক্রম করতে। এমনই এক একটা পথ এদিকে। ঘোর বর্ষায়, এক একটা বড় বড় ধ্বস নেমে পথটি অনেকটাই বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। সে বিশৃঙ্খলতা এখানে উপেক্ষিত হয়েছে কিন্তু ও দিকে যে পথে বদরী-

নারায়ণ যেতে হয় সেই সুরক্ষিত পথে সরকারী ব্যবস্থা আছে, তখনি তখনি পি, ডাবুলু, ডি, এঞ্জিনীয়ার চটপট ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়। যাই হোক এইভাবে আমরা সাড়ে চার মাইল উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিপ্রহরে পর্ব্বত শৃঙ্গে ত্রিযুগীনারায়ণের অধিকারে মন্দির অঙ্গনে গিয়ে পৌছলাম। শেষদিকে এখন আর অত কষ্টকর পথ নেই পূর্ব্বে যেমন ছিল। আগে যাঁরা গিয়েছেন, তাদের বলতেই শুনেছি যে, পথ অনেক ভাল হয়েছে। আসলে সবাই জানে এই তীর্থ অতীব প্রাচীন, বিরল যাত্রী সমাবেশ এ পথে, সাধু সন্ন্যাসী ব্যতিত, কেদার বদরীর সাধারণ যাত্রীরা যায় না। তাই টীরী সরকারেরও এতটা গা ছিল না। এখন অনেক ভদ্র গৃহস্থ ত্রিযুগীনারায়ণের পথে যাতায়াত করছেন সেই জন্যই পথে আর অতটা দুঃখ নাই। তবে চড়াইটি চড়াই আছে তাকে উৎরাই বা ময়দান বা সমতল করা যায়নি। একথা সত্য মোটর রোডও হবার নয় সে পথে। এখন শেষদিকের পথটা চৌড় পাইন বা কেলু সবই আছে, আর প্রচুর আছে। দেওদার ও কম নয়, এ পথের উচ্চ-স্তরে,—উপরে উঠে দূরের দৃশ্য যা দেখা যায় তাতে এমনই একটা মাদকতা আছে, অনেক সময় দেহজ্ঞান রহিত হয়ে যায়, তখন যন্ত্রবৎ পা চলে, কিন্তু পথ ভুল বা অসামাল কিছুই হয় না। যাই হোক এখন আমরা ত্রিযুগীনারায়ণে গিয়ে মহা আনন্দে এক ধর্ম্মশালায় উঠলাম। বাবা কমলীবালার ধর্ম্মশালার অবস্থা ভাল নয়, তাই উঠিনি। শুনলাম কাশী থেকে বহু দণ্ডী এসেছে এবং সেই প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালার সবটাই অধিকার করে আছেন।

এখানে দেখলাম সাধারণ যাত্রী বেশী ছিল না, যখন আমরা পৌচেছিলাম। একদল দণ্ডী সন্ন্যাসী, কাশীতে পথেঘাটে যাঁদের অনেক দেখা যায়, সেই শ্রেণীর প্রকাণ্ড দল একটা, ধর্ম্মশালার সবটা কি ভাবে দখল করেছেন সেটা তার মধ্যে গিয়ে স্বচক্ষে এক নজর দেখে এলাম। বেশীভাগই প্রৌঢ়, তবে স্বাস্থবান যে সেকথা না বললেও চলে। বেশী ভাগই কাঁচাপাকা চুল এক পক্ষকাল ক্ষৌরী না হলে যতটা হয় ততটাই।

৬

ত্রিযুগীনারায়ণ

এবার স্নানাহারের যোগাড়। জেঠা আজ আমায় বোধ হয় অত্যন্ত ক্লান্ত দেখেই অপত্য স্নেহবশে অনেকটাই সাহায্য করলেন। দিন মানে দুটি ভাত মাত্র আমি, বাকী সব কিছু, রুটি শাক আবার রাত্রের জন্য রুটি তাও তিনিই পাকিয়ে রাখলেন। রাত্রে আমায় আর পাক স্পর্শ কর্ত্তে দিলেন না। রুটি বললাম, আসলে ও গুলি ঘৃতসিক্ত পরোটারই নামান্তর। সেথা পৌচে এক ঘণ্টা স্নানাহারের জন্য বাকী সময়টা ঐ দিন

চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতেই গেল। শীত এখানে প্রবল ছিল। দিব্য এক জটলা করে এক প্রহর রাত্র কাটানো গেল। আলো আমার সঙ্গে ছিলনা, তিন ডজন বাতি সঙ্গে ছিল, তা থেকে, মোটে তিনটি খরচ হয়েছে এতদিনে। এখানেও আমায় বাতি জ্বালাতে হয়নি, যাত্রীদের সঙ্গে এক ডিজ ল্যাম্প ছিল,—সেইটাই সারা ঘর যথাসম্ভব আলো করেছিল। বেশ বড় ঘর, ভাল মালমসলায় তৈরী হলে তাকে হল্ বলা যেতো কিন্তু কাট পাথরের মোটা মুটি কাজ বোলে স্থূল পাহাড়ও জঙ্গলের মাঝে এক ধর্ম্মশালা মাত্র।

সেই হলে সন্ধ্যার সময় থেকেই সব জড়ো হয়েছে। যাত্রী সংখ্যা বারো তেরোজন তা ছাড়া সন্ন্যাসী দণ্ডীও ঐ সংখ্যক হবে। তার মধ্যে প্রবীন নবীন সব রকমই আছে। প্রবীন দু'তিন জন নিজ শয্যায় শুয়ে শুয়েই দেখছিলেন, নবীন সন্ন্যাসীরা একটু অস্থির হয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একটু মিলবার চেষ্টা করছিলেন বোধ হল, যাত্রীরা তো গৃহস্থই, তারা সাহস করে এগিয়ে যেতে পারছিল না, হাজার হোক সন্ন্যাসী, ত্যাগী গুরু স্থানীয় তো বটেই। ক্রমেই দেখলাম সন্ন্যাসীরাই অপর যাত্রীদল থেকে দু'তিনজনকে আকৃষ্ট করে বেশ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমারও সেটা খুব ভাল লাগলো যে হেতু আমিও মিলতে চাইছিলাম যে। এখন শনৈঃ শনৈঃ গিয়ে তাদের কাছে বসলাম, আর শীঘ্রই দলে ভিড়েও গেলাম। ক্রমেই দেখলাম আলোর কাছে একখানা ছোট থালাও পড়েছে ইতিমধ্যে দু একটা পয়সাও তাতে এসে গিয়েছে। বেশ ভক্তি করে করজোড়ে বোসে যাত্রীরা শুনছিল, সাধুদের কথা, তারা কোন দেশের লোক তা বলতে পারিনা তবে মনে হয় রাজপুত না হয় হিন্দুস্থানী বোলেই মনে হোলো।

কথা হচ্ছিল ভালো, এই ত্রিযুগীনারায়ণেরই কথা, সন্ন্যাসীদের একজন বলছিলেন, পুরাণ শাস্ত্রমে এইসাই লিখা হৈ, যে, ইয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ পূরা তিনো যুগ সে ইহা ঠারা। ঔর দকষ্ (দক্ষ) প্রজাপতি নে ইয়ে নারায়ণ কো হিঁয়া স্থাপিত কিয়া, ঔর বোহি কালসে ইহাঁ উনিহিকো পূজা চলাহা, কভি বন্ধ হুয়া নহি। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভি ইহাঁ বহোত তপাস কিয়া থা, আখির মে, কেদারজি মে শরীর ত্যাগ করনেকো সংকলপ্ কিয়া, ঔর উসকি আগে আপনা কাম পুরা করনেকোবাস্তে যোশীমঠমে আপনা মঠ স্থাপন করকে, ফির বদরী নারায়ণ কো মন্দির, পূজা, ঔর কেদারনাথজীকো মন্দির স্থাপন কিয়া। যব সব আপনা কাম পুরী হো চুকা তব কেদারনাথজীমে আপনা আসন পে বৈঠকর, দে ছোড় দিয়া। আখির মে ভগবান, হিমালিয়া কো ছোড়কে কভি কাহা গিয়া নহি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাশেষ হোলোনা। কতক্ষণের জন্ম একটু বিরাম মাত্র। এই গ্রামেরই লোক, স্পষ্টই বুঝেছিলাম এরা যাত্রী নয় কারণ এখানকার

যাত্রীরা কেউ বাকী ছিল না, যারা এলো তারা পরে খবর পেয়েই এসেছে, তাই প্রথম আরম্ভে এদের দেখা যায়নি। এর পর আবার বক্তৃতা চলতে লাগলে, সেটা আমি আর হিন্দিতে না বোলে সংক্ষেপে আমার কথায় বলচি। তবে এটুকুও বলে রাখি ঐ যে আলোর কাছে থালটি, ক্রমে ক্রমে বেশ ভরেই উঠছিল, যাত্রীরা এবং
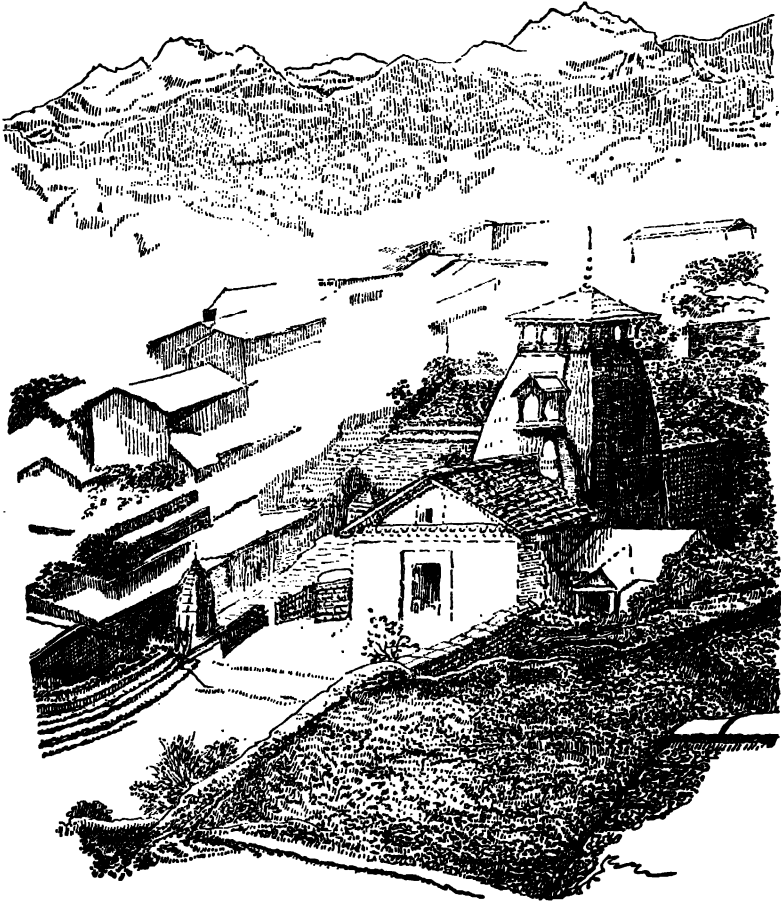
গ্রামবাসীরা কতদূর সদ্বিবেচক শেষে তার পরিচয় পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গিয়াছিল। যখন আবার কথা আরম্ভ হল ঐ ত্রিযুগীনারায়ণকে লক্ষ্য করেই আরম্ভ হয়েছিল আর তার সঙ্গে এখানকার ঐতিহাসিক কিছু থাক বা না থাক পৌরাণীক ভূগোল ও ঐতিহ্য প্রভৃতি নানা তথ্যই ছিল।

তিনি আরম্ভ করলেন, এই মধ্য হিমালয়ের মধ্যে, ত্রিযুগীনারায়ণের ক্ষেত্রটিকে

কেন্দ্র করে চারিদিক থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম চারিদিকের সবটাই দেব-রাজ্য। পূর্ব্বে ও দক্ষিণে অলকনন্দা পশ্চিমে যমুনা, উত্তরে হিমালয়গিরিসঙ্কট তার বিস্তার কাশ্মীর থেকে বরাবর নেপালের সীমা পর্য্যন্ত স্থানই দেবরাজ্য। এই সকল স্থান আগে লোকের অগম্য ছিল, ভগবান শঙ্করাচার্য্যই এই সকল তীর্থই উদ্ধার করেন এবং প্রথমে যমুনোত্তরী তারপর গঙ্গোত্তরী তারপর কেদার তারপর বদরীকাশ্রম আবিষ্কার করেন এবং ঐ সকল স্থানে তীর্থের উপযোগি করে, দেব-দেবীর মূর্ত্তি স্থাপনা করে তীর্থকে জাগ্রত করেছিলেন। এই সকল স্থানে যাবার পথ, এবং মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য গাড়োয়ালস্থ পালরাজারা, তাছাড়া উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য রাজারাও অনেক ধন এবং জনশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিল। তারপর শঙ্করের দেহত্যাগের পর অনেক কোন কোন অজ্ঞাত তীর্থ, অনেক মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং কোথাও কোথাও দেব-দেবী স্থাপনা করে গিয়েছেন। আজ তাই এই হিমালয়ের মধ্যে বিশেষতঃ ভাগীরথী আর অলকনন্দার মধ্যে এবং উত্তরে ভোট অর্থাৎ তিব্বৎ আর দক্ষিণে শিবালিকা এই স্থানের মধ্যে প্রায় সহস্র তীর্থের উদ্ভব হয়েছে। শঙ্করাচার্য্য উত্তর হিমালয়ে যা করেন উত্তর কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাই করেন ফলে বৃন্দাবনাদি তীর্থের জন্ম, অবশ্য সেটা অনেক পরের কথা। এ প্রসঙ্গে একথাও সত্য যে প্রতি ছয় বৎসরে অর্দ্ধকুম্ভ এবং দ্বাদশ বৎসরে পূর্ণকুম্ভ, হরিদ্বার প্রয়াগ ও নাসিক এই তিনটি স্থানেই যোগাযোগ ঘটে। হরিদ্বারে চৈত্রমাসে, প্রয়াগে মাঘমাসে এবং নাসিকে শ্রাবণ মাসে এই কুম্ভ উপলক্ষ্য করেই ভারতের সর্ব্বস্থানের সাধুদের পূর্ণ সমাগম হয়ে থাকে, ঐ সূত্রে কুম্ভ স্নানের পর থেকেই আসমুদ্র হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে সাধুরা পরিভ্রমণ করেন। তাঁরাই ভারতবর্ষের সকল তীর্থ জীবন্ত করে রেখেছেন। যদি একবার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই হিমালয়ের সকল তীর্থ কেউ ভ্রমণ করে যেতে পারেন তিনি দীর্ঘায়ু হবেন এবং স্বাস্থ্য তাঁর অটুট থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে ধর্ম্মলাভ হবে। সেই আনন্দময় পরিবর্ত্তনে জীবন ধন্য হবে।

এর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক তথ্য আছে, সেটা এই যে; ঐ যে তিনটি স্থানে কুম্ভ-যোগ, একটি হিমালয়ে, হরিদ্বারে, অপর দুটির একটি প্রয়োগে অর্থাৎ উত্তর ভারতে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে এবং অপরটি নাসিকে অর্থাৎ মধ্য ভারতে। ছয় বৎসরে অর্দ্ধ এবং দ্বাদশ বৎসরে পূর্ণ কুম্ভযোগ; অর্দ্ধ কুম্ভে অর্দ্ধ সমাবেশ, আরপূর্ণ কুম্ভ যোগে ভারতে সন্ন্যাসীদের সকল সম্প্রদায়েরই পূর্ণ সমাবেশ হয়। পূর্ব্বাপর এ নিয়ম যতকালই থাক সন্ন্যাসী সম্রাট শ্রীহর্ষমহারাজের দ্বারাই এর মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। বৌদ্ধ হলেও তিনি গৃহত্যাগী বা ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী বা শ্রমনদের মধ্যে ভেদ করতেন না। নিজেও ত্যাগীর শিরোমণি ছিলেন। সারা ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ত্যাগী শ্রমনাদির মিলন ঐ কুম্ভ যোগ উপলক্ষে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘশক্তির বৃদ্ধিই তাঁর কাম্য ছিল।

এইভাবে ত্রিযুগীনারায়ণের বাবা ধরমবরের পুণ্য পান্থশালায় প্রথম রাত্রে আমাদের অনেক কিছু তীর্থ-মাহাত্ম্য শোনা হোলো। শ্রোতারা প্রত্যেকেই সাধুদের কিছু কিছু দিলে দেখলাম, আমিও মাত্র একটি টাকা থালের উপর রেখে প্রণাম করলাম। আমি কখনই এভাবে কিছু দিইনা, কিন্তু একটা কারণে এক্ষেত্রে আমায় যেন বাধ্য করলে কিছু দিতে। দেখি কি? জেঠামশাই কখন শ্রোতার দলে ভিড়েছিলেন লক্ষ্য করিনি। যখন কথা শেষ হোলো, আর পাঁচ জনের সঙ্গে সেও গাঁট থেকে কিছু বার করে থালায় রাখলে, বোধ হোলো যেন একটা আধুলীর মতই একটা কিছু হবে। এই না দেখেই আমার মধ্যে বেশ একটা দন্দ বেধে গেল, শেষে আমিও সার্থক করলেম সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের পরিবর্ত্তে কিছু দক্ষিণা দিয়ে। শেষে জেঠামশাই আমায় আপনা থেকেই বুঝিয়ে দিলেন, ভাগবৎ কথা, সৎপ্রসঙ্গ, জ্ঞান বা ধর্ম্মের কথা, সঙ্গীত, ভজন গান, যে কোন উপদেশ, তীর্থের প্রসঙ্গ, রামায়ণ মহাভারত কথা, সাধুদের মুখে শুনলেই কিছু দিতে হয়,—এটা গৃহস্থাশ্রমীদের কর্ত্তব্য। না দিলে কালা হয়ে যায়, কানে আর কিছুই শুনতে পায়না।

জেঠার কথা শুনে বাড়িতে আমার নিজের ঠাকুরমার কথা মনে পড়লো, তিনি অবিকল এই কথাই বোলেছিলেন একবার শুনেছিলাম। তখন আমি বালক, আমাদের বাড়িতে রামায়ণের গান হোতো;—এমন দুই তিন মাস হয়েছিল। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি থেকে মেয়েরা আসতো, বিশেষতঃ বিধবারা কেউ বাকী থাকতো না! ষষ্ঠির মা বোলে পাড়ার বসাকদের ঘরের একজন স্বচ্ছল গিন্নি গোচের বিধবা রোজই আসতো, একদিনও কামাই ছিলনা। কিন্তু প্রত্যহ নয় প্রতি রবিবার একটি পয়সার বেশী কখনও দিতোনা। কোন এক-একটা বিশেষ দিনে, যেমন রামের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের উপলক্ষে পালা গায়কের অনেক কিছুই লাভ হোতো। মেয়েরা, প্রত্যেক সংসারের ধর্ম্মপ্রাণ বিধবারা জিনিস-পত্র, কাপড়-চোপড়, চাল ডাল মসলা সিদা দিতো। ষষ্ঠির মা কিন্তু রবিবারে ঐ নগদ এক পয়সার বেশী কোনও দিনই দেয়নি। তাই ঠাকুরমা দেখে দেখে, শেষ দিনেও যখন একটি পয়সা দিয়ে উঠে যাচ্ছে তখন তাকে বোলেছিলেন, যার যেমন সাধ্য না দিলে কালা হয়। তাতে সে বললে আমার যদি ওর বেশী না দেবার অবস্থা হয়। যার এক ছেলে উকিল, এক ছেলে ডাক্তার, তার মায়ের মুখে একথা শোভা পায়না, ঠাকুমার মুখে একথা শুনে সে বললে কি? আমি তো ভাই সঙ্গে এর বেশী আনিনি, বেশী আনলে দিতুম। এই দেখ, আঁচল আমার। বোলে আঁচলটা দেখিয়ে ঠাকুরমা ও পিসিদের অবাক করে চলে গেল।

পরদিন আমি প্রাতঃকৃত্য শেষ করেই একটু ঘুরে আসতেই বেরিয়ে পড়লাম। যেখানে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির তার অঙ্গনের পাশেই দুতিনখানা ঘর লম্বা-লম্বা।

যাত্রীশালা যে কয়টি এর মধ্যেই আছে। তাছাড়া ধরমবীর বাবার ধর্ম্মশালাও আছে। মন্দিরের পুরোহিত আছেন, তিনি দণ্ডী স্বামী। আগে অর্থাৎ পূর্ব্বকালে হিমালয়ের প্রধান প্রধান তীর্থে, অর্থাৎ যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী কেদার ও বদরী এই চার ধামের সব কিছুই দণ্ডী স্বামীর হাতে ছিল এখন তার অনেক ব্যতিক্রম হয়েছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য গৃহীদের এই সকল মহাতীর্থের দেব-সেবার অধিকার দেননি, তিনি পবিত্র এই কর্ম্মে তাঁর সম্প্রদায়েরই জ্ঞানী ও সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসীদের দ্বারাই দেবসেবার কাজ চালাবার ব্যবস্থাই করেছিলেন এবং বহু শতাব্দী ধরেই ঐ বিধিই চলেছিল। সম্প্রতি গত শতাব্দীর শেষ দিকে গৃহী, দক্ষিণ ভারতের নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরাই এসে অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আপন দেশও জন্মস্থানের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ হিমালয়ের সকল ধামেরই পূজাধিকার গ্রহণ করেছেন। এ অধিকারের ইতিহাস সকল দিকেই গুরুত্বপূর্ণ, এটা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ত্যাগের দৃষ্টান্তই এ ক্ষেত্রে বড় কথা।

চারিদিকেই অভ্রভেদী, তার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর, স্বচ্ছ প্রভাতে উত্তর পূর্ব্ব কোণের দিকে ধবল শৃঙ্গ, কেদারনাথের উপরিস্থিত তুষার অনেকটা দেখা যায়। সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত, তার উপর দূরত্ব হেতু একটা ক্ষীণ কুয়াশার পরদা সেই জন্যই মায়াময়,—দেখতে দেখতে ক্রমশ শুভ্র থেকে শুভ্রতর হতে থাকে,—তারপর আর তার মায়াময় রূপ থাকে না আর। সূর্য্যোদয়ের সময় আর অস্তকালে বর্ণ সমাবেশ এক মায়াজাল সৃষ্টি করে।

সকালে দেও দর্শনের পালা সাঙ্গ করে একটু নেমে এলাম খানিক ঘুরে ফিরে দেখবো বোলে। দেওদর্শনের কথা একটু আছে,—এখানকার মুখ্য পূজারির কথা পরে বলছি, দেখি তাঁর সহকারী এবং অনেক কিছু আমাদের চক্ষে বৈচিত্র্যময়। প্রথম বৈচিত্র্য হল এদের পোষাক। আমরা বাঙ্গালী হিন্দু, ভট্টাচার্য্য বা পুরোহিত নিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সংস্কারগুলি সার্থক করে থাকি। আমাদের পুজারী একরকম, তাদের বেশ ভুষাও দেশের প্রথানুযায়ী, কাপড় ও চাদর উত্তরীয় যাকে বলে, নগ্ন মাথায় সূক্ষ্ম টিকি, শিখা তাকে বলা যায় হয়তো। তা ছাড়া আর কিছু এমন নেই যা উল্লেখযোগ্য। এখন, হিমালয়ের মধ্যে এ অঞ্চলের পূজারীর পোষাক বৈচিত্র্য দুরকম দেখেছি। এক শ্রেণীর চুড়ীদার পাজামা তার উপর চাপকান, মাথায় পাগড়ী, কানে সোনার আংট্, পৌরাণীক নাম তার কুণ্ডল। আর ঐ চাপকানের উপর লম্বা গোছা করা চাদর। তারপর দ্বিতীয়, আর এক রকম, ধুতি পরা, চাপকান বা আচকান গায়ে, তার উপর চাদর, মাথায় একরকম বেঢপ টুপী। সবার উপর গলা থেকে ঝুলছে, এক চাদরকে কুঁচিয়ে যথা-সম্ভব ফুলের গোছার আকার, গাঁটে গাঁটে সুতা বেঁধে পুষ্পমালার পরিবর্ত্তে ব্যবহার, এক বিচিত্র ব্যবহার এদিকে। ফুলের রং কোনটা লাল, কোনটা পীত, এসবও আছে তার

মধ্যে। পাগড়ীও টুপী দুই রকমই আছে। তবে গরম কাপড়ের কানঢাকা টুপীর চলন শীত প্রধান অঞ্চলেই বেশী। চাপকান, সাদা বনাতের মতই গরম কাপড়ে প্রস্তুত যা সারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত। আঁজানুলম্বিত সেই চাপকান বা আচকান, স্থানীয় মুখ্য পূজারীর অঙ্গ রক্ষা ও শ্রী বৃদ্ধি করে। তারপর প্রাকৃত ফুলের মালার অভাবেই কাপড় কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে বেশ মোটা গোছের মালার আকাড়ে তৈরী সেটি ঐ মুখ্য পূজারীর গলাতেই থাকে দেখেছি' তারপর তৃতীয় বৈচিত্র্য যেটা গোঁফ আছে কিন্তু দাঁড়ি কামানো। সে গোঁফের পরিপাট্যও আছে। আমাদের দেশে পূজা অর্চ্চনার কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা গোঁফ কখনই রাখেন না। সত্য সত্যই যে কারণে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের মুখের দাড়ি গোঁফ একেবারে ক্ষোরী হওয়ার বিধি সেটা হোলো কেশ সর্ব্বদাই অপবিত্র বোলে। বিশেষতঃ গোঁফদাড়ি অপবিত্র এবং পূজার্থে আচমনাদি কর্ম্মে ব্যবহৃত ঐ জল চুল স্পর্শ করেই মুখের মধ্যে আসে সুতরাং তার পবিত্রতা নষ্টই হয়, এটা অবাঞ্ছিত। তা ছাড়া সর্ব্ববিধ ভোজনের কর্ম্মে দাড়ি গোঁফ কোনটাই স্বচ্ছন্দ কর নয়। এই সকল কারণেই পবিত্র কর্ম্মে একেবারে মুণ্ডনই ব্রাহ্মণদের প্রধান এবং বহু, প্রাচীন নিয়ম। তারপর, কেশশ্মশ্রু, এগুলি পশু ভাবেরই ধারা মানুষ জন্মেও পশ্চাদ্ধাবণ করে এসেছে। এই ভাবের অনেক কিছুই বিচার, ব্রাহ্মণ জাতির এই মুণ্ডন সংস্কারের মধ্যে রয়েচে। এখানে এই গাড়োয়াল রাজ্যেই এর ব্যতিক্রম দেখলাম। পূজারী অথবা দেব সেবক ব্রাহ্মণকে মোচা গোঁফ নিয়েই নিত্য পূজায় নিযুক্ত দেখতে অস্বাভাবিক লাগে-নাকি? অবশ্য ফ্যাসানের জন্য দাড়ি গোঁফ রাখা অথবা না রাখা সে কথা স্বতন্ত্র, এখানে পূজার্চ্চনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্যিক দৈব কর্ম্মের ক্ষেত্রে একটা রাখা আর একটা কামানো এ কেমন লাগে। সেই কারণেই বোধ হয় আচমনের সময় ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু বোলে, করতলের জল অধরোষ্ঠে গ্রহণ করার পদ্ধতি যা আমাদের দেশে প্রচলিত, এদিকে, তার পরিবর্ত্তে জলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর মধ্যমা এই দুটি আঙুলের ডগায় নিয়ে, হাঁ করে মুখ গহ্বরের মধ্যে ছিটা দেওয়াতেই আচমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হয়। এই নৈতিক অধঃপতন ভারতের উত্তরভাগেই, দক্ষিণে এসব নেই।

তবে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে মরদের বিশেষ মহিমা ঐ গোঁফের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। মোচকে পাকিয়ে পাকিয়ে দুই প্রান্ত কৈসার ফ্যাসানে একেবারে উপরের দিকে তুলে দেওয়টা এ ভারত-ভূমিতেও বীর পুরুষের চিহ্ন। কাজেই দেব পূজায় ব্রতী হোলেও পুরুষের পৌরুষ খাটো করতে এঁরা চান না এইটিই আসল কথা। যাই হোক এখানকার যিনি প্রধান, তিনি একজন মহাশয় ব্যক্তি, দণ্ডী,—সন্ন্যাসী, মুণ্ডিত তুণ্ড, পরে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। এখন পাণ্ডাদের ঘর ছাড়িয়ে কতকটা উপর দিকে ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম যদি কোন গুহাবাসী যোগী সাধক ভাগ্যে মিলে যায়।

গাছ পালার মধ্যে ছোট ছোট ঝুপি জঙ্গল, বড় গাছের সঙ্গে সম্পর্কই নেই এদিক। রাস্তাটাই ভাঙ্গা পাথর আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা গাছ তার কঠিন আঁকাবাঁকা ডাল, ছোট ছোট পুরু পুরু পাতা,—তার একপিট সবুজ অপর পিট লালচে। পর্ব্বতের এক একটি স্তরে যে সব ঘর তৈরী হয়েছে, সবই নীচু হলেও বেশ লম্বা লম্বা ব্যারাকের মত, ভিতরে আলোর অভাব। জানালা যদিও আছে, তাতে পর্য্যাপ্ত আলো আসে না কারণ, খুব বড় জানালা যেটি এক হাতের বেশী উঁচু হবে না। তার উপর উত্তর দিকে কোন ঘরেরই জানালা নেই। পারতপক্ষে এরা কোন ঘরের উত্তর দিকে কোন ফাঁক রাখতে চায় না, না দরজা, না জানালা। দক্ষিণ দিকেও কোন দরজা রাখবে না, কারণ ওটা যম-দুয়ার। যেহেতু দক্ষিণ দিকের সঙ্গে যমেরই সম্পর্ক। বাকী পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দু দিকেই যা কিছু দরজা জানালা সবই। এইভাবে ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দিরের তিনদিকে ছড়ানো কোনটা একটু উঁচু কোনটি বা একটু নীচু স্তরে এমনই প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ খানি গৃহ নিয়েই তীর্থ স্থান। নারায়ণ মন্দিরতল থেকে সব ঘরই উঁচু স্তরেই নির্ম্মিত।

ভগবানই জানেন যে আমার আন্তরিক ইচ্ছা এখানে দুচার দিন থাকি। কিন্তু জেঠা-মশাই রাজী নন। তিনি বলেন এই ভয়ঙ্কর শীতে মানুষ এখানে থাকে ? বরং শীঘ্র শীঘ্র যেতে পারলেই গৌরীকুণ্ডে ভালো বেশ সুখে থাকতে পাবো ; এখানে আমাদের কোন দরকার নেই। জেঠামশাই ভেবেছিলেন অন্যান্য বিষয়ে যেমন তার সব কথাই শুনে বা মেনে আসচি এবারেও তাই হবে। কিন্তু তা ঘটেনি কারণ, এখানে থাকতে আমার আন্তরিক, একটা অদম্য ইচ্ছাই হয়েছিল এবং মনে মনে সংকল্পই করেছিলাম অন্ততঃ তিনটি রাত্র নিশ্চয়ই থাকবো। প্রায় তাইই ঘটেছিল, থাকাটা বৃথা হয়নি নারায়ণের কৃপায়।

এখানকার সবার কথা ছেড়েই দিচ্চি, জেঠামহাশয়ের ধারণা এ অঞ্চলের তুলনা নেই। রুদ্র প্রয়াগ থেকে বরাবরই মন্দাকিনী ধারা। তার মধ্যে জেঠামশাই বলেন গৌরীকুণ্ড সবার সেরা এমন রহস্যপূর্ণ স্থান আর কোথাও আছে কি ? এখানে গৌরী তপস্যার দ্বারা নারায়ণকে তুষ্ট করে শিবকে পতিরূপে পাবার বর লাভ করেছিলেন। সেই তপস্যার সিদ্ধি; এই গৌরীকুণ্ডেই তো ? নারায়ণ যে বিবাহে পৌরহিত্য করেছিলেন সেই হোমের অগ্নি ত্রিযুগ ধরে রক্ষিত হয়ে এসেছে এটা হোলো ত্রিযুগীতে। এখনকার গৌরীকুণ্ডই সবার বড় স্থান, গিয়ে দেখবে। মন্দাকিনীর শীতল জলের কাছেই আবার উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। কি তপ্ত জল তাতে চাল দিলে ভাত হয়ে যায়। সেই প্রস্রবণের জলও গিয়ে মন্দাকিনীর ধারায় মিশেছে। আশ্চর্য্য এই গৌরীকুণ্ডের কথা। আমি বলি পরে হবে এখন থাক।

ত্রিযুগীনারায়ণের যে গ্রামখানি এই মন্দিরটি কেন্দ্র করে যুগযুগান্তর ধরে গড়েছে তার বর্ত্তমান নামটি হোলো রহনা, অর্থাৎ থাকো। সে যাই হোক এই

নারায়ণ মন্দিরের স্থাপত্য, এবং কেদারনাথ তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, আর বদরীনারায়ণের মন্দির স্থাপত্য একই প্রকারের অর্থাৎ একই স্থপতির কাজ, শঙ্করের আদেশে তাঁরই সময়েই তৈরী হয়েছিল। এই কয়টি মন্দিরের আকার একই, বিশেষত্ব কিছুই নেই। সরল জঙ্গলী ধাঁচের গড়ন। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ পথে একটি ছোট্ট, অপূর্ব্ব অলঙ্কার যুক্ত স্থাপত্যের নিদর্শন, শিব মন্দির। উপর থেকে কতক নীচে ঐ মন্দির প্রভৃতি। ত্রিযুগী-নারায়ণের নামে যে মহৎ কল্পনা নিয়ে এসে এখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, নীচে নেমে নাটমন্দির, মন্দির আর অন্ধকার পূর্ণ প্রদীপের পোড়া তেলের ঘিয়ের গন্ধ তার সঙ্গে কিছু ধূপের গন্ধ মিলিয়ে এক প্রকার গন্ধ সবার উপর ধুনীর কাষ্ঠ পোড়ার গন্ধ নাকে প্রবেশ মাত্রই অপূর্ব্বভাবে মনকে অভিভূত করে দিলে দেব দর্শনের পূর্ব্বে। মোটের উপর যে পাহাড়ের উপর স্তরে এই মন্দির ও অন্যান্য ধর্ম্মশালা, পাণ্ডাদের ঘর প্রভৃতি অবস্থিত নিম্নে গ্রামখানি তার উপরেও পাহাড় আছে। আসে পাশে বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিম এবং পূর্ব্ব কোণে তুষার পর্ব্বতগুলি সমুদয় দেখা যায়। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ডান দিকে, বিশাল কেদারনাথ শৃঙ্গ, বাঁদিকে গঙ্গোত্তরী তুষার ভূমির শেষে যে তুষারময় শৃঙ্গ দেখা যায়, ঐটি কেদার নাথ, ঐটি গঙ্গোত্তরী ইত্যাদি বোলে যখন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন এখানকার সন্ন্যাসী পূজারী তখন মনে মনে এমনই উত্তেজনা, ছুটে যাই গিয়ে নামি ঐ দেব তীর্থে। উপরে গাছ পালা নেই বাধাহীন দৃষ্টি, প্রসারিত করলেই হোলো।

গঙ্গোত্তরী থেকে যারা এ পথে আসতে চান ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শনে, তাদেরও এখানে আসার পথ আছে আবার এদিক থেকে গঙ্গোত্তরী পানে যাবার পথও আছে উত্তর কাশী হয়ে। শীত প্রধান স্থান, চড়াইয়ের শ্রম অল্পক্ষণেই যখন দূর হয়ে গেল শরীর থেকে তখনই ধীরে ধীরে জানিয়ে দিলে এটা শীত প্রধান স্থান, তুষারপাতের দেশ। নাট-মন্দিরের অন্ধকারে কাঠের ধোঁয়াতে বোধ হয় প্রকাণ্ড ঘরখানা ভরে আছে। যেমন আমরা প্রবেশ করলাম, এক কোণে খুব নীচে একটা পাথরের চৌবাচ্ছার মত অগ্নিকুণ্ড। তুষার রাজ্যের সকল দেব স্থানেরই ঐ প্রবেশ পথে অথবা নাটমন্দিরের মধ্যে যজ্ঞ-কুণ্ড বা অগ্নিকুণ্ড দেখা যায়। সাধারণত কুণ্ড নির্ম্মিত বা স্থাপিত হয় হোমের জন্য। প্রত্যেক আর্য্য গৃহে, মন্দিরে, আশ্রমে একটি করে কুণ্ড থাকাই নিয়ম। এখন হবিঃ লুপ্ত হয়েচে তাই স্বধু অগ্নিকুণ্ডরূপেই এর অস্তিত্ব। এখানকার বিশেষত্ব, এই যে ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই তিন যুগ ধরেই যজ্ঞাগ্নি জ্বলচে এই কুণ্ডটিতে। তারও ঐতিহ্য আছে। প্রচলিত কিম্বদন্তি এই যে শিবের বিবাহ এইখানেই সংঘটিত হয়েছিল সুতরাং গিরিরাজের রাজধানী বা প্রাসাদ এইখানেই ছিল। বিবাহে নারায়ণ ছিলেন পুরোহিত, তিনি যে কুণ্ডে এই শুভ সংস্কারের জন্য হোম করেন সেই কুণ্ডের আগুন তখন থেকে কখনও

নির্ব্বাপিত হয়নি। এটা সত্য বোলেই বিশ্বাস হয় যে কুণ্ডটি কখনও অগ্নিশূন্য হয় না। কারণ কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে মন্দির দ্বার বন্ধ করে যখন অধিকারীরা নেমে যান তখন পর্য্যাপ্ত কাঠ দিয়ে এমনভাবে এই ধূনি জ্বালিয়ে রেখে যান যাতে আগুন ঠিক থাকে। পরে শীতের সময় বাইরের সব কিছু তুষারে ঢেকে যায়। অত্যন্ত ক্ষীণ বাতাস পথ থাকে, অগ্নির ক্ষয় কম হয়। তারপর বৈশাখের মাঝামাঝি যখন মন্দির খোলা হয় তখন দেখা যায়, প্রজ্জ্বলিত না থাকুক কুণ্ডের মধ্যে অগ্নি ঠিকই আছে,—একেবারে নিভে যায় না কারণ এখানকার পাণ্ডারা একটা সূক্ষ্ম বায়ুপথ এমনভাবে রেখে দেয় যাতে আগুনটা থাকে।

ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দিরের পূজারী যিনি, অতীব দৃঢ় শরীর অথচ অশীতিপর না হোক পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁর ভক্তি এবং নিষ্ঠা। মনে হয় কেশো স্বামী নাম, গৃহী নন, সন্ন্যাসী এবং আকুমার ব্রহ্মচারী প্রায় বাহান্ন বৎসর এই বিগ্রহ আশ্রয় করে আছেন আর কোথাও যাননি। আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম। মাত্র তিনটি রাত্র এখানে থাকবার ইচ্ছায় যখন সন্ধ্যারতির পর তাঁর কাছে বসি, তিনি আমায় আর একদিকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আমি তাঁর কাছে কিছু বিশেষ উপদেশ লাভের আশাতেই গিয়েছি। আমি প্রার্থী এইটি বুঝে তিনি নিজ দায়িত্ব এড়াবার জন্যই বললেন, এখান থেকে খানিক উত্তর পূর্ব্ব কোণে, গুহা আশ্রয় করে আছেন একজন সিদ্ধ যোগী। তিনি কাকেও বড় একটা স্থান দেন না; যদি একবার তাঁকে ধরতে পারো তাহলে কিছু পেতে পারবে, তাঁর দয়া হলে;—আমার কাছে কিছু আশা করলে ভুল করবে। আমার কিছুই নেই কাকেও দেবার মত। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাঁকে দেখেছেন? তিনি বোললেন, হাঁ তিনি কয়েকবার এখানে এসেছিলেন, এই মন্দিরেই তাঁকে দেখি, আর নিজগুণেই আমায় অনুগ্রহ করেছিলেন। অসাধারণ তাঁর সিদ্ধি, কিন্তু তাঁর কথা এ অঞ্চলের কেউ বড় একটা জানে না। যখন আমার বয়স বাইশ কি তেইশ বৎসর, আমি এই মন্দিরে আসি। যোশী মঠেই আমি বিদ্যালাভ করি। সেইখান থেকেই এখানে আসি চিরজীবন কাটাতে। তখন থেকেই এই ব্রত নিয়েছিলাম আর তখন থেকেই আমার এই নারায়ণ আশ্রয়। আমার জনম সফল হবে, শেষকালটুকু এই নারায়ণের চরণ প্রান্তে কাটাতে পারলে, আর কোন কামনাই নেই আমার কেবল এইখানেই দেহরাখার ইচ্ছায় আজ বাহান্ন বৎসর কাল কাটিয়েছি।

আমার কৌতূহল দীপ্ত হয়ে উঠলো, সেই যোগীকে দেখবার জন্য, বুঝলাম যদি এখানে এক্ষেত্রে না হয় তবে কোথায় হবে সিদ্ধ যোগী দর্শন। ভাল করে জেনে নিলাম, ঠিক কোন অংশে তিনি থাকেন। পরদিন যখন কেশব স্বামীকে প্রণাম করে যাত্রা করি

তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, বললেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক ;—ভগবান কৃপা করুন তোমায়। শেষে বোললেন, দেখো সন্তজি, হামারা নাম মৎ লেও, অর্থাৎ এরই কাছে সন্ধান পেয়েছি একথা তাঁকে না জানাই। শেষে আরও বলে দিলেন, তুমি চট করে গিয়েই যেন তাঁকে ধোরোনা, বাইরে একটু সুযোগের অপেক্ষা কোরো, সুযোগ পাবে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি। নির্জ্জন স্থান, দূরের দিকে চাইলে ধূসর বর্ণ পর্ব্বতের শীর্ষদেশ দেখা যায়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাষাণের টুকরো ভরা পথ, ছোট ঝুপি জঙ্গলী গাছ, বিশেষ বড় বড় কোনও গাছ নেই। অবশ্য মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাষান স্তুপও আছে কিন্তু বেশীরভাগই নগ্ন পর্ব্বতের বিস্তার। প্রায় এক পোয়া পথ গিয়ে বাঁদিকে যে স্তুপের একটা ঘন দেয়াল, তার পাশেই খানিক চড়াই উঠবার পাকডাণ্ডি পথ। সেই পথে উঠে গিয়ে খানিক বাঁ দিকে, পাহাড়টা যেন হাঁকরে আছে, উপর দিকের খানিক ঝুঁকেই আছে তার মধ্যে গিয়েই আমি গুহার পথ পেলাম। পথ বলচি কিন্তু সেটা খানিক সরু একটা ফালি, দুদিকে কেবল পাষাণ স্তুপের মত একটার পর একটা চলে গিয়েছে ; ভিতরের দিকে অন্ধকার। কোনদিকেই সেথা আকাশ দেখা যায় না। ক্রমে সেটা লম্বা সুড়ঙ্গ পথের মতই হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে কতকটা যেতেই বাঁদিকে গুহাপথ দেখা গেল। প্রকৃতি নির্ম্মিত প্রকাণ্ড গুহা ; সেই গুহার প্রবেশ পথের একধারে কুল কুল শব্দে জল বেরিয়ে আসছে, তবে ভিতর দিকে ঝরনার কোন শব্দই নেই।

এক দুই করে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে গেলাম আমার গাটা ছম্ ছম্ করে উঠলো আর এই ভাবটী মনে হোলো যেন মহাশক্তিশালী জীবন্ত কোন মহান্—আত্মার অধিকারে এসে পড়েছি। আর অগ্রসর হতেও পারছি না, ইচ্ছা করলেই আর ফিরে যেতেও পারবো না। এ আমার হোলো কি ? জীবনে কখনও এমন হয়নি। এ এক অদ্ভুত প্রভাব,—সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিকে, ব্যোম ব্যোম, একটী গম্ভীর ধ্বনি কানে আসতে লাগলো সে শব্দে যেন গুহাভ্যন্তর কাঁপিয়ে তুললে। আমি স্থির জড় পুত্তলিকার মতই দাঁড়িয়ে আছি একপাও এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই, আগেই বলেছি, ফিরে আসবারও শক্তি নেই। ক্রমে দেখলাম সামনের দিকে অন্ধকার ভেদ করে, এক উজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটে উঠতে লাগলো আমার চক্ষের উপর। ক্রমে স্পষ্ট দেখলাম সেই উজ্জ্বলবর্ণ মূর্ত্তি এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কি যে বললেন, তার অর্থবোধ হোলো না। তিনি আরও কাছে এলেন, বললেন, বো ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির মে, কেশো স্বামীনে বাৎলায়া ? আমি গুম্ভিত। এতকরে তাঁর কথাটা গোপন রাখবো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু তিনি তো সবই জেনেছেন,—তবে আর কি বলবো, জড়বৎ দাঁড়িয়েই রইলাম।

তাই দেখে তিনি তাঁর ডান হাতখানি বাড়িয়ে আমার কাঁধে একবার মাত্র রাখলেন,

সঙ্গে সঙ্গেই আমার সকল সঙ্কোচ চলে গেল ; তখন বললেন, ডর ক্যা বাচ্চা, আও মেরে সাথ। আগে যেতে যেতে আবার বললেন, তুমারা বাঙ্গালী শরীর হৈ, কি নহি ?—তখন মুখে কথা বেরোলো ;—জী হাঁ স্বামী। খানিক আগে তিনি, পিছে আমি ; অনেক কিছুই ছিল আসপাশে। যেমন অজন্তা ইলোরা গুহার মধ্যে নানাপ্রকার মূর্ত্তি, স্থাপত্য অলঙ্কারের নিদর্শন, দাঁড়ানো বসা, নানা ভঙ্গিতে দেখা যায়, পথের দুধারে সেই ধরণের মূর্ত্তিগুলি প্রচুর তফাতে তফাতে রাখা, দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। খানিকটা গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। যেন পিছনে আমি আসচি কিনা দেখলেন,—কিন্তু শেষে বুঝলাম তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি দাঁড়িয়েছেন এমন একটা স্থানে সেখানে, পাশেই যেন কোন স্থান থেকে এক ফালি আলো, খুব তীব্র নয় হালকা আলো এসে তাঁর সর্ব্বশরীরে পড়লো কিন্তু মুখের কোন অংশই দেখা গেল না। তার শরীরটি এই সময়েই আমি পরিষ্কার, এমনই স্পষ্ট দেখে নিলাম, এই সুযোগটা আমার ইতিমধ্যে হয়নি এর পরেও হয়নি। আমি তাঁর শরীরের কথা এইজন্যই বলচি যে এমন শরীর এর আগে দেখিনি। যোগীর শরীর বোলে তাকে যদি বলি তাহলে ঠিক হবে না, তার কারণ, যোগী রোগাও হতে পারে মোটাও হতে পারে। এর আগে আমি ঐ দুরকমই যোগী, এমনকি সিদ্ধ যোগীও দেখেছি। সুধু আমি নয় বর্ত্তমানে পাঠকবর্গের অনেকেই দেখেছেন। মোটা শরীর যোগীর সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ তৈলঙ্গ স্বামীকে যাঁরা দেখেছেন তারা জানেন এবং বিশ্বাস করবেন যে, সিদ্ধযোগীর শরীরও যৎপরোনাস্তি স্থূল বা মেদ-মাংসল হতে পারে। আবার রোগা শরীরের দৃষ্টান্ত যেমন আজানুলম্বিত বাহু কঙ্কালসার যোগী শ্রেষ্ঠ স্বামী ভাস্করানন্দ ছিলেন এমন কেউ নয়। তাহলে এটা সত্য এবং প্রামাণিক তথ্য যে যোগী শরীর অসাধারণ মোটাও হয় আবার রোগাও হয়, রোগা মোটা শরীরের আড়া নিয়ে যোগীর বিচার চলে না। আর এই যে শরীরটি দেখলাম, তা যোগী কি ভোগী বিচারের বিষয় নয়, এই নিদর্শন নিছক দেব ভাবের। কারণ আমার চক্ষের উপর স্পষ্ট ফুটে উঠলো একখানি বুক আর আজানুলম্বিত দুই হাত ঝুলচে পাশে তার নগ্ন রূপটাই দৃষ্টিকে টেনে রাখে। সহজ দৃষ্টিতে সে রূপরেখা দর্শনের আনন্দ ব্যতীত তার আর কোন ভাবই নাই তাতে। কোমর পর্য্যন্ত ঐ প্রশস্ত বুকখানি মোটেই বেশী মাংসল নয়,—কেবল বুকের পাঁজর এমনই চমৎকার ঢাকা, আবার যেখানে আমাদের বুকের দুদিকে ছোট, খানিক গোলাকার স্তনের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যে যেভাবে পুরুষদের বোঁটা থাকে, এখানে দেখলাম, মাত্র বোটা দুটি কিন্তু কালো বা শ্যামল গোলাকার কোন ক্ষেত্রেই নেই, আর সেই বোঁটার রংটা রক্তবর্ণ, গৌরবর্ণ লোকের ঠোটের যেমন রং হয়। সেই বুকের বিস্তৃত অপূর্ব্ব দুইটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তা এই যে, অত কম মাংসল ছাতির

প্রসার অতটা কেমন করে সম্ভব হয়, আর সেই বক্ষের নিচেই, যেমন বুক আর পেট বিভক্ত রেখা আর মাংসল বক্ষের মাঝে কতকটা গভীর গহ্বর থাকে, অধিক মাংসল শরীরের সেই গভীরতা বেশী, অল্প মাংসল শরীরে সেটা কম,—এখানে দেখলাম অপূর্ব্ব একটি স্থূল সুন্দর সরল রেখা, তার উপরে বক্ষ এবং নীচে উদরদেশ বিভাগ করেছে, সে বক্ষের উপর নীচে স্থূল, মাংসের উঁচু নীচু আকারই নেই,—কপাট বক্ষ যার নাম সেই আকারের ছাতি। কোমর সরু নয়,উপর থেকে নিচে উদর মাত্র পেশীর আকারে তেমনই এক সুডোল ভাবে নেমে দুই জঙ্ঘায় বিভক্ত হয়েছে। উপস্থখানে লিঙ্গের এবং অণ্ডকোষের কি ক্ষুদ্র আকার, বোধ হয় একটি সাত আট বৎসরের শিশুর মতই, তার চেয়ে কোন অংশে বড় নয়;—তাও যখন সেটা অসাড়ে কুঁকড়ে থাকে তখন যেটুকু দেখা যায় ততটুকু মাত্র। তারপর দুটি পা, উপর থেকে ঐ শরীরের অনুপাতেই স্থূল,—কিন্তু বর্ণনার অধিকারী হলে আমি সেই দুখানি পায়ের বর্ণনা করতাম। পা দুখানি দীর্ঘ, অনুমান নয় দেখলাম লম্বা, স্থূল হতে ক্রমে নরু গোড়ালি পর্য্যন্ত। পায়ের পাতায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত ঠিক যেমন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন গড়ন অতীব সুন্দর কেবল পার্থক্য এই যে, মানুষের হাতের খোদাই কখনও সম্পূর্ণ সুন্দর হয় না। এই আঙ্গুলগুলির তুলনা নেই। তুলনায় উৎসাহশীল আমাদের সভা'বই এমন যে, একটা মানুষের সঙ্গে তুলনায় প্রাণী রাজ্যের যার মধ্যে যেটি সুন্দর তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করি, আর কবিরা এ বর্ণনায় সবার উপর যান। কিন্তু এই পা দুখানির তুলনা দিতে আমার প্রথমে একবার বেলুড় মঠের স্বামী বিবেকানন্দ তারপর বাবুরাম মহারাজের পা দুখানির কথা স্মৃতিতে এক একবার উঁকি দিয়ে গেল। শেষে এইটুকু বলবো ঐ পা দুখানি দেখবামাত্রই আমার মাথাটি আপনাপনি ঐ দিকে গিয়ে স্পর্শ করে ধন্য হতে চাইলো কিন্তু অনেকটা দূরেই পা দুখানি ছিল, তা ছাড়া আমার নড়বার শক্তিও ছিলনা। আলোতে দেখা হলো মাত্র। আবার তিনি এগিয়ে চলতে সুরু করলেন, আর পাশের আলোটুকুও আর রইলো না, সবই আগের মত অন্ধকার,—অন্তর্যামী তিনি ঠিক যেন আমার আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই তাঁর ঐ সুঠাম যোগী শরীরটি আমায় দেখিয়ে শান্ত ও কৃতার্থ করতেই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ঐ টুকু দেখিয়ে দিলেন।

এখন পূর্ব্বের মতই প্রায়ান্ধকার সুড়ঙ্গ পথে চললাম, তবে তার মধ্যেও তখন বেশ দেখতে পেলাম। মনে হোলো যেন তাঁর অঙ্গ-জ্যোতিই আমায় পথ দেখাল। একটি বেদীর মত দূরে দেখা গেল। সেইখানে তিনি গিয়ে বসলেন, আমায় বললেন, বৈঠ যা। তখন নীচে সমতল পাষানের উপর বসলাম। এবারে তিনি ধীরে ধীরে সুধালেন, মেরে বাচ্চা, এত নে দূর সে আয়া, ডর কিসিকো, ? হৃদয় পূর্ণ, সুধু বোললাম, আপকো দর্শন তো মহাভাগ সে মিলতা, ময়নে এইসা হি শুনা। তিনি বলিলেন, বো

কেশোব ব্রহ্মচারীজীনে এইসা হি বাৎলায়া।—তুমকো, এই সাহি সমঝায়া হোগা। আমি কিছুই উত্তর করিনি, তাই তিনি আবার বললেন, ফির বোল, ইহাঁ ক্যা কাম তেরা?

বললাম, কুছ নহি, কেবল দর্শন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ঝুট্, যে ফিকর কৌন কোইকো দর্শন মাংতা? বললাম, সিবৃফ্ সাধুকে দর্শনমে ভি তো কুছু মিলতে হৈ, এইসি সংস্কার তো হাম লোক ধরতে, জী, মহারাজ। পূণ্য কি লালসমে সাধু দর্শন, ই তোহার অপনা বাৎ নহি, তুমহারা ঔরকুছ দুসরে বাতহোগা, সচ্চা বোল তো? এবারে সত্য সত্যই বোললাম, অব দর্শন তো হোচুকা, পরমাত্মা জানে অব কুছ মনমে নহি উঠতি।

যো হো-সকতা, অব কুছ খাওগে? আমি সরল ভাবেই বললাম, ভোজন কা কুছ আরজ নাহি হামারে, মহারাজ! প্রসাদ হো যো দর্শনমে, উসিসে বড়া ঔরক্যা হো সকতা! অব ইসি পর, বৈঠযা চুপচাপ!

তারপর তিনি, আবার ঐখান থেকে সহজে ছুপ করে একটা কি ছুঁড়ে দিলেন। দেখলাম, অতীব কোমল একখানা পশু চর্ম্ম। কোন পশুর ছাল বুঝতেই পারলাম না অন্ধকারে। যাই হোক, আমিতো সেখানি পেতে তার উপর আসন করে বসলাম। তিনি যেন মিলিয়ে গেলেন অন্ধকার গর্ভে। আমি স্থির বসেই রইলাম এবং ক্রমে ক্রমে একেবারেই স্থির হলাম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সামনা সামনি কোন সম্বন্ধই ঘটেনি, না কিছু প্রশ্ন, না উত্তর। তাই যে ভাবে যেটুকু ঘটে ছিল সেই টুকু বলবো।

আমার প্রাণে আনন্দের পুলক, মহাভাগ্য আমার, আনন্দে বুকভরে উঠলো, দৈব উত্তেজনা, প্রথম অবস্থার কথা এটা, এতে কিছুই লাভ হবে না জানতাম; যেমন চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিছু লাভ হয় না এবং অস্থিরতার জন্য একটা প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয় সেই ভাবেই চলেছিল কতক্ষণ, এটা অধিক আনন্দজনিত যে, অস্থিরতা একটা বিক্ষেপ। যখনই এইটি আমার বিবেক বা বুদ্ধিগত হল আর সেই মুহূর্ত্তেই স্থির হয়ে গেল চিত্ত, ঐ আসনেই আমি স্থির হয়ে গেলাম। আর কোন কথাই মনে উঠলো না। মন্ত্র আমার সঙ্গেই ছিল ধীরে ধীরে জপ আরম্ভ করলাম। এক চক্র দুই চক্র তিন চক্র মন্ত্র জপের পর আমার মধ্যে সে ভাবটি উঠলো তার ভাষা এই যে,—সিদ্ধস্থানে এসে আসনে বোসে আবার জপ কেন? জপের প্রয়োজন নেই, স্বতঃই যে ভাব উঠবে সেই আমার ইষ্টের ভাব। আমি কেন জপ করবো? জপটা স্থূল, নিতান্তই স্থূল। জপ ছেড়ে আত্মস্থ হবার প্রেরণায় আমার আমিটি অর্থাৎ এই বোধ সত্তা সুড় সুড় ক'রে উপর দিকে উঠতে লাগলো, তখন একেবারেই স্থির সমুদ্র—

* * *

কতক্ষণ জানিনা, কারণ সময়ের জ্ঞান তো ছিলই না যখন আমার সহজ চেতনা এলো সামনেই দেখলাম সিদ্ধ মূর্ত্তি। তিনি ঠিক সামনেই, জয়মুদ্রা দেখাবার ভাবেই

হাতটি তোলা, বলিলেন, যা বাচ্চা, অব আপনার স্থান পে চলা যা, সাথী তুমারা ঢুঁড়তা হোগা। ফির মৌকা মিলে তো কাল ভি আজানা। আমি প্রণাম করলাম, আমায় গুহাদ্বারে পৌছে দিয়ে গেলেন। এই সময়ের মধ্যে, আমি তাঁর মুখ বা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখতে গেলাম না,—গুহা পেরিয়ে আসতে আসতে আমার মনে এই কথাটাই বেশী বেশী তোলাপাড়া চলছিল। কাল যদি দেখা হয় তো ভাল করেই দেখবো, চক্ষু সার্থক করবো। এই ভাবে দ্বিতীয় দিন আমার কাটলো।

সত্যই মন্দিরে ফিরে এলাম দেখি, জেঠামশাই বেশ একটা সোর গোল সুরু করে ছিলেন। কোথায় গেল, এতটা বেলা হোলো খাওয়া নেই, দেখাই নেই লোকটার। ধর্ম্মশালায় যারা ছিল আমার উপস্থিতি লক্ষ্য করে সবাই প্রশ্ন করবার আগেই জেঠামশাই, এতনা দের হো গেয়া, আপ কাঁহা থা, হম্‌লোক তো ইত্যাদি ইত্যাদি—

প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ, যে শক্তির স্পন্দন নিয়ে এসেছিলাম কাকেও বলবার নয়, দেখাবার নয়, শুনাবার নয়; নিজের মনে মনেই চলতে লাগলো।

বারোহাজার ফুট ওপরে, ত্রিযুগীনারায়ণের মধ্যে পাঁচটি কুণ্ড বা ধারা আছে। অপরূপ মন্দির আকারে আবৃত্ত একটি কুণ্ড পৃথক, সুধু পানীয় জলের জন্য, সে কুণ্ডে কেউ হাত দেয় না, বাকী কুণ্ডগুলিতে স্নান করা চলে। কাপড় কাচার জন্য একটা উঁচু জায়গা আছে সেখান থেকে কাপড় কাচা জল গিয়ে ক্ষেত্রে পড়ে। পানীয় জলের কাছে অপর চারটি কুণ্ডের ব্যবস্থায় বেশ এনজিনীয়ারীং আছে। প্রথম কুণ্ডের জল দ্বিতীয় কুণ্ডে, দ্বিতীয়ের জল তৃতীয় কুণ্ডে তৃতীয় কুণ্ডের জল চতুর্থ কুণ্ডে আর চতুর্থ কুণ্ডের জল নালা পথে চলে যাচ্চে নানাক্ষেত্রে নানা উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে, অবশ্যই নিম্নমার্গে গতি তার।

আমার দ্বিতীয় রাত্রের পর তৃতীয় দিনেই যখন অতি প্রত্যুষেই ঘুম থেকে উঠে আগেই আমি জেঠাকে একটু জাগিয়ে দিলাম, বললাম, জেঠাজি, আজ ভি হাম রহনা মাংতে। জানি সে এই বার রাগে চিৎকার করবে। তাকে শান্ত করবার জন্য মিনতি করে তার হাতখানি ধরে বললাম, রোষ মৎ করো জি, ইসিমে তুমারা নাফাভী কমতি নহি। এক মহাত্মাকো দর্শন মিলা, উনহিনে হামকো আজভি দর্শন দেঙ্গে, এ্যায়সা কুছ বাত হৈ, অব আপকো কৃপা হো তো।

প্রচ্ছন্ন রোষ তো ছিলই, মায়তো উদ্ধার হো যায়গা, জেঠা পাশা ফিরে শুয়ে বললেন, যো খুসী বোইসাই করো, হামারা ক্যা; লিকিন কাল সুবোকো জরুর যানা চাইয়ে। সে কথায় আর কাজ কি? তার পরেই কেশোবস্বামীর কাছে সব কথাই বললাম, কেবল যে অংশ বলবার নয় সেই টুকুই বাদ। তিনি কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বার্ত্তা কন না। এখানকার কোন ব্যক্তিকে আমার কথা বলেন নি। মনে মনে এখানকার পূজারী

স্বামীর কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম। দ্বিতীয় দিন যখন যাই তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ প্রায় ন'টার সময়, তাঁকে প্রণাম করে গেলাম, তিনিও আশীর্ব্বাদ করলেন।

এবারে গুহামুখ পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচেই গেলাম, 'কাল যে সঙ্কোচ হয়েছিল আজ আর সে সকল কোন অশান্তি নেই, স্বচ্ছন্দে ঝরনার পাশ দিয়ে সেই প্রায়ান্ধকার গুহামুখেই দিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি এলেন এমনই ভাবে যেন এই খানেই আমার জন্য অপেক্ষাই কর ছিলেন। আ-যা বাছা! বোলে আগে আগে চললেন। তার পর ঠিক যায়গায় গিয়ে বললেন, পহ্‌লা বৈঠযা, আপনা কাম তো বাজা লে,—বোলে সেই আসন খানিই ছপ্ করে ফেলে দিয়ে অন্তর্দ্ধান করলেন।

* * * * * *

যখন আমার আসনের কাজ শেষ হোলো তিনি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাব বসা অবস্থায় মাথায় হাতটি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, মনে হোল যেন আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়ে গেল। এবার তিনি আমার সামনেই বসলেন, বললেন, আচ্ছা, আজ তুমারা যিৎনি হোনা থা বো হোগয়া, কাল তু গৌরীকুণ্ড যাতে। অব এক বাত্ শুনতো লো, আনন্দ মিলেগা,—এই বোলে খানিক স্থির হয়ে রইলেন। তার পর আবার ধীরে ধীরেই আপনভাবে, ইয়ে শরীর, নিজ শরীরের দিকে দেখিয়ে বললেন, ইএ ভি বাঙ্গালী শবীর। পহলাই তুমহারা বো স্বরতি দেখতে মালুম হুয়া,—ঔর হোতে তো কভি আনে নহি সকতি। দর্শনমে ফির প্রীত ভ'ই; ইয়ে আপনা দর্শন,—ময় তবহিঁ সমঝ গেয়া কি প্রভুজী নে ভেজা। তারপব চুপচাপ ধীরে ধীরে আবার;—

তুম হামারে আপনা হোতা। অব আচ্ছা, বাচ্চা, আজ আপনা স্থানমে যাও। ফিব তুমনে যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী যাওগে। তবতো কেদাকো যাও, বদরী যাও, যঁহা মন চাহেঁ যাও। ফিব যদি ইধার মে আনেকো মৌকা মিলে তো মিলো। তুহারা গুরুশক্তি তো বহোত জবর, কভি গিরনে নহি দেতে তুজকো। অব লেঃ, বোলেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন; আমি ও যন্ত্রবৎ হাত বাড়ালাম। হাতে এলো কিছু; বলিলেন, ডার দে মু মে,—মুখে দিলাম। গুটিকা ঈষৎ তিক্ত, তারপর কষায়, তারপর অম্ল, তার পর ধীরে ধীরে অমৃত হয়ে মুখেই তরল হয়ে গেল।

তাঁর চরণের পানে মাথা হেঁট হতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখন ভাবচি একবার মুখ খানি দেখতে পাবোনা,—স্বধু শরীর টুকু দেখেই চলে যাবো? বুঝে, তখনই বললেন, লে, দরশন ভি লে। আগে অন্ধকারে বড় একটা কিছু দেখতে পাইনি, তার পর ক্রমশই অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেলেই যেটুকু দেখা যায় কেবল সেইটুকুই দেখছিলাম তার বেশী কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এখন সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে আলো হয়েই ফুটলো ঐদেব মূর্ত্তি যা দেখলাম, আমার ইষ্ট বোলেই দেখলাম, প্রাণ পূর্ণ করে, ঐ মূর্ত্তি, দৃষ্টির

মধ্যে দিয়ে অন্তরে তখনই পৌঁছে আত্মার সঙ্গে তার ঘন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং আমায় কতক্ষণ তন্ময় করে রাখলে। আমাতে আমি ছিলাম না, অর্থাৎ ঐ ভাবে ইষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে আমি কতক্ষণ পূর্ণভাবে এমনই ছিলাম যেন আমি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই ছিলনা।

ত্রিযুগীনারায়ণে ত্রিরাত্র বাসের পর আঠারো দিনরাত্র হিমালয় ক্ষেত্রে কাটিয়ে পর দিন প্রভাতেই যাত্রা করলাম।

গৌরীকুণ্ড—রামবরহ্.—কেদারনাথধাম—১০॥ মাইল

ত্রিযুগী-নারায়ণ ক্ষেত্রে বাস অর্থাৎ স্বর্গ বাস করে গৌরীকুণ্ডের পথে পা বাড়াবার আগেই একবার এই স্বর্গপুরী লক্ষ্য করে মনে মনে প্রণতি জানিয়ে অন্য পথে নামতে সুরু করলাম। উৎরাই পথ সবটাই। মধ্য পথে এক সুন্দর মন্দির পেয়েছিলাম, ঠিক স্মরণ নেই বোধ হয় ত্রিলোকনাথ শিবের মন্দির। সেই মন্দিরের পর পথটা যেন আরও ক্ষীণ হয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর পথের মহিমা আছে যদি হিংস্র জন্তুর ভয় না থাকে। ভয়-প্রধান পল্লিবাসীর মনে বাঘ ও ভালুকের ভয় থাকেই তার উপর যারা একটু আধুনিকতার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেন তারা বলেন, হাঁ বাঘ আছে বটে তবে ম্যানইটার নয়; তবে মধু ললুপ রসিক ভালুক আছে। আমাদের এই মনোরম জঙ্গল পথে কোন ভয়ের ভাব মনে ছিল না,—মনের আনন্দে তর তর নেমে মন্দাকিনীর তীরে পুলের কাছেই এসে পড়লাম। এখানেই উৎরাই শেষ হলো;—তারপর মন্দাকিনীর সেতু অতিক্রম করেই আবার চড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। ঠিক যেন মহামহীম, বিচক্ষণ, পথের বিধাতা একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নেবার আগে বেশ হাল্কা স্ফূর্ত্তিজনক কিছু আরম্ভ করিয়ে ভক্ত পথিকের মানস ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দিলেন। অবশ্য এটা আমাদের জানাই ছিল যে আজ গৌরীকুণ্ডের আশ্রয়ে পৌঁছাতে আমাদের প্রথমে সহজ উৎরাই পার হয়ে কঠিন চড়াই শেষেই যাত্রা সার্থক হবে। মধ্য পথে এক নয়ননান্দকর প্রবাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল।

সামনেই এই যে প্রবাহ, আমাদের পথে পড়বার আগেই তার মূর্ত্তি অন্য প্রকার ছিল,—একটি অপূর্ব্ব প্রপাতের আকারে অনেকটা উপর থেকেই নীচে প'ড়ে, নানা ছন্দে তর তর গতিতে নেমে একবাঁকের মুখেই আমাদের পথে এসে দর্শন দিলেন। তারপর তীব্র গতিতে আরও কিছু নীচে গিয়ে মন্দাকিনীতে আত্ম বিসর্জ্জন করতে বাধ্য হলেন। আমাদের আনন্দের রেশ ফুরিয়ে গেল, যখন আবার চলতে বা চড়তে আরম্ভ করলাম। এখানে সকল ধারাই গঙ্গা, যে ধারা আমরা অতিক্রম করলাম তার ডাকনাম দুধগঙ্গা সফেন জলরাশীর ক্ষিপ্র গতি বোলে। পোষাকি বা সংস্কৃত নাম সোমধারা। মন্দাকিনীর রূপটি আমরা প্রথমে দেখেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গমে, তারপর গৌরীকুণ্ডের মধ্য পথে উৎরাই শেষে দ্বিতীয় দর্শন, তারপর তার সেতু অতিক্রম করে গৌরীকুণ্ডে

আবার চড়াই পথের মধ্যে দুধগঙ্গা। চড়াই পথে সাড়ে তিন মাইল গৌরীকুণ্ড। পথে চড়াই থাকলে কি হয় অপূর্ব্ব এই জঙ্গলের শোভা তিন দিকে। ঐ সকল রমনীয় দৃশ্য সারা পথে প্রাণে শক্তি যুগিয়েছিল। চড়াই উঠতে বুকে যতটা বেজেছিল, তার তুলনায় প্রাণে অনেক বেশী আনন্দ নিয়ে গৌরীকুণ্ড চটিতে পৌছে গেলাম। এখন ত্রিযুগী-নারায়ণ থেকে গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত যে সাড়ে তিন মাইল পথ, মন্দাকিনী পর্য্যন্ত উৎরাই তারপর চড়াই, দুধগঙ্গা যার নাম সেখান থেকে; মাঝ পথে উঠে গৌরীকুণ্ড। পথটা আগাগোড়াই রহস্যময়। দৃশ্যের সঙ্গে সেই রহস্যের যোগ আছে। সেই কথাই এখন বলতে হবে।

এ অঞ্চলের পথের সে শ্রী নেই যা আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত দেখেছি এবং উপভোগ করেছি। এমনকি রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকেও রামপুর পর্য্যন্ত যে পথ তার মধ্যেও পথে চলার সুখ কিছু কিছু ছিল, আর সে পথের উপর খানিক সরকারী দরদ ছিল। তারপর ত্রিযুগীনারায়ণের যে পথ, চড়াই হলেও সে পথটা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মতই জঙ্গলী পথ। তারপর সেখান থেকে উৎরাই সোমধারা পর্য্যন্ত তাও ঐ পথেরই সহোদর, আবার গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত চড়াই পথ সত্যই কষ্টকর। চড়াই হলেই খারাপ পথ হয় না। বদরীর পথেও ত অনেক চড়াই আছে, কোথাও পথের এমন অবস্থা হয়নি। অবশ্য হনুমান চটি থেকে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পথটা ভাল নয়, প্রায় এইরকমই—কারণ কঠিন উচ্চস্তরের হিমালয়ে উঠতে পথের বন্ধুরতা সত্য অনিবার্য্য বাধা, এটা হয়েই থাকে, আগাগোড়া মোটর রোড না হওয়া পর্য্যন্ত এ দুর্গতি অল্প বিস্তর থাকবেই। কিন্তু এ পথে, কেদারনাথে উঠতে পথের দুর্গতিটা অল্প নয়,—বিস্তরই, আর তার কারণ সরকারী যত্নের অভাব। জায়গায় জায়গায় পথের কোন নিশানাই নেই, যেন বুক ঠুকেই চলতে হয়। এখন অবশ্য সে দুর্গতি নেই যে দুর্গতি আমরা আনন্দেই ভোগ করে এসেছি, এখন শুনেছি সবটাই রাজপথের গৌরবের অধিকারী হয়েছে;—আরও শুনেছি পথের দুর্গমতা একেবারেই লোপ পায়নি তবে অনেক হ্রাস হয়েছে।

গৌরীকুণ্ডে পৌছাবার খানিক আগে থেকেই যাত্রীদের স্বাধীন ভাবে থাকা ও বিশ্রামের জন্য প্রকৃতি রচিত গুহা আছে কতকগুলি,—পথের ধারে, কোনটা আবার পথ থেকে একটু উপরে আবার কতকটা নীচেও আছে ঐ ধরণের গুহা, তার সামনে বড় বড় পাথর তিন খানা, চুলার কাজে লেগেছিল, আধপোড়া কাঠ ও কয়লা তার পাশে পড়ে আছে দেখা যায়। এক একটা গুহা ভিতর দিকে বেশ একটা মাঝারী ঘরের মত। একজন সাধক বা সন্ন্যাসী দেখলাম ঐ ভাবের একটা গুহা অধিকার করে বাস আরম্ভ করেছেন। আর এ দিকে সাধুরা পারতপক্ষে ধর্ম্মশালায়, যেখানে গৃহস্থ যাত্রী সাধারণের

জন্য নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়, ধর্ম্মশালায় যান না, তাঁরা প্রায়ই এ সকল গুহা আশ্রয় করেই থাকেন। কারো সেথায় যদি মন বসে গেল, তাহলে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবেন কারো কোন আপত্তির কারণ নেই। এভাবে অনেকেই পথের কোন গুহা আশ্রয় করে বসে গিয়েছেন, দেখা যায়। যাই হোক গৌরীকুণ্ডে ধর্ম্মশালা বা চটি, দোকান পাট, যাত্রীদলের বিশ্রামের জন্য যা যা দরকার সকল কিছুই আছে তার উপর গৌরীর তপঃক্ষেত্র বোলে এর মহত্বের সীমা নেই। মন্দাকিনী এখানে গভীর গর্জ্জন করতে করতে গৌরীকুণ্ডের পাশ তলদিয়ে চলেছেন। কি তীব্র গতিবেগ যেন একখানা মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। সামান্য দূর থেকে ঐরকমই মনে হয়। যতই তুলনা করি ঐ শব্দটি অতুলনীয় আর তার গতিবেগ অনুপমই থেকে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্ঝরিণীর গতিবেগ দেখায় সারা সময় কাটবার নয়। জেঠামশাই বুঝিয়ে দিলেন আরও কর্ম্ম আছে আর তার গুরুত্বই বেশী। পথে উঠিতেই দেখি একদল বহুরূপীর মত দেখতে, গীপসি, এদিকেই আসচে। আশ্চর্য্য, পিঠে তাদের ছেলে বাঁধা। এই শীতে মায়েরই তো চরম অবস্থা তার উপর বাচ্চাকে এমন ভাবে নেওয়া যাতে তার ঠাণ্ডা না লাগে। মায়ের অবশ্য শরীরের গরম, বাচ্চাকে অনেকটাই বাঁচতে সাহায্য করছে কিন্তু মায়ের কষ্ট তো দেখাই যাচ্ছে। মুড়ি সড়ি দেওয়া হলেও এক একটা ঝাপটা দমকা বাতাসে,—তার উপর যখন তুষার পাত হয় বা বৃষ্টি হয়, যা এখানে সব সময়েই হতে পারে, কোন ঠিক নাই তখনই ফাঁকায় দাঁড়ানো মুস্কিল। সেই সময়ে এরা কেমন করে পথ চলে একটা দেখবার জিনিস। আমরা আগের পড়াও থেকে আসবার পথে তাদের দেখেছিলাম।

গৌরীকুণ্ড

এসব দেখাশুনা করতেই আমার একটু দেরী হয়ে গিয়ে ছিল।

একদৌড়ে তীর্থ ভ্রমণ সম্পূর্ণ করবার মনোভাব নিয়ে তো এখানে বা এপথে আসিনি স্থানটি ভালো লাগলো বোলেই আজ আর যাত্রা করলাম না, যদিও ইচ্ছা করলে আজই কেদার পৌঁছে যাওয়া যেতো। জেঠা আমায় দু একবার মনে করিয়ে দিয়েছিল,—বৃথা একটা দিন নষ্ট করবার দরকার কি,—কেদার গিয়ে না হয় দুই একরাত্র থাকলে হোতো। উত্তরে আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম সেখানে গৌরীকুণ্ড কোথায় পেতাম? সুতরাং সারা দিনটাই ছুটির মতই উপভোগ করে কাটান গেল। স্নান, রন্ধন ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপর খানিক ঘুরে বেড়ানো, কোথায় কি পুরানো স্মৃতিচিহ্ন আছে। এখানেও হটস্প্রীং অর্থাৎ তপ্তকুণ্ড আছে, ঐ উষ্ণ প্রস্রবণটির নামই গৌরীকুণ্ড। আসলে দুটি কুণ্ড তার মধ্যে গৌরীকুণ্ডটিই উষ্ণ প্রস্রবণ জলের রংটা হলদে, একটু লালচে হলুদ রং এর জল। এরা বলে গৌরীর গায়ে হলুদ হয়েছিল তাই কুণ্ডের জলের

ঐ রং। আরও একটি কুণ্ড আছে, সেটি নোংরা। স্নান করতে প্রবৃত্তি হয় না। গৌরী মন্দির এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির। পূজা ভোগরাগ আরতী সবই যথা নিয়মে চলে। এই সব দেখতেই একরাত্র এখানে থাকা। পথ চলাতো আছেই,—একরাত্রি থাকায় তবু কতকটা ক্লান্তি ঘুচবে।

এর পরও কঠিন পথ আছে এ তো জানা কথা, কারণ প্রাচীনকাল থেকেই কেদারকে কঠিন, আর আর বদরীকে বিশাল, বলা হয়েছে;—আমরা পথেতে অনেকের মুখেই কঠিন কেদার ও বদরী বিশাল, এই প্রবাদ ছন্দটা বহুবারই শুনেছি। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই তার প্রথম ও প্রধান কারণ যোয়ান বয়স, প্রাণে স্ফূর্ত্তি, প্রবল উদ্যম নিয়ে তো চলেছি আবার অতটা সহজেই উত্তীর্ণও হয়েছি। কেদারের আর কতটুকুই বা বাকী? জেঠামশাইও আমায় কখনও ভরসা দিতে কসুর করেন নি। বেগারের কল্যাণে গঙ্গা স্নানের মত তারও তীর্থদর্শনতো হয়েই যাচ্ছে একথাও সে অকপটে স্বীকার করেছিল কথা প্রসঙ্গে।

গৌরীর সঙ্গে আসলে এখানকার সম্বন্ধ কতটুকু অথবা একেবারেই কোন সম্বন্ধ আছে বা ছিল কিনা তা জানিনা তবে নামের মাহাত্ম্য যে আছে আর সেই মাহাত্ম্য নিয়েই আমাদের প্রাণভরে শান্তি ও আনন্দ সঞ্চয় করতে হবে, বুদ্ধিতে এটা অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। গৌরীর তপস্যা. তুষার গলিত জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়ে, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এভাবে তপস্যা, শিব শক্তির এই তত্ত্বটি নন্দলালের অমর তুলিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন মনে কোনদিনই জাগেনি। পুরান কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভাবনা আর সিদ্ধির আনন্দই প্রাণকে আকুল করে তোলে। দেব অংশে এই গিরিরাজ কুমারীর পক্ষে সবই সম্ভব। সারাদিনই মনে আমার গৌরীর তপক্ষেত্রের প্রভাবটাই ছিল। এখানে এইভাবেই সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। যাত্রী ছিল বেশ, অনেকেই কেদার যাবে।

আমাদের এক দেশীয় যাত্রী দলের সঙ্গে দেখা। তারা তিনজন মাত্র; প্রধান এবং কর্ত্তা যিনি তার নাম হরেকৃষ্ট দাঁ, মাতব্বর ব্যক্তি প্রৌঢ়, বয়স যেন পঞ্চাশ বাহান্ন,—গন্ধবণিক, বেনেটোলায় বাড়ী। তিনি এগিয়ে এসে নিজে থেকেই কথা সুরু করলেন,—ইনি আমার বন্ধু রাজচন্দ্র বসাক, এর সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে, বোলে পাশের সমবয়সী ভদ্র লোকটিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—ঐ যে বসে কম্বল পাট করচেন, উনি আমার শালি বিধবা;—আমরা আজই এসে পৌঁছেছি কালই কেদার যাবো, আমরা এই ঘর খানা পেয়েছি,—বোলেই দেখালেন আমাদের পাশের ঘর খানা।

স্মরণ হোলো আমি তো দেখেছিলাম এঁদের আসতে, অর্থাৎ সকালে যখন আমি বাইরে ঘুরে আসতে বার হলাম তখনই ওদের আসতে দেখেছিলাম এখানে। তারপর

ঘুরে এসেছি। রান্না, স্নান খাওয়া দাওয়া করে আবার যখন যাই তখনও ওরা ছিল পাশের ঘরে,—অবশ্য গোলমালে অতটা গ্রাহ্য করিনি। এখন দাঁমশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আলাপ করতে আর গ্রাহ্য না করে থাকা গেল না। যাত্রীদের মধ্যে একরকম বয়স্থ লোক থাকে বড়ই বেশী বেশী কথা কওয়া, যেচে আলাপ করা অভ্যাস তাদের। সেই প্রকৃতির মানুষ যেভাবে এড়িয়ে চলা যায় সেইভাবেই এড়াতে চাইলাম। হা, ভগবান; তবুও পরিত্রাণ পেলাম না। দাঁ মশাই বিষয় কর্ম্মর কথা নিজে থেকেই, হো হো, ভুল হয়েছে, আমার মোমের কারবার, বড় বাজারে, তা ছাড়া অন্যান্য অনেক বন্ধকী কারবার আছে, আপনাদের বাপ পিতেমোর আশীর্ব্বাদে আমাদের তিন পুরুষের কারবার, বোলেই, যেন কতই ঘনিষ্ঠ,—পাশের বন্ধুকে বললেন, বলোনা রাজচন্দোর, তুমি তো জানো সব। হাত কালাতে কালাতে রাজচন্দ্র বললে, আপনি তো বোলেছেন আর কি বলবো, শীতেই মরচি এখন,—বোলে আসতে আসতে ঘরের দরজার কাছে গেলেন,—আমি আমার বিষয় কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়ে আবার বাইরে চলেগেলাম সুধুই এদের এড়াতে।

কিন্তু চাইলেই যদি এড়ানো যেতো। সন্ধ্যার দেরী আছে দেখে, পাশের দিকে এখানে একটা কুটিরের মত আছে;—সাধুর আশ্রম ভেবে সেই দিকেতেই গেলাম। সেখানে কেউ নেই দেখে আশে পাশে প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে যা চক্ষে পড়ে তাই দেখে ফিরে এলাম। দেখি জেঠামশাই, দাঁমশাইয়ের দরজায়, আরও কয়েকজন, বেশ চাঞ্চল্য একটা আমাদের ঐ যায়গাটায়। কি ব্যাপার?

আমায় দেখেই, এই যে, বোলে, দাঁমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন;—দেখুনতো এমন বিপদে মানুষে পড়ে! ব্যাপার গুরুতর,—খানিক আগে ওঁর শালিকা, নীচে নদীর ধারে গিয়েছিলেন। সেইখানেই বেকায়দায় পড়ে যান, হাঁটুতে চোট লেগেছে বিষম;—জেঠামশাই দেখতে পেয়ে খবর দিলেন তখন সবাই মিলে ধরাধরি করে এনে ঘরে শুইয়ে দিয়েছেন। এখন কি করা যায়? আমি কি করতে পারি ভাবচি,—আসুন না দেখুন না,—একবার,—বোলে দাঁমশাই হাত ধরে নিয়ে গেলেন। দেখি শুয়ে আছেন, হাঁটুটা ফুলতে আরম্ভ করেচে, হাড় ভেঙ্গেছে কিনা বুঝা গেল না। নানা লোক নানা মত কথা বলতে আরম্ভ করেছে। কেউ বলচে হাড় নিশ্চয়ই ভেঙ্গেচে, নাহলে ফুলবে কেন। একটা পাথরের কোন ফুটে ছিল, খোঁচার মত, সম্ভবতঃ সেটা বেরিয়ে গেছে, সেখানে রক্ত চাপ বেধেচে; বাইরে দেখে কিছুই বুঝা গেল না। তিনি বেশ স্বাস্থবতী সারা পথই হেঁটে এসেছেন।

আমি এখানে আসবার আগেই ডাক্তার, কবিরাজ, চিকিৎসার কথা অনেক কিছুই হয়ে গিয়েছে,—তাঁদের পাণ্ডা বলে চলো ফিরে রুদ্র প্রয়াগে, সেখানে হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে যথার্থ চিকিৎসা হবে। কেউ বলচে গুপ্তকাশীতে ডাক্তার পাওয়া যাবে,

দাঁমশাই গিয়ে নিয়ে আসুক। এতে দাঁমশাইয়ের মত নেই। তিনি, একি বিপদ, একি ফ্যাসাদ, এসব বোলে বোলে ছুট্ ফট্ করে বেড়াচ্ছেন আর যাকে দেখছেন ডেকে এনে সৎপরামর্শ চাইচেন।

একজন বললে, সটান চলে যাও কেদারে সেখান থেকে ডাক্তার আনো। আমাদের জেঠামশাই বোললে, কেদারে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না তবে এখন, চুনা ঔর হরদি পিষকে গরম গরম আভি লাগানা চাইয়ে। একজন বললে, চুনা কঁহা মিলি? চুন চুন করে একটা লোক বেরিয়ে গেল। এখানকার যিনি পুরোহিত, গৌরী মন্দির থেকে এলেন, সদাশয়, শান্ত প্রকৃতির মানুষ;—তিনি বললেন, এখানে চুন হলুদ গরম করে এখনই লাগানো দরকার তারপর একটা ডাণ্ডি যোগাড় করতে হবে, কোন রকমে কালই ওঁকে কেদারে নিয়া যাওয়া দরকার,—সেইখানেই ব্যবস্থা হবে। কথাটা সবার মনে লাগলো, দাঁমশাই বললেন, জয় কেদারনাথ. তাই হোক,—ভাই সব কেউ একটা ডাণ্ডি যোগার করে দাও ভাই,—ইত্যাদি বোলে কৃপা ভিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন।

ওদের পাণ্ডাও লেগে গেল কাজে কিন্তু এখানে কোথায় ডাণ্ডি? ওখানে এক জমাদার,—বোধ হয় এখানকার একজন কাজের লোক,—সে চেষ্টা করে তখন রাত্ত প্রায় নটা তখন একটা ডুলি যোগাড় করে নিয়ে এলো, আট টাকা নেবে কেদারে পৌঁছাতে। যাই হোক, এভাবের উদ্বেগের মধ্যে রাত্র কাটালো, কিন্তু চুন হলুদ দেওয়া হোলো না। তখন গঙ্গা জলের পুটি বেঁধে কেবল ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখবার পরামর্শ দিয়ে ছিলাম, তা কিন্তু একবার মাত্র করা হয়েছিল,—বাকী আর কিছুই হোলো না। পরদিন প্রাতেই যাত্রা।

ডুলি একটা হোলো বটে কিন্তু তাতে রোগিণীর কিছুমাত্র স্বচ্ছন্দ বা আসান হোলো না। যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে তাঁকে তুলে দেওয়া হোলো, একরকম করে। সেই অল্পপরিসর ডুলিটাতে না পারা যায় ভাল করে বসতে, না পারা যায় শুতে। অশেষ কষ্টের ভিতর দিয়ে তাঁর কেদারনাথ মহাতীর্থে যাত্রা চললো।

৯

রামবরহা—৩৷৷০ মাইল

একে চড়াই পথ, প্রথমে আমিই আগে ছিলাম, দাঁ মশাইরা ডুলির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিলেন, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে আমার যাবার কোন প্রয়োজনই ছিলনা। মধ্যে মধ্যে পথ বেশ কষ্টকর। পথটা যে এতটা কঠিন হবে তা আমার ধারণাই ছিলনা। দূরে দূরে পর্ব্বতশীর্ষে পাইনেরই কুঞ্জ, তাছাড়া আরও কত দৃশ্য, যথার্থ ই নয়নাভিরাম।

তুষার পর্ব্বত, মাথাতুলে আছে তারই পিছনে গাঢ় নীলাকাশ। কাজেই অপরূপ দৃশ্যের প্রভাবে এই পথের সকল দুঃখ, অসুবিধা মনে উঠতেই পারেনি, বরাবর রামবরহা বা রামওয়াড়া পর্য্যন্ত।

কেদারের পথে এইটিই শেষ চটি। এখন এই, গ্রামের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখা, সঙ্গে সঙ্গে নামটির উৎপত্তি নিয়ে মনে মনে আলোচনা, তারপর সিদ্ধান্ত ;—এই চমৎকার পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়েই ব্যাপারটা ঘটে গেল। এখানে এরা বলে রামবরহা। রামাবতার হোলো মূল, তার সঙ্গে তৃতীয় অবতার যোগ করে নামটা রামবরাহ, ঠিক করে ফেললাম। মনে হোলো সুন্দর হয়েছে এই নামোদ্ধার, নিজের প্রত্নতাত্ত্বিক বুদ্ধির খানিক তারিফ করতে ইচ্ছা হোলো, ভাষাতত্ত্বে অধিকার ভেবে। কিন্তু ঐ গ্রামেরই এক কৃষক অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি, তিনিই ভুলটা দেখিয়ে দিলেন, বললেন, রামবরহা অর্থে রামচন্দ্রের প্যাগড়ী। বরহা, কথাটা নিয়ে তখন মনে অনেকটাই বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করে দিলাম। সত্যই তো, মাথায় জড়াবার যে সৌখিন বস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণের মোহন-চূড়ার উপর জড়ানো থাকতো, পাগ-বাঁধা, বরিহা-আবৃত ইত্যাদি মাথা বলেই তার বর্ণনা আছে,—আমাদের গ্রাম্য বাঙ্গলা ভাষায় যার হিন্দি অপর প্রতিশব্দ হোলো পাগড়ী, বরহা, এসব কথা স্মরণ হোলো তখন যে নিশ্চিন্ত হব তারও যো নেই। মনে পড়লো বৈষ্ণব কবি কোথায় ঐ বরিহা শব্দটা ব্যবহার করেছেন। গানখানি মহাজন পদাবলীর বিখ্যাত গান। • ঐ গানে, বিনোদ, শব্দটির মাধুর্য্য কীর্ত্তন করা হয়েছে কানু বা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায়। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে, বিনোদ, কথাটি কি অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি, কবির মনে মাধুর্য্যের যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল তার প্রথম দুই লাইনেই চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, কানুসে বিনোদ রায়, তার বিনোদ চূড়ায়, বিনোদ বরিহা, বহিছে বিনোদ বায়,—

কানু সে বিনোদ রায়
তার বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা
বহিয়ে বিনোদ বায়।
তার বিনোদ ললাটে বিনোদ তিলক
বিনোদ বিনোদ সাজে
তার বিনোদ অধরে বিনোদমুরলী
বিনোদ বিনোদ বাজে
তার বিনোদ গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে,
কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনী
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন তাহলে সুন্দর মীমাংসা হয়ে গেল যে রাম-বরিহা অর্থে রামচন্দ্রের পাগড়িই বটে; তাবোলে একথা মনে করলে ঠিক হবে না যে শ্রীরামচন্দ্রের পাগড়িটি এখানে পাওয়া গিয়েছিল, অথবা তিনি সেটা কোন সময়ে এখানে ফেলে গিয়েছিলেন। আসলে এক রামভক্ত পুত্রের নাম রামবরহা রেখেছিলেন। ধারণা করতে পারি যেমন রাম ভরোষ, রামবচন, রামকিলাওয়ান, রামবরণ ইত্যাদি। ছেলেটি যখন কৃতি, খ্যাতিমান, গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হোলো, তার নামেই গ্রামের নাম হয়ে গেল। যাক্ এখন নামটির উৎপত্তি যাই হোক, গ্রামখানি সুধুই দৃশ্যসম্পদ বোলে নয় একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বোলে মনে হোলো আড়া দেখে। এ অঞ্চলে বহু যাত্রীর সম্পোষ্য হয় এমন বড় গ্রাম আর নেই। তারপর, যারা কেদারনাথের ভয়ঙ্কর শীতে সেখানে থাকতে পারেন না তাঁরা এইখানেই চলে আসেন এবং রাত্র যাপন করেন। কিন্তু একটা কথা ভাবতে হয়, এখান থেকে কেদার অনেকটা চড়াই ভেঙ্গেই উঠতে হয়, সেই তিন মাইলের বিষম ও উৎকট চড়াই, বাকী আধ মাইল বটে কিন্তু তুষার ক্ষেত্র সবটা কমই উঠা-নামা। সুতরাং ফিরে এখানে আসাটা সহজ কারণ উৎরাই পথ, কষ্ট নেই, তারপর আবার যাওয়া,। যাত্রী যাঁরা ত্রিরাত্র কেদার-বাস করবেন তাঁরা তো সেই দিনই ফিরে আসতে পারবেন না।

তাঁদের শীত সহ্য করে থাকতেই হবে। তাহোলে এটা ঠিক যারা প্রথম দিন সকালে কেদারে পৌছে সারাদিন থেকে, বৈকালে এখানে নেমে আসবেন তাঁদের আর কেদারে ত্রিরাত্র বাস করা হবেনা। তাই ঐ সকল যাত্রী যাঁরা এত কষ্ট করে কেদারে পৌছাবেন তাঁদের আমি, বড়ই মিনতিপূর্ব্বক একটি কথা নিবেদন করতে চাই। তাঁরা যদি একটু কম চঞ্চল হয়ে, আশ-পাশে বিনামূল্যে পরামর্শ দাতাদের কথায় কান না দিয়ে, প্রথম রাত্রিটা ঐখানেই থাকেন দ্বিতীয় দিন শীত ততটা পাবেননা তৃতীয় দিনে ওটা আরও কম হয়ে যাবে। শেষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় লক্ষ্য করবেন যে ঐ শীতে তিনি আরও অনেক দিনই থাকতে পারতেন যদি ইচ্ছা করতেন। কারণ এখন তাঁর শরীর ঐখানকার শীত সুধু বরদাস্ত করা নয় ঐ শীত তাঁর ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে। আমার এ কথাটা উপেক্ষা না করে একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না এর ফল বড়ই মহৎ, বিশেষতঃ তাঁর শরীরের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে। এতে কোন দিকেই লোকসান নেই বরং সব দিকেই প্রচুর লাভ, একথা সত্য, সত্য, সত্য, ত্রিসত্য করে বলচি।

এই রামওয়াড়ায় যেতে ও আসতে মাত্র দুই রাত্র বাস করেছিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়েছিল এখানে আরও থাকি। স্থানটি এতই চমৎকার এমনই পরিবেশ এখানকার যে একবার এসে দাঁড়ালে সহজে এখান থেকে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়না। যেদিকে চাই, সেই দিকেই আকর্ষণ, জলপ্রপাত, ছোট বড় কতই ঝরণা কোথাও এমন দৃশ্য নেই, এ পথে। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা হয়তো খুব বেশী নয় কিন্তু যাত্রীদের

একটি প্রকান্ড মিলন ক্ষেত্র। কতো যাত্রী যাচ্চে, কতো যাত্রী আসছে সবাই আনন্দে মসগুল। যে কষ্ট করে এখানে এসে পৌছালো, তার আর কোন দুঃখ মনেই থাকবে না এসে এখানে দাঁড়ালে। চার দিকে কি বিশালকায় পর্ব্বতমালা, কাছের সবুজ, দূরের নীল,—বহু উচ্চে অথবা বহু দূরের পর্ব্বত ধূসর বর্ণ, কত কত না বর্ণ বৈচিত্র্য এখানেই দেখা যায়।

এখানকার চটিগুলিও সুন্দর, লম্বা লম্বা ব্যারাকের মত একতল, দ্বিতল ঘরও আছে আবার দ্বিতল ত্রিতল সাধারণ পাহাড়ী মকানও আছে। আবার তুমি যদি সপরিবারে একেবারেই একটি পৃথক ব্যবস্থা চাও, যেমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষেরা চেয়ে থাকেন সেভাবের স্থানও পাওয়া যাবে। এটি যে স্বর্গরাজ্য, সে বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকেনা, এসে দাঁড়ালে। এ স্থানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এমন স্থানের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এর পরে পথও ভালো হবে নিশ্চয়ই, তখন সুখসচ্ছন্দ বাড়বে যাত্রীদের, পথের এত কষ্ট থাকবেনা, নিশ্চিৎ বলা যায়। তবে জিনিসপত্রের দাম কিছু দুর্ম্মূল্য, এটা সত্য।

আনন্দে আমরা রাত্র যাপন করে যখন প্রভাতে যাত্রা করি তখন এখানকার এক দোকানী, লোকটা মোটেই বুদ্ধিমান নয়, আমায় অনুরোধ করলে যেন বৈকালেই ফিরে আবার ঐখানেই আসি। তার যাত্রীশালাটি বেশ সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বটে। স্থানটির উপর আমাদের আসক্তি লক্ষ্য করেই সে এতটা বলতে সাহস করেছিল। যাই হোক আমরা, জয় কেদারনাথ, বোলে যাত্রা করেছিলাম কিম্বা অভ্যাসবশে দুর্গা দুর্গা বোলে যাত্রা করেছিলাম মনে নেই, তবে যে চড়তে আরম্ভ করলাম এটা নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রথম আরোহণ সহজ, তার পর ধীরে ধীরে কঠিন পথ পড়লো।

হিমালয়ের এই স্তরে গাছপালা বড় বেশী নেই। তা বোলে উদ্ভিদবর্জ্জিত ভূমিও নয়। ছোট ছোট ঝুপি জঙ্গল, মাঝে মাঝে ফুলভরা ক্ষেত্র কতক কতক;—সে যে কি সুন্দর নানা রং-এর ফুলশয্যার রচনা। মাটি ও পাথরের উপর এমন সুন্দর ঋতুপুষ্পের বিস্তৃতি, দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে মনের মধ্যে এই চিন্তাই এসে পড়ে এমন স্থানে, এই দুর্লভ ফুলের সমাবেশ হোলো কি করে। স্রষ্টার কি জায়গা ছিল না এইসব পুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য দেখাবার? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোলো এখানে যদি এই স্বর্গের সৌন্দর্য্য না দেখতাম তা হলে চলতাম কি সুখে?

নেশার ঘোরে চলতে চলতে সামনেই দেখলাম উঁচু নীচু ভূমিতে তুষারের বিস্তার। প্রকৃতির অতি প্রিয় এই রম্যস্থলের সঙ্গে সঙ্গেই এই তুষার ভূমির অস্তিত্ব। তবে এটা ঠিক আমরা সমতল ভূমির জীব, এখানকার দৃশ্য বৈচিত্র্যই আমাদের মনে বল যোগায়, অবসাদ আসতে দেয়না সত্য কিন্তু এখন এতটা উঁচুতে চলতে দৃশ্যের প্রভাব সত্বেও বুঝিয়ে দিচ্ছে তুষার ভূমি অতিক্রম, বড়ই কষ্টকর, কঠোর তপস্যার ব্যাপার। এইখানেই

যাত্রীদের বেশী কষ্ট। হাঁফ লাগে, প্রতি পাদক্ষেপেই বিশ্রামের দরকার হয়। তার এইটাই শেষ কষ্ট এ পথে।

এখানে দাঁ মশাইদের কথা একটু বোলে রাখি। রামবরহাতে সুখে থাকবার ব্যবস্থা থাকলেও চিকীৎসার ব্যবস্থা ছিলনা। এ অঞ্চলেই কোথাও সেটা নেই। সেখানে সারাক্ষণ যন্ত্রণার ভিতর দিয়েই কেটেছে তাঁর। আমার আরও একটু মনে হোলো, দাঁ মশাই একটু আপ্ত-সুখী, আন্তরিক সহানুভূতিশূন্য মানুষ। ঐ দুঃস্থ বন্ধুটিই এ পথের সম্বল। রাজচন্দ্র নামটা পরিচয় বেলা ব্যবহার করে পরে ন'কড়ি বোলেই ডাকছিলেন বরাবর;—এবং সেই নকড়ির উপরে সমস্ত কাজ চাপিয়ে মুখের কথায় সকল দায়ীত্ব পালছিলেন। সারা পথটা অসহ্য যন্ত্রণা-কাতর রোগীকে নিয়েই তাঁদের কেদারনাথে এসে পড়তে হোলো এমনই অবস্থায় যখন নারী প্রাণের সহ্য ও ধৈর্য্য অধিকারের সীমান্তে এসে পড়েছে। ভাবছিলাম বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই নারী প্রকৃতি, সারা জীবনই যাদের সহ্য ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে আসতে হয়। সুধু নারী বোলেই এতটা সম্ভব হয়েছে, পুরুষ হলে কখনই এটা হোতোনা।

১০

কেদারনাথ ধামে

জেঠামশাই যা বলেছিলেন, তাই তো ঘটে গেল, এখানে ডাক্তার কোথা? একমাত্র একটি অস্থায়ী পোষ্ট অফিস আর সরকারী একটি ডাক বাঙ্গলা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। হাসপাতাল তো দূরের কথা এ রাজ্যে কোন কালেই কেউ অসুস্থ হয়না বোলেই সম্ভবতঃ কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাই নেই। সেদিন যাত্রী সংখ্যা ছিল দশ থেকে বারোজন। পাণ্ডারা নিজ নিজ যাত্রী নিয়েই ব্যস্ত রইলো, আমরা প্রায় নিরাশ হয়েই এসেছিলাম,—কিন্তু ঐ পীড়িতা নারীর ভাগ্যক্রমে এখানে এক অপূর্ব্ব যোগাযোগ ঘটে গেল, এমনটা হবে আমরা কেউ কল্পনাও করিনি।

এখানকার যিনি প্রধান পুরোহিত বা পূজারী তাঁকে রাওয়াল বলা হয়। তিনি তখন মন্দিরেই ছিলেন, এদের পাণ্ডা তাঁর কাছে গিয়ে সব কথাই বললে, অবশ্য কিছু আশা করে বলেছিল কিনা তা জানি না। তবে ফলটা তার হোলো ভালই। তাঁর সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, তিনি কবিরাজ, উখী মঠেই থাকেন, এখন রাওয়াল সাহেবের সঙ্গে এসেছিলেন। এখন তাঁকেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন। এই লোকটির আবির্ভাব এখানে, এই সময়ে অকাট্যই বিধাতার কৃপা যে সেই মনে করি, তিনি না থাকলে কি যে হোতো তা আমরা ভাবতেই পারি না। এখন তিনি এসে বেশ ভাল করে দেখলেন, শুনলেন, পরীক্ষা করলেন, শেষে বোললেন, আপনাদের ভয় পাবার কোন কারণই নেই কারণ

হাড় ভাঙেনি,—এ দুই একদিনেই সেরে যাবে। এর ব্যবস্থা করচি ইতিমধ্যে আপনারা একটু ভাল নরম শয্যার ব্যবস্থা করুন,—অনেকটাই কষ্ট পেয়ে এসেছেন। তারপর, আমি এখনই আসচি, বোলে চলে গেলেন।

এই কবিরাজটি ছোকরা, মনে হয় আমাদেরই বয়সী কিন্তু অতি বিচক্ষণ মানুষটি, কাজ দেখেই বুঝলাম। তিনি চলে গেলেন,—তারপর এলো রাওয়াল সাহেবের লোক সঙ্গে একটা বেশ মজবুত খাটিয়া, বিছানা কম্বল কত কি। মন্দির ছেড়ে আসতে পারবেন না—বলে এইসব পাঠিয়েছেন এগারোটার পর আসবেন দেখতে। দেখতে দেখতে চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারপর রাওয়াল সাহেব এলেন। বাইরের লোকে রাওয়াল সাহেব বলে, কিন্তু সাহেব কথাটা রাওয়ালের সঙ্গে মোটেই যুক্ত হবার উপযুক্ত নয়; রাওয়াল জী বা মহাশয় বলাই ঠিক। এই রাওয়াল, রাও, বা রায় অর্থে রাজা আর পিছনের য়াল, অর্থে উর্দ্ধতম, অর্থাৎ রাজার উপরের রাজা তিনিই এখানকার রাজা, মহান্ত, পুরোহিত-প্রধান, পুরোধা এক কথায় এখানকার সর্ব্ব ব্যবস্থার মূলে তিনিই। দেখতে বেশ দোহারা, প্রৌঢ়, চেহারায় সম্ভ্রম দাবী করে। তিনি এসে দেখলেন রোগীনীকে শোয়ানো হয়েছে। যন্ত্রনায় তখনও ছট্‌ফট্ করছিলেন। তিনি বসলেন না যতক্ষণ ছিলেন দাঁড়িয়েই ছিলেন। কিন্তু যে কথাগুলি বললেন, আর এমনই প্রীতিপূর্ণ ভাষায় বললেন,—তা অপূর্ব্ব, এবং আন্তরিকতায় ভরা। ভাষা সরল হিন্দি কিন্তু দাঁ মশাই এমন ভাবে শুনছিলেন, মনে হোলো যেন এক বর্ণও বুঝতে পারেন নি। রাওয়াল বললেন, সেই কোন সুদূর কলকাতা থেকে এত কষ্ট করে, এতটা হেঁটে আপনারা এসেছেন, দেবতার উপর নির্ভর করেই না এসেছেন? ভয় কি, এই দৈব দুঃখ্য,—চলে যাবে। এই কঠিন তীর্থে আসবার সাহস যে মেয়েদের হয় ভক্তি তাঁদের অসাধারণ। কেদারনাথের কথা স্মরণে থাকবে, তাই পথে কঠিন আঘাত পেয়েছেন।

শুনবার পর কিছু হিন্দুস্থানী বুলী না বললে কলকাতাবাসী বড় লোকের মান থাকবে না, কাজেই দাঁ মশাই, যে ভাবে দারোয়ানকে সম্ভাষণ করেন সেই ভাবেই বললেন, হাঁ জি, হামলোক কা বহুত কষ্ট হুয়া হ্যায় পথমে, আমি যেমন করকে হোক এই মা জিকে, সারায়কে, হামলোক যেতনা জলদি হোগা ঘরমে ফিরকে যানা মাংতা। কলকাতামে হামলোক কা বড় কারবার চলতা হ্যায়, যাস্তি রোজ হামলোক থাকতে পারেগা নেহি। তারপর শেষে বললেন, যদি কখনও কলকাতামে যায়গা, হামরা মকান মে আনা, বেণীয়াটোলামে হামরা বাড়ি হ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। রাওয়াল অবাক হয়ে শুনলেন তার কথা, তারপর যখন কথা শেষ হোলো তখন একবার সম্ভ্রমপূর্ণ সৌজন্যতা দেখিয়ে একবার মাথাটি উঁচু আর নীচু করে বললেন,—জী, হাঁ। এমন সময় কবিরাজও এসে পড়লেন, হাতে এক গোছা জড়ি বুটী।

সঙ্গে তাঁর লোক ছিল, এখানেই শিলাউটি ছিল, পিষানো আরম্ভ হয়ে গেল। পিষ্ট করে বাটা হলে, তিনি ঐ হাটুর উপর যতদূর ফুলেছিল ততদূর অবধি লাগিয়ে দিলেন, শেষে তার উপর কয়েকটি ভূর্জ্জপত্র দিয়ে বেশ করে ঢেকে তার উপরে কাপড় জড়িয়ে দিলেন বেঁধে। বললেন, এ আর খোলা হবে না, সেরে গেলে আপনি খসে পড়ে যাবে। তারপর সবার উপর শান্তিপূর্ণ ব্যাপার এই হোলো যে এই প্রলেপটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, যন্ত্রণার নিবৃত্তি হল, আর অল্পক্ষণেই রোগী ঘুমিয়ে পড়লো; আজ দু'রাত্র ঘুম ছিল না। আমাদের পক্ষে এটা বড়ই সুখের হল। কবিরাজ, যাবার আগে সবাইকে একান্ত ভাবেই অনুরোধ করলেন, কোন কারণেই যেন রোগিণীর ঘুম ভাঙ্গানো না হয়, খাবার জন্যও নয়।

আমার একটু স্বার্থ ছিল; কবিরাজ লোকটির সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার জন্যই তার সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম। কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে বেশ সম্প্রীতিও হয়ে গেল, তখন ঐ যে বনৌষধি,—যে গাছের ব্যবহারে সদ্যফল পাওয়া গেল, গাছটি চিনে নেবার চেষ্টা করলাম, তিনি আমায় দেখিয়েও দিলেন। আমি তার কত গুলি পাতাও সংগ্রহ করে ছিলাম। উনি বললেন, পাতা শুকিয়ে গেলেও খানিক ভিজিয়ে বেটে নিলেও কাজ হবে। ওখানকার নাম ফুল্সান ঝাড়। এখানে, ঐ কবিরাজের মত অনুগত মানুষ দেখিনি আর রাওয়াল মশাইয়ের মত সদাশয়ও দেখিনি। যাইহোক এদের কাজকর্ম দেখে দাঁ মশাইয়ের প্রাণেও শান্তি হোলো। তিনিও নিজেকে কম বিপন্ন মনে করেন নি;—তবে তাঁর রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি একথা আমি নিশ্চিৎ বোলতে পারি। এ পর্য্যন্তই ভালো দাঁ পরিবারের কথা;—এখন আমারও যেন গা থেকে একঠা বিরাট বোঝা নেমে গেল; এখন প্রাণ, মন, সমর্পণ করলাম কেদারনাথ তীর্থের উপর।

জেঠাজির অধিকারে কোথাও কোন জটিলতা নেই;—আমরা কমলীবাবার ঐ ধর্ম্মশালাতেই, বিপরীত দিকের একটা ঘরে স্থান করে নিয়েছিলাম আর জেঠার উপর ভাত ছাড়া আর সব কিছু রান্নার দায় চাপিয়েই একটু ঘুরে ফিরে দেখতে বেরিয়ে গেলাম।

কেদারনাথের মন্দিরটা প্রথমে অনেকটা অর্থাৎ বেশী দূর হতে যতই চিত্তাকর্ষক মনে হোক, মাঝামাঝি দূর থেকে সত্যই চমৎকার দেখায়। মন্দিরের বন্য বা পার্ব্বত্য শ্রী, দূর থেকে যেমন ক্ষুদ্রায়তন ও অস্পষ্ট, মধ্যপথ থেকেই শোভা অনেক স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু এর অন্য মাধুর্য্য সাধারণের চিত্তগোচরে আসবার পথে প্রকাণ্ড একটা বাধা আছে। কারণ এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সাধারণের চক্ষে অভ্যস্ত নয়। হিমালয়ের শিবালিকা থেকেই মন্দির স্থাপত্যের রূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হলো বলা যায়, বিশেষতঃ রুদ্র-প্রয়াগের

পর আরও বহুদূর গুপ্ত কাশী থেকে, বিশেষতঃ ত্রিযুগীনারায়ণ থেকেই সম্পূর্ণ শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির বিশেষ রূপ—বৈচিত্র্য লক্ষ্যনীয়। তারপর থেকে যে সকল মন্দির হিমালয়ের মধ্য অঞ্চলের অন্তর্গত সেগুলি প্রায়ই পূর্ব্ববর্ত্তি মন্দিরের অনুকরণ। এ সকল মন্দিরের আসল গড়নটা ভুবনেশ্বরের হুবহু অনুকরণ কেবল শীর্ষ দেশেই উচ্চ স্তরের হিমালয়স্থ জল তুষার সহনোপযোগী আকার দেওয়া হয়েছে। পুরী বা ভুবনেশ্বর মন্দিরের শীর্ষে যা কিছু অলঙ্কার এবং গুরুভার চক্রাকার দুই তিনটি স্থূল, পর্য্যুপরি ন্যস্ত রচনা তার উপরে কলস দুটি বা তিনটি, বড় থেকে, দেখা যায় ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে গেছে, সবার উপর দণ্ড যুক্ত পতাকা। এদিকে মন্দিরের উপরে চতুষ্কোণ ছত্র বেশ ছোটখাট একটি চত্তর,—পাথরের টালীর ঢালু ছাদ, কেন্দ্রে দণ্ডের উপর পতাকা। এই পার্থক্যই এ অঞ্চলে মন্দিরকে বিশেষ রূপ দিয়েছে। কেদারের কথা অন্য দিকেও একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সে কথাটাই এক্ষেত্রে বিশেষ কথা। কেদার মন্দিরের সামনেই যেটা নাটমন্দির বা জগমোহন, তারই প্রবেশ পথের উপরের ঐ ত্রিকোণ আকার শীর্ষ ঐটিই মন্দিরের বৈচিত্র্যের পরাকাষ্ঠা, সেই কথাই বিষদ ভাবেই বলতে চাই ছিলাম। যাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য গ্রীক মন্দির ভাস্কর্য্যের পরিচয় আছে প্রথমেই তাদের এই বৈচিত্র্যই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হয়ে যায়, যা হিমালয়ের অপর কোন অংশেই নেই বা দেখা যায় না। ঠিক যেন গ্রীক মন্দিরের ত্রিকোণ পেডিমেণ্ট।

১১

শ্রীশ্রীকেদারনাথ

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের পল্লিগৃহ কি সুন্দর। যাকে চালাঘর বলি তারই উপরে, দুইপাশে যেখানেই দুদিকের ঢালুছাদ মিলেচে, পাশ দিক থেকে দেখলে সেখানে দুদিকেই দুটি ত্রিকোন রচনা দেখা যায়। কেদারনাথ মন্দিরেও সেই সূত্রে সামনেই, শীর্ষদেশে ঐ ত্রিকোন রচনা, সেটা অলঙ্কৃত পেডিমেণ্টের কাজ করছে। এ আকর্ষণ বা বৈচিত্র্য হিমালয়ের কোন প্রদেশের কোন মন্দিরেই নেই। অন্য স্থানে ঐ স্থাপত্যে যেটা দুই পাশে থাকার কথা, কেদার মন্দিরের ঐ স্থপতি, নাট মন্দির রচনায় সেই ত্রিকোনকে একেবারে সামনে, সিংহদ্বারের উপর এনে সুধু বিচিত্র নয়, তাঁর স্থাপত্য রচনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ বিশেষত্ব আর কোথাও নেই। জানিনা এভাবে আর কেউ দেখেছে কিনা। কিন্তু এমনই এই রচনা বৈচিত্র্য যে এটি না দেখে ঐ মন্দির পানে চলা অসম্ভব। মন্দির চুড়ায় চার চালার ছত্রির উপরে সোনার কলস তাতে এক দণ্ড, সেইদণ্ডে এক পতাকা সংলগ্ন আছে। সেইধ্বজে বেশ প্রশস্ত ক্ষেত্রে, হাতির উপরে এক ব্যাঘ্র মূর্ত্তি আঁকা, নানা রংয়েই চিত্রিত আছে দেখা যায়। প্রথমে ঢুকেই ঐ নাটমন্দির বা

জগমোহন, যা সাধারণত প্রায়ান্ধকারই হয়ে থাকে তারপর আসল মন্দির বা গর্ভ গৃহ, রত্নবেদী ইত্যাদি যেখানে, সেখানে চির অন্ধকার, দিবালোকের সেথায় প্রবেশাধিকার নেই। দীপ জ্বালার জন্যই ঘিয়ের জালায় যথেষ্ট গব্য ঘৃত সঞ্চিত আছে। দীপাধারে

শ্রীশ্রীকেদারনাথ
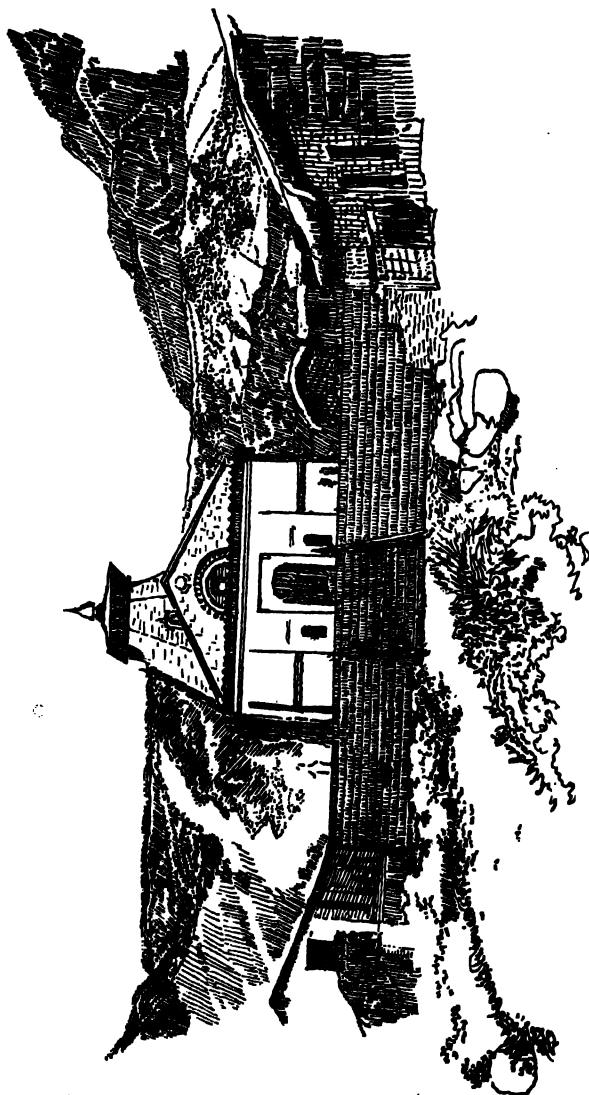
দিবারাত্র সে দীপ জ্বলচে কখনও নেভে না। বাইরে যতই প্রখর রৌদ্র থাক ভিতরে সে আলো যায় না।

মন্দিরের পোস্তার উপর চারদিকেই প্রশস্ত অনাবৃত চাতাল আছে। নীচে পথ থেকে

মন্দিরে যেতে দুধারেই মাটি পাথর দিয়ে তৈরী কতকগুলি ঘর, ঐ প্রকার ঢালু ছাদ দেখা যায়। ঐসকল ঘর মন্দির সম্পর্কিত লোকদের জন্য, আবার যাত্রীশালাও আছে তার মধ্যে। তার পরেই অনেকটাই ফাঁকা জমি, সামনেই মন্দিরের পোস্তায় উঠবার জন্যই সাদাসিধা পাথরের তৈরী বেশ প্রশস্ত অনেকগুলি ধাপ বা সিঁড়ি, দশ বারোটি হবে, নীচের জমি থেকে বরাবর বারাণ্ডায় উঠেছে। সেই পোস্তায় উঠে সামনেই প্রবেশদ্বার আরও গোটাকয়েক ধাপ উঠে তারপর নাটমন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। এর সবটাই ফাঁকা উপরে আচ্ছাদন নাই তাই, যাত্রিদের সবাইকে, ভিজতে হবে যতক্ষণ না মন্দির দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। মন্দির অনেকটাই উঁচু ভূমিতেই নির্ম্মিত। বিশাল ক্ষেত্র, পর্ব্বতের উচ্চস্তরের পরিস্থিতি, তরুলতাও পক্ষি কলরব শূন্য নীরব, নিস্তব্ধ, বিজন, তাপ শূন্য রাজ্যের মধ্যেই ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত, যা সমুদ্র তল থেকে সাড়ে বারো হাজার ফিট, তিন মাইলের উপর। তার পিছনের দৃশ্যটি এখানকার স্থান মাহাত্ম্যে বড় কম গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। অদূরেই পশ্চাতে এবং পার্শ্বেই তুষার লিপ্ত অত্যুঙ্গ শৈলমালা, বৎসরের আট মাস প্রায় তুষার শুভ্র থাকে। মন্দিরের পোস্তা থেকেই দেখা যায়, বাঁদিকে দূরে মন্দাকিনী নেমে আসছে, অল্পই প্রশস্ত দীর্ঘ, বাঁকাচোরা তীর্য্যক গতিতে, সামনের পর্ব্বত শৃঙ্গ থেকে। নীচের দিকে নামাটা যেন শুভ্র ছায়াপথের কতকাংশ। এই সকল মিলিয়ে ঐ মন্দিরকে এমনই এক মহান দৃশ্যে পরিণত করেছে যার বর্ণনা অসম্ভব, সুধু দেখে অনুভব করবারই বিষয়। এই মহান দৃশ্যের তুলনায় বদরীকাশ্রমের মন্দির সংস্থান ও পরিবেশ একেবারেই নগন্য। গ্রামের পথ থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে কেদারনাথ মন্দিরের দৃশ্যরূপ অসাধারণ গম্ভীর্য্যপূর্ণ, বিরাট, এবং রহস্যের আকর এ কথা সহজেই মনে হয়। এরা বলে শিব এখানে প্রথমে বৃষরূপেই লোকচক্ষে ধরা দিয়ে ছিলেন।

যথাকালে এই মহাতীর্থে পৌছে প্রথমেই জানা গেল এখানে লকড়িও জলের কষ্ট। একটি জলোচ্ছাস মাত্র কেদারের সম্বল। হু হু শব্দে জল উঠছে পাথর ফুঁড়ে আর তাই যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে লোকে অভাব মিটিয়ে নিচ্চে। ঐ রকম স্থানে যে বিষম ভীড় হবে এতো জানা কথাই। যাইহোক এক্ষেত্রে যথা সম্ভব পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে একবার মন্দির প্রবেশ করা গেল, অবশ্য পাণ্ডার শরণাপন্ন না হলে প্রবেশের উপায় নেই কারণ, দ্বারদেশ কেল্লার মতই সুরক্ষিত থাকে।

মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে একেবারেই কেন্দ্রে যে বিরাট শিবলিঙ্গ তার কথায় আর কাজ নেই। সেটি কত শত সহস্র ভক্তের হাতের ঘর্ষণে সেই কঠিন পাথরখানি একেবারেই চোস্ত এমন কি মসৃণ হয়ে গিয়েচে। বাইরের দিকে মন্দির শীর্ষে যে খাঁটি সোনার কলস, তার মূল ঐ চতুষ্কোন ছত্রের কেন্দ্রে। তারপর মন্দিরস্থ গর্ভ গৃহের কেন্দ্রে গৌরী পট্ট, তার উপরে বৃষ ককুদের আকার অর্থাৎ অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি

শিবলিঙ্গটি ঠিকই আছে, তার উপর শুকনো বেলপাতা জল, দুধ, সচন্দন শুকনো ফুল, কি যে নয় তা জানি না পূজা উপহার সূত্রে সবই আছে স্তুপাকার সেই লিঙ্গের উপর। এখন অন্যান্য দেবতা যারা আছেন পঞ্চ পাণ্ডব, তারপর মধ্যে প্রধানা কুন্তি দেবী তারপর দ্রৌপদী এবং লক্ষ্মীদেবী বিরাজমানা। কেদারনাথের দিকে মুখ একটি ঘোরতর কৃষ্টবর্ণ কষ্ঠী পাথরের বৃষ মূর্ত্তি একটি, প্রস্তর বেদীর উপরে স্থাপিত। প্রকাণ্ড বৃষটি বাইরে প্রাঙ্গণে রাখা আছে অবশ্য।

পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত আছে তা শুনে রাখা ভালো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের বহু হত্যা জনিত মনের গ্লানী আর কাটে না। তাই তাঁরা হিমালয়ের মধ্যে এসে এখানে শিবের দর্শন প্রার্থী হলেন; শিব এখানে প্রথমে একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তিতে তাঁদের সামনে এসে লেজ তুলে ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে ভীমসেন সেই ষাঁড়ের পিছনের পাদুটি ধরে শূন্যে তুলে ফেললেন, তারপর বিষম ভাবেই ঘোরাতে আরম্ভ করলেন। সেই ঘোরানো এমন যাতে তাঁর মুণ্ডটি ছিঁড়ে একেবারে নেপালের মধ্যে গিয়ে পড়ল, বাকী শরীরটা ভীমসেনের হাতেই বাবা কেদার-নাথ হয়ে এইখানে রইলেন, আর মুণ্ডটি সেথায় পশুপতিনাথ হয়ে প্রতিষ্ঠিত। এই হোলো কেদার ও পশুপতিনাথের উৎপত্তি ব্যাপার।

যাইহোক প্রথম দিনেই আমরা সব কিছুই দেখলাম। পূজা, অর্চ্চনা, মন্দিরের মধ্যে সব কিছু দর্শন, স্পর্শন, ভোগ-রাগ, প্রসাদ, চরণামৃত পান,—যদিও চরণের কোন চিহ্নই নেই প্রতিকের, আশীর্ব্বাদ পাওয়া, তারপর বার হয়ে চতুর্দ্দিকে অন্ততঃ তিনবার প্রদক্ষিণ, সবই বিধিমত প্রকারে পালন করলাম। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দ্রষ্টার দৃষ্টিতেই দূরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরেই দেখলাম। দেখি, ফিরে যাবার তাড়া, অর্থাৎ কতক্ষণের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করে নেমে যাবো, এজন্য যাত্রীদের কি অসাধারণ ছটফটানী। আরও দেখলাম, এখানে তাদের কোন আকর্ষণই নেই, উধাও ছুটেছে প্রাণ সেই নিজ দেশে, নিজ স্থানের পানে। এই সব দেখেই ক্রমে আমার মধ্যে এক বিষম অবসাদ এসে উপস্থিত হ'ল। এতক্ষণ চমৎকার একটা উদ্দীপনা অনুভব করছিলাম; ঠিক যেন তাতে ভাঁটা পড়লো, তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। সে দুঃখ কাকেও বলবার কথা নয় সুধু অন্তর্য্যামীই জানেন। প্রাণ থেকে যেন কে বোলে উঠলো, হে বিশ্বেশ্বর, জন্ম থেকেই আমরা তোমার সৃষ্টিতে জীব কোটির মধ্যেই বাঁধা আছি,—পুরুষানুক্রমেই এইঘর সংসারই করে আসচি, —সেই প্রাতঃকালে উঠে কর্ত্তব্যে বাঁধা উৎসাহ নিয়ে লেগে যাই, প্রতিদিন, জীবনের প্রতিটিক্ষণ, আপন জন, পর, শত্রু, মিত্র, এই সব নিয়ে নিজ ক্ষুদ্র বাসস্থানটুকুর মধ্যে ভোগের ধান্ধায় থাকতেই ভালবাসি, এতে আমাদের কারো অরুচি হয় না কখনও। তার

মধ্যে কারো, বোধ হয়তো লক্ষ্যের মধ্যে এক জন, কি জানি কোন সুকৃতির ফলে একবার মাত্র কিছু অল্পকালের জন্যই তোমার প্রিয়লীলা ভূমি,—এই হিমালয়ের মধ্যে, পবিত্র মনে দেবস্থানের উদ্দেশে অনেক তপস্যার ফলে পদার্পণের অধিকারী হয়, কিন্তু সেই অধিকারী, তোমার এই জাগ্রত মহিমার মধ্যে এসে পড়লেও এই অমৃতময় তোমার পরশ এত অল্প কালটুকুই চায় কেন? তারপর অসহ্য হয়ে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রাণে মনে এত ছটফট করে কেন? কেন তার প্রাণে আরও দীর্ঘকাল এই অমৃত পরশ পাবার প্রবৃত্তি থাকে না। অথচ কে নাজানে যেখান থেকে আমরা আসি,—এই পবিত্র ক্ষেত্রের তুলনায় তা নরক বললে নিশ্চয়ই মিথ্যা বলা হয় না। এই স্বর্গের পরিস্থিতির মধ্যে এসে, এই দেব সম্পদের অধিকারী হয়ে, এর মধ্যে থেকে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে বেরিয়ে যেতে পারবো এই চেষ্টা এতই প্রবল হয় যে, এতদিনের সঙ্গী একজন, যার সঙ্গে এখানে এসেচে, পরস্পরকে ভালবেসে এতদিন অবিচ্ছেদে,—কঠিন পার্ব্বত্য এবং কষ্টকর পথগুলি, একত্র অতিক্রম করে পৌছেচে, এখানে আজ তার ইচ্ছা, আরও একটি মাত্র রাত্র যাপনের প্রবল অনুরোধও উপরোধ প্রত্যাখ্যান করে ছুটে চলে যেতে দেখছি নীচের পথে। তার ঐ নেমে যাবার টান দেখে এই কথাই কি মনে হয় না যে এই ক্ষেত্র একজনের পক্ষে যতই উচ্চ স্তরের যতই স্বর্গের অধিকার বোলে মনে হোক না কেন,—আর একজনের কাছে এর মূল্য নাই। এই কথাই কি ঠিক নয়?

আমার কাছেই পিছনদিকে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন সেই বাবাজী,—রামপুর থেকে ত্রিযুগীনারায়ণের পথে শেষ দিকে যে দুতিন জন ছিলেন তারই মধ্যে একজন, বাঙ্গালী, নামটা জানা হয়নি। তিনি এখন বললেন, আপনি যেটা সিদ্ধান্ত করেছেন ওটা ঐভাবে দেখলে ঠিক হবে না। আসলে অমৃতের আস্বাদনেও রুচি গঠন দরকার, যে কখনও আস্বাদ করেনি তার পক্ষে প্রথমবারে মিষ্ট বোধ হলেও রুচি তখনও তার মধ্যে জন্মায়নি,—মানুষে মানুষে তারতম্য আছে তো। আপনিই তো দেখেছেন ত্রিযুগী নারায়ণের পূজারী সেই দণ্ডী সন্ন্যাসী, দেহত্যাগ করবেন বোলে ঐখানেই দিন গুণছেন। আমি আশ্চর্য্য হোয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। তিনি আমার সঙ্গে ত্রিযুগী নারায়ণে ঐ মন্দিরের স্বামিজীর দেহত্যাগের কথা কেমন করে জানলেন? তিনি বললেন, কথাটা তিনি আমাকেও বলেছিলেন। তাছাড়া আপনার পাশেই বসেছিলাম, একজনকে দেখেননি যেখানে ধর্ম্মশালায় যখন পুরান কথা হচ্ছিল? পাগড়ী ছিল তাই লক্ষ্য করেন নি তাছাড়া আমি তখন একটা ক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলাম তাই আপনার কাছ থেকে পৃথক থাকতে হয়েছিল, পরিচয় আলাপের কোন প্রয়োজনই ছিল না তখন। তাছাড়া আপনি ঐ কথক দণ্ডী স্বামীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বেশ ছিলেন দেখলাম। এতে আপনারও লাভ আমারও লাভ,—বেশ চমৎকার ব্যাপার নয়?

আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, শেষে তিনি বললেন,—এইভাবে তাঁর এই সৃষ্টির কাজ চলচে, কারোর কাজে কারোর কোন অসুবিধা বা বাধা সৃষ্টি করছে না। এ ভাবতো আপনার অজানা নয়। তিনি তারপর, জয় শঙ্কর! বোলেই চলে গেলেন। আমি প্রথমে চিন্তে পারিনি তারপর যখন চিনলাম তখনও আমার মধ্যে যে একটা বিস্ময় ক্রিয়া করছিল বহুক্ষণ তা কাটেনি। এই রাজ্যে, মায়ামোহমুক্ত ভাবরাজ্যে, কত রকমের কত কত মানুষই দেখলাম। আমার যতকিছু অনুভব,—সবটাই যেন রহস্য মিশিয়ে মনের মধ্যে সব কিছুরই একটা পরিচয় নিয়ে আসচে। যাকেই দেখি, অবশ্য এই তীর্থের পবিত্রতাভরা এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বা স্থান মাহাত্ম্যে, মনে হয় তাদের পরিচয় আমার মধ্যে যেন ধরাই আছে, সুধাবার প্রয়োজনই নেই। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কেদারে আসবার পর থেকেই লক্ষ্য করচি। এভাবে কিন্তু সাধারণ কাকেও দেখিনি, পুণ্য তীর্থে এসে তাড়াতাড়ি সব কিছু কাজ সেরে চলে যাবার জন্য ছট্‌ফটানী অথবা শীতের নালিশ, তুষার ভূমিতে পা পিছলানোর নালিশ,—জিনিষপত্র অভাব হেতু দুর্মূল্যের নালিশ, এই সব নিয়ে যারা দিন কাটাচ্চে তাদের সঙ্গেও খানিক খানিক মিলনের অবকাশে এটা বুঝতে দেরী হয় নি যে তারা বড় কষ্ট করেই এসেছে, আর্থিক যোগাযোগ ঘটিয়েছে—যে পুণ্যটুকুর লোভে একাজ করেছে এখানকার কাজ-টুকু শেষ করে সেইটুকু সম্বল করে চলে যাবে স্বস্থানে যেখানে এ রকম আধিভৌতিক উৎপাত নেই।

এই সব নানাপ্রকার ভাব দেখে তখনই আমার বিশেষ এই সত্য ও সহজ ধারণা অন্তর ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়েছে যে বেশীভাগ সমতলবাসীর মনে হিমালয়ের মহান ক্ষেত্রে মহিমা সম্পর্কে কোন দাগই পড়েনা, শুধু, মনের একটা কৌতূহলজাত অস্পষ্ট তীর্থের সংস্কার নিয়ে আসা, পরে পর্ব্বত আরোহণের অসাধারণ শারীরিক কষ্টপ্রভৃতি দুঃসহ ব্যাপারে জড়িত হয়ে নিজেকে বিপন্ন মনে করেন তাই তীর্থে করণীয় যা কিছু সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে নিজ বিষয় কর্ম্মে কতক্ষণে নিযুক্ত হয়ে সেই গতানুগতিক কর্ম্মের ভিতরে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারবেন সেই চিন্তাই ঐ শ্রেণীর তীর্থ যাত্রীর মনেই প্রবল। তার মধ্যে যাদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য আছে তাঁরা কিছু অধিক ব্যয় করতে পারেন নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য কতক আর তীর্থ ধর্ম্ম, দান, পূজা বাবদ যা কিছু খরচ। তারপর যাঁরা ঠিক সৌখীন এখানের মূল্যবান দ্রব্য ক্রয়ে খরচ করেন তাতে তার মনের সুখই সবার বড় কথা। আর একশ্রেণীর যাত্রী তারা বেশীভাগ বাঙ্গালী আমার নজরে পড়েছে কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত কম তারা হিমালয় তীর্থাঞ্চলটি বেশ উপভোগ করবার ভাব নিয়েই ঘোরা ফেরা করছেন। তাঁরা শিক্ষিত কাজেই জীবন ব্যাপারে অনেকটা প্রস্তুত, তারপর পূর্ব্বাপর অল্পাধিক কয়েকজন ইউরোপীয় পর্য্যটকের হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচিত

তাই অনুসন্ধিৎসু হয়ে আসেন, বিদেশীয়গণের সুখ্যাতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে, নিজের চখে দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও দৃশ্যাদি উপভোগের প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে প্রবলই থাকে। কিন্তু যিনি যে ভাব নিয়েই আসুকনা কেন তীর্থ ধর্ম্ম ছাড়া মানুষের অনুভূতির একটী সহজ ভাব আছে, মন প্রাণভরা দৃশ্যরূপ, যা নিরালম্ব, অপর কোন ভাব বা সংস্কার তার সঙ্গে জড়িত নেই, এমনই ভাবে যিনি দেখবার অধিকারী, তিনিই দেখবেন হিমালয়ের শিবালিক থেকে গ্রেট হিমালয় রেঞ্জ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তুষার রাজ্য অবধি সর্ব্বস্তরেই রূপ ও রস পরিপূর্ণ।

শেষে একথাও সত্য—হিমালয়ের এই যে মহান রূপ, যা আবাহমান কাল থেকেই অচল, এবং গুঢ়, তার রহস্যময় পরিস্থিতি, ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব;—এর অধ্যাত্ম সম্পদ আজ যে ভারতের সকল প্রদেশেরই আকর্ষণের বস্তু, তার মূলে ঐ এক মহামানব, বহু কাল পূর্ব্বে এ দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যার প্রভাবে আজও আমরা কত কাজের মাঝে একবার হিমালয়ে যাবার, অন্ততঃ তীর্থ উপলক্ষেও শত কর্ম্ম ব্যস্ত জীবনে একবার দর্শনের স্পৃহা অনুভব করি। এই শঙ্করাচার্য্যের অভিযানের ফল তখনই আমাদের জাতীয় গৌরব হয়ে সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কেদারনাথই আচার্য্য শঙ্করের মহাসমাধি ক্ষেত্র। অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা জগৎপূজ্য সেই মহাপুরুষ শঙ্কর এই খানেই দেহত্যাগ করে ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত চার ধাম বা কেন্দ্রের মধ্যে উত্তর ধামে, কেন্দ্র রূপে যে মঠটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর স্থায়ী কীর্ত্তির অন্যতম সেটা আরও পূর্ব্বদিকে, এ পথে নয়। বদরীকাশ্রমের পথে যোশীমঠ বা জ্যোতীর্ম্মঠ বলেই প্রসিদ্ধ। এর পরেই আমরা ঐ পথে যাবো যার জন্য এই কেদার থেকেই আমরা প্রস্তুত হয়ে নিতে চাই।

যাই হোক এখন আমিও ঐ সুখটা পেয়ে গেলাম যা আমার আগে কত শত সহস্র লক্ষ কোটি যাত্রী পেয়ে গিয়েছেন, সে শুধু নাম মাহাত্ম্য নয়, প্রত্যেকেরই এই তীর্থে প্রবৃত্তির মূল কথা সেটা এই যে, ভিতরে হোক বা বাইরের হোক গতানুগতিক জীবন থেকে খানিকটা ছাড়া পেতেই এই তীর্থ যাত্রার উদ্যম সে দিক থেকে নিশ্চয়ই এর কল্যাণকর বা শুভ ফল থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তারপর এখানে, এই ভাবের যে ব্যতিক্রমও দেখা যায় সে কথা আগে অনেকটা হয়ে গিয়েছে সে প্রশ্ন তুলে কাজ নেই কারণ সেখানে জগৎ স্রষ্টা-পাতা বা বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কথাই এসে পড়বে, যা অনেকের মনেই সঙ্কোচ উৎপন্ন করবে নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার ফলে। সবার দেহ যেমন সমান নয়, সবার মন, বুদ্ধি সংস্কারও যেমন পৃথক, কিন্তু সেই সনাতন পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষে একই উদ্দেশ্যে এক স্থানে মিলে যায়, আর সেই মিলন থেকে যতই কেন না অল্প সময়ের জন্যই হোক, পুণ্য মিলনের স্মৃতি সর্ব্বকালেই সুখকর হয়ে থাকে। এই তীর্থের স্মৃতি

পরবর্ত্তী কর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের অনুভূতির মধ্যেও অনেক সময়েই কতকাংশে সুখকর হয়, সেই সত্যটুকু মনে রেখে আমরা ব্যক্তি গত ভাবে যেটুকুর অধিকারী তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করবো। তাই এখন তীর্থের অন্যান্য কথাই বলি।

এখানে আমাদের গৌরবের একটি বস্তু দেখলাম, আগে জানতে পারলে সেই খানেই উঠতাম কিন্তু ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নেবার পর জানতে পারলাম। স্বর্গীয় হরিদাস গুপ্ত মশাইয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম শালাটি। আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন এই হরিদাসগুপ্ত। তিনি বড়লাটের দপ্তরে কাজ করতেন, শেষে,—ইউ-পির একাউন্টেন্ট জেনারেল হয়ে ভ্রমণ পথে দেরাদুনে কলেরাতে মারা যান। এমন সাধু প্রকৃতির মানুষ জগতে দুর্লভ। তিনি সিমলার কালীবাড়ির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ভাবেই বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তাঁর জীবন। এখানে আগে যাত্রীদের বড়ই অসুবিধা ছিল, তখনও কালী কমলিবালার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলি এত উন্নত হয়নি, তখনও তিনি বড়লাটের দপ্তরেই নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে একবার কেদারে আসেন। পরে সব দেখেশুনে গিয়ে, যাতে সাধারণ বিশেষতঃ অক্ষম যাত্রীরা এখানে ত্রিরাত্র বাস এবং ভোজন পায় সেই ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

বেশী প্রকাণ্ড না হলেও দোতালা সুন্দর অট্টালিকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সকল প্রকার সুবিধাই আছে এই ধর্ম্ম শালায়। পরিমিতস্থান, দশ থেকে পনেরটির বেশী যাত্রী নেওয়া হয় না। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, এবং পল্লী সুবাদে কাকা হতেন এখানে এমনই এক আত্মীয়ের সংকীর্ত্তি লক্ষ্য করে প্রাণে প্রবল একটি উৎসাহ ও আনন্দ উপলব্ধি, এইটি বড় কম লাভ নয়।

এখানে এলাম মেঘাবৃত অম্বর, উপরে, নীচে কুয়াসার মত একটা পরদার ভিতর দিয়ে সব দেখতে লাগলাম, তার মধ্যে সবই পরিষ্কার, পাণ্ডাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, যাত্রীদের নিয়মিত এবং বিধিসম্মত সকল কর্ম্মই দেখলাম। আমার পাণ্ডাতো বালকিষন মিশ্র যার সঙ্গে হরিদ্বার থেকে যাত্রা করি। এই সময়ে আমরা পরস্পর কাজে লাগলাম। কেবল চরণ পূঁজা ও সুফল নেওয়া বাদে দক্ষিণা দিয়ে প্রথম দিনের সকল কাজই করলাম ঐ কুয়াচ্ছন্ন দিনের মধ্যে। ওঠা নামার চাঞ্চল্যে অনেকটাই শীতের জড়তা এড়াতে পেরেছিলাম। প্রথম দিনের সকল দেখাশোনার সকল কাজ হয়ে গেলে ভোজন, বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার আগেই আবার মন্দিরাঙ্গনে উপস্থিত হলাম সন্ধ্যারতি দেখবো। এই শিবের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এখানে যা কিছু দেখছি কোনটাই চক্ষে নূতন ঠেকছে না, পূজা আরতি স্তব পাঠ। যেমন কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে হয় সেই সব কিছুই, কেবল ক্ষেত্রটি দেশ থেকে সাড়ে বারোহাজার ফুট উপরে এক তুষার ক্ষেত্রের মাঝখানে।

শ্রীশ্রীকেদারনাথ

প্রথম এখানে সূর্য্যমুখ দর্শন হোলো দ্বিতীয় দিনে, প্রভাতের এক প্রহরের পর, প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল প্রকাশ সেদিন। হাওয়া চলতে লাগলো ঝড়ের মতই। শীত এমনই প্রবল হয়ে উঠলো, কোথায় একটু ঘুরে ফিরে দেখা-শুনা করা যাবে, তা না হয়ে অধিকাংশ যাত্রী মন্দির থেকে বার হতেই চায়না। কারণ ঐখানেই বাতাসের প্রবেশ নিষেধ ছিল। বেশীর ভাগ যাত্রী, বেশ কিছু বেশী মাত্রায় শীতে বিপন্ন হয়ে প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত মন্দির ছাড়েনি;—তারপর বাইরে এসেই সেই পবনদেবের পীড়ন, শীতের জ্বালায় হি হি করতে করতে তাড়াতাড়ি বাসায় উঠতে পারলেই বাঁচে। সাধু-সন্ন্যাসীদের তিতিক্ষা খুব বেশী, কেউ কেউ একখানা মাত্র কম্বল সম্বল করে এসেছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঐসব যাত্রীদের ব্যবস্থাও হয়ে গেল কারণ এখানে একজন দুজন, দানশীল যাত্রী থাকেই যাঁরা শীতার্ত্তদের কম্বল দান করেন। দেখলাম, কয়েকখানি কম্বল দান করলেন কয়েকজনকে, শুধু কম্বল নয় তুলাভরা জামাও কেউ কেউ দিলেন।

আমাদের দাঁ মশাই, ওভার কোটের উপর একখানা র‍্যাগ চাপিয়ে বাজারের সবগুলি দোকানেই ঘুরলেন দেখলাম, অনেক কিছুই কিনচেন। বেশ আনন্দ। সঙ্গের বন্ধুটি আশ্রমে সেই রোগীণীর কাছেই আছেন, ইনি গেলে তবে তিনি বেরোতে পারবেন। আজই প্রাতে খোঁজ নিয়েছিলাম ওখানে মেয়েটি এর মধ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, দেখলাম উঠে বসে নড়াচড়া করচেন।

যা কিছু চাই সরবরাহ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কবিরাজ প্রত্যহ দুবার আসতেন। অবশ্য এঁরা কিছু কিছু সাহায্য নিয়েই ছিলেন। জানিনা, এরজন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা। এখানে দুধ পাওয়া যায় না, ভাত, রুটি শুকনো আনাজ কিছু পাওয়া যায়। অনেকেই তাই ব্যবহার করেন। অনেকে নিজের মত কিছু কিছু শুকনো মুলো, ট্যাঁড়স, মটর, মুং এই এই সব নিয়ে যায়। আচার হরেকরকম পাওয়া যায়। বাজারে বেশীভাগ শীতবস্ত্র, শুকনো ফল, আচার, মিষ্টি প্যাড়া। হালুয়ায়ীরা পুরি, কচৌরী, হালুয়া প্রভৃতি তৈরী করে লোক-সমাগম বুঝে। এখানে কাঁচা আনাজ তরকারী দুর্লভ পদার্থ আর ও সুদুর্লভ বস্তু হোলো দুগ্ধ।

এখানকার বাজার শুনে আমাদের পাঠকেরা হয়তো কলকাতার বাজারের মতই একটা কিছু মনে করবেন কিন্তু আসলে তা নয়। তবে পরবর্ত্তীকালে বদরীনারায়ণে বাজার বোলে যা দেখেছিলাম তা অনেকাংশেই ভালো এবং দ্রব্যবহুল। এখানে ভোটিয়ারাও নানা মাল আনায়। এখানকার বাজার প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী, ভোটিয়া, উপর হিমালয়বাসী ভোটিয়া, দু একজন তিব্বতিও আছে যারা চামর, নানাপ্রকার পশুচর্ম্ম ও

পাথরের মালা শিলাজিতের ব্যাপার করে। শিলাজিত, তরলও আছে আবার স্থুল শুষ্ক শিলাজিতও বিক্রয় করে। আজ, আমাদের দাঁ মশায়ের সেই আহত, বিধবা কুটুম্বিনীকে দেখলাম মধ্যাহ্ন বেলায় এখানকার বাজার বা মেলার কথা শুনে দাঁ মশাইয়ের সঙ্গে ডুলিতে বেরিয়েছেন দেখতে এবং ইচ্ছামত খরিদও করচেন কিছু কিছু। তীর্থের সঙ্গে যে মেলার সম্পর্ক তা আধুনিক নয় অতীব প্রাচীন প্রথা। বিশেষতঃ হিমালয়ের এই বিশেষ বিশেষ স্থানে যে মেলা হয়, অন্ততঃ কেদারে, শুনলাম রাওয়াল সাহেবের এতেও একটা বিশেষ আয় আছে। যাই হোক, দাঁ গিন্নির (বোললে বোধ হয় দোষের হবেনা) ইচ্ছা একটি ছোট রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক মিলিত মালা কিনবেন। তাঁর মনোমত জিনিস তো পাওয়া গেলই না কারণ তারা বলে ও জিনিস তৈরী থাকে না, ঐ দুটি মালা পৃথক কিনে নিয়ে ঘরে মনোমত করে বানিয়ে নিতে হয়। অগত্যা তাঁকে তাই নিতে হোলো।

রাত্রে, সন্ধ্যার পর আরতি আর সমবেত কণ্ঠে ভজন আর স্তব পাঠ; জয় শিব ওঁকারা, জয় শিব ওঁকারা ইত্যাদি ত্রিরাত্রই আমাদের আনন্দ দিয়েছিল যার জন্য যাত্রা আমাদের সার্থক করলে। বোধ হয় সবাই থাকেন যখন এখানে কেদারনাথের পূজা, রাত্রে সন্ধ্যা-আরতি এবং স্তব পাঠ হয়। সেই পাঠ সমবেত কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয় তখন আর নিজের নাম-ধাম গাঁই-গোত্র কিছুই মনে থাকেনা। অনেক যাত্রীই শীতের প্রভাবে সন্ধ্যার মধ্যেই ঘরে গিয়ে শয্যাশ্রয় করে থাকেন সুতরাং এই স্বর্গীয় আনন্দে বঞ্চিত হন। কাশীতে বিশ্বনাথের যেমন সন্ধ্যারতির সময় একটি মহা আনন্দঘন ভাব জমে ওঠে, এখানে সেভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায় স্থান-মাহাত্ম্যে। সেটি বেশ লক্ষ্য করা যায়।

এই বিশাল নাটমন্দির এবং আসল মন্দির আলোকিত হতে পারে এমন যত আলো দরকার এখানে তার চার ভাগের একভাগও নেই। কাজেই যেটুকু আলো ঐ ঘৃতের দীপ থেকে পাওয়া যায় সেই প্রাচীনকালের পদ্ধতি তাই চলছে। কিন্তু দীপের অভাব সমবেত ভক্তমণ্ডলী এবং পূজকবর্গ আরতীর পর বন্দনায় পূর্ণ করে দেয়। এতদূর থেকে গিয়ে কঠিন তপস্যার পর, কোন এক নিভৃত তুষার প্রান্তরের উপর একটি মন্দিরের মধ্যে দেব-আরাধনা, আমরা দেখেছি, শুনেছি, সবকিছুই যেন এক স্বপ্ন বা মায়ার রাজ্যের মধ্যেই ঘটচে, এইভাবেই আমার মনে ক্রিয়া করেছিল।

তিনদিনে তিনরকম মূর্ত্তি দেখেছিলাম এই কেদারের। যে উঁচু পাষাণ স্তরের উপর মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে সেই পোস্তা থেকে আজ আমাদের চক্ষে পড়ে গেল এক অপরূপ দৃশ্য, আগে এমনভাবে দেখিনি। এ যেন নিত্যই নূতন, এখন দেখি, অপরূপ। পিছনের ঐ তুষার দীপ্ত পর্ব্বতশ্রেণী এই সময় প্রভাতের কুয়াশার পরদার মধ্যে দি' দেখাচ্ছে যেন ধ্যানস্থ শুভ্র শিবমূর্ত্তির মত। এখন নগ্ন স্তূপগুলি তুষারে ঢেকে গি

এবং ঐ শৃঙ্গের সর্ব্বাংশ তুষারে আবৃত, শুভ্র হয়ে আছে। এমন অপরূপ তুষার গঠিত ঐ গিরি শৃঙ্গের পরিস্থিতি, মনে হয় স্বয়ং কেদারনাথ মূর্ত্তিমান রয়েছেন ভক্তকে দর্শন দিয়ে, সদয় প্রসন্ন মূর্ত্তিতে যাত্রীদের এতদূর কঠিন তিতিক্ষা প্রধান যাত্রা সফল করতে। এটা কল্পনা প্রবণতা নয়, সেই রূপটাই কেদারনাথের, যার চক্ষুতে ধরা পড়েছে কেবল তার কাছেই সত্য বলেই মনে হয় ঐ রূপটি। ঐ পাষাণ স্তরের গঠনই এমন যে, উপরভাগ তুষার মণ্ডিত হলেই দৈবমূর্ত্তি আভাষ দেয়। তারপর আমাদের কোমল বৃত্তির যে গুণ, রূপকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে কুটস্থ আত্মারামের সঙ্গে এককরে নিতেই তৎপর; তাইতেই প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায়। দূরত্বের জন্য মন্দাকিনী, এই অপরূপ শ্বেত ধূসর মূর্ত্তি, যখন আসপাশের তুষার রৌদ্রতাপে গলে, নগ্ন পর্ব্বত মাত্র চোখে দেখা যায়, তখনও দেখায় ঐ মন্দাকিনীর সর্পিল গতি আর একরকম, যেন রাত্রের গাঢ় আকাশের উপর এক ছায়াপথের মত। পার্থক্যের মধ্যে উপর হতে নিচের দিকে গতি তার, যেন স্বর্গ থেকে মর্ত্তের পানে নেমে এসেছেন।

মন্দিরের গাঢ় তমসার মধ্যে কেদারনাথের প্রস্তরময় সদাশিব মূর্ত্তি আমার মধ্যে প্রকাশিত হননি, মন্দিরের বাহিরেই ঐ পিছনের দৃশ্য পটভূমি উপলক্ষে আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিলেন তাই সেইটিই প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

আমরা সেদিন বড় কম যাত্রী ছিলাম না সেখানে। তারমধ্যে কেউ কেবল শীতে কেঁপেছেন আর বহিঃপ্রকৃতিকে গাল পেড়েছেন, ক'একজন অনুতাপ ভোগ করছেন, কেন এত কষ্ট করে, এখানে কি দেখতেই বা আসা এই বোলে। এখানে বরফ আর পাষাণ স্তুপ দেখতে কেন মরতে এলাম শরীর পাত করতে। স্পষ্টই একথা বলতে শুনেছি। আবার মন্দিরের অন্ধকারে কেউ কেউ শীতের জড়িমায় কাতর ছিলেন, কিছু দেখবার মত মনের বা শরীরের অনুভব শক্তি ছিলনা তো সুতরাং তাদের কথায় কাজ নেই। আরও একশ্রেণীর যাত্রী ছিলেন যাঁরা সঙ্গী অথবা আশ্রিত নিজ নিজ আত্মীয়া স্বজনের তত্ত্বাবধানেই সকল সময়ই ব্যস্ত ছিলেন, বিশেষতঃ তাদের মধ্যে বিপন্ন যারা তাদের মুখাপেক্ষিতার জন্য অশান্তি; এতদূর এসেও কিছু অনুভব করা সম্ভব ছিলনা; কোনরকমে এক রাত্রি কাটিয়েই পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছেন কারণ ঘরে ফিরে যাবার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা তাদের এখানে থাকতে বা এখানকার বিষয় ভাবতে দিচ্চে না। বাকি যাঁরা, আর একরকম,—তারা এতটা কঠিন পথ কতক কষ্টে কতক আনন্দে অতিক্রম করে এখানে এসেছেন, তারা যেন তাঁদের কাম্য নিকেতনেই এসে পৌঁছে গিয়েছেন, চুপচাপ এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যা কিছু দেখবার দেখেছেন, শুনছেন আর অনুভব করচেন।

এরমধ্যে ষাট বৎসরের বৃদ্ধা দেখেছি, কি অসাধারণ তিতিক্ষা তাদের। নিত্য নিয়মিত

কোন কর্ম্মের ব্যতিক্রম তো দেখিনি। কেদার নাট্যমন্দিরে আসন পেতে এক কোণে বসে জপে দীর্ঘকাল কাটাতেও দেখেছি। কাজেই এক্ষেত্রে বহু যাত্রীর বহু অনুভব, মুখে তাদের তিলমাত্র উচ্ছ্বাস বচন, বা কাতর বিপন্নদের উপর সহানুভূতির অভাবও দেখিনি। মমতাভরা নারী হৃদয়টি তাঁদের সঙ্গেই ছিল, আর ছিল বিশ্বনাথের উপর প্রবল আকর্ষণ। আমাদের বাঙ্গালী বৃদ্ধার মতো অন্যান্য মহারাষ্ট্রী, পাঞ্জাবী অথবা পশ্চিমাঞ্চলের বৃদ্ধা যাত্রীও ছিল, কেবল বৃদ্ধ খুবই কম। বৃদ্ধা যাত্রী যদি পঁচিশ জন দেখে থাকি তাহলে বৃদ্ধ মাত্র ছজন হয়ত পথে বা তীর্থস্থানে দেখেছি।

যাই হোক কেদারনাথের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করে যাত্রা সার্থক হবার পর কয়েকজন বললেন আমাদের সঙ্গেই যাবেন। অসুস্থ শরীর মন নিয়ে, তাঁরা বদরীকাশ্রমে আর যাবেন না, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই হরিদ্বার ফিরে যাবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন; আজ তখন আমরা কেদারনাথের মন্দির প্রাঙ্গনেই ছিলাম।

এখানে এক তপোবন আছে এই কেদার মন্দির থেকে কতক দক্ষিণ-পূর্ব্বে কোণে নীচের দিকে। এখানে যেসব যাত্রী প্রথম মুখেই আসে তারা বরফ পায় বেশী, শীত ও পায় বেশী। আমাদের এইখানে আষাঢ়ের প্রায় শেষ হয়েছে, কাজেই এসময়ে অনেক বরফ গলে ছিল এবং সেই কারণেই মন্দাকিনী ও অন্যান্য ধারাগুলি এতই প্রবল হয়েছিল যে সেই জলোচ্ছ্বাসে ইচ্ছা সত্ত্বেও কেউ মন্দাকিনীতে স্নান করতে পারেনি। কিন্তু এতটা শীতের মাঝেও যাত্রীদের নড়াচড়া বড় কম হয়নি। আমি যে পূর্ণ তিনটি দিন এখানে ছিলাম, প্রথম দিনে দেখলাম প্রায় দ্বিগুণ লোকের আসা, দ্বিতীয় দিনেও অনেক এলো, এমনকি ভীড় হয়ে গেল পথে লোকের গায়ে গায়ে ঘেঁসে যাতায়াত, আর মন্দিরে,—যে মন্দিরে সবসুদ্ধ পঁচিশ ত্রিশ জনের বেশী লোক হয়নি দ্বিতীয় দিনে আর প্রবেশ পথ রইলো না। আমি মন্দিরে প্রবেশ করতাম না, ঐ প্রথমেই একবার দেখতে একটী কৌতুহল নিয়েই ঢুকেছিলাম; ভীড় মোটেই ছিলনা, যা যা দেখবার বেশ সুশৃঙ্খলায় দেখে নিয়েছিলাম। আর ঢুকিনি,—শেষদিনেও না। সে যে কি বিশ্রী, বিশৃঙ্খলা পূর্ণ এবং অশান্তিকর ব্যাপার আর কি বলবো।

অবশ্য প্রত্যহ যেমন যাত্রীরা আসছিল, যদিও ঠিক হিসাব রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবুও,এটা বলা যায় সেদিন প্রস্থানও বড় কম যাত্রী করেনি অন্ততঃ অর্দ্ধেক তো হবেই। বিশেষতঃ যখন পাণ্ডারা যাত্রীদের থাকতে উৎসাহ মোটেই দেয়নি বরং তাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেই উত্তেজিত করছিল মহামারী, রোগ প্রভৃতি নানা ভয় দেখিয়ে। সকল দিকেই কষ্ট ছিল, বিশেষ কাঠ, জল আর দুধ—এই তিনটির বড় কঠিন মূল্য। মন্দিরে যাত্রীদের কথা বলছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতেই ভয়ানক লাগে, কিভাবে যাত্রী নর নারীদের টানাহাঁচড়া করে ঢোকানো আর বার করা হচ্ছিল।

বড় লোক একদল পাঁচ ছয়টি যুবতী, প্রৌঢ়া ও পুরুষ একজনকে ঢোকানো হোলো পাশদিকে এক ছোট গুপ্ত দরজা দিয়ে। এতটা শীত বাইরে, ভিতর থেকে নরনারী আসছে তাদের কপালে ঘাম। কোথায় লাগে আমাদের কলকাতায় কালীঘাটের মহাষ্টমীর ভীড়। অথচ, কেদার মন্দিরের আয়তন কালী মন্দিরের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। নাট মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েই দিচ্চি যদিও প্রবেশদ্বার ঐ নাটমন্দির দিয়েই যা কালীঘাটের সঙ্গে সম্পর্কে বিপরীত যেহেতু, কালীমন্দিরে তো নাটমন্দির দিয়ে ঢুকতে হয় না, বরং তাকে একটা পৃথক হল, বলা যায়, যদিও ঐখানে, সামনে একটা স্থান দিয়ে অনেকে মায়ের মূর্ত্তি ফাঁক তালে দেখে নেবার চেষ্টায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাই হোক আজকার দিনের কথা তো আর বলবার নয়। বৃষ্টি পড়লো, তুষারপাত হোলো, যাত্রী সংখ্যা সেই গা ঘেঁষেই গিয়েছে দেবতার স্থান দেখতে,—আর সেই পাষাণের উপর হাত বুলোতে। অন্য কোথাও শিব লিঙ্গ, কাশী প্রভৃতি স্থানে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব,পশ্চিমে, সর্ব্বত্রই গর্ভগৃহে বা রত্ন বেদির উপরস্থ যাত্রীদের কাকেও দেবতাকে অর্থাৎ বিগ্রহ স্পর্শ করতে দেয়না, এখানে বিপরীত। সবাই হাত দিয়ে স্পর্শানুভব করে তবে শান্তি পায়। যারা হাত দেয়না বা সঙ্কোচ বশতঃ হাত বাড়ায় না পাণ্ডারা উৎসাহ দেয়, পরশ করলেও, এতনা দূরসে আয়া, দেওতাকো হাত না পৌছাওগে তে পুণ্য করগে কৈসে। তাই দেখলাম এখানকার উদার ভাব দেখে অনেকেই আপত্তিও করেছে ;—আমাদের এক বাঙ্গালী, বৃদ্ধ নয় বেশ শক্ত সমর্থ প্রৌঢ়, তিনি দস্তুরমত উঁচু গলায় প্রতিবাদ করলেন, দেবতার অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার নেই কারো।

বৃষ্টি ও তুষারপাত হলেই মন্দিরের সামনে ঐ ঢালু জমি প্রাঙ্গনটি সাদা হয়ে যায়। এমনই পিচ্ছিল হয় জুতা পায়ে তো যাওয়াই যায়না, খালি পায়ে যেতেও অনেকে পড়ে যায়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ দল এখানে এসে পড়লে কিছুতেই দমে না, যেমন করেই হোক দর্শন-স্পর্শন করা চাইই। বৃষ্টি থামলো, তুষার স্তুপাকার হয়ে আছে সারা প্রাঙ্গনে, মন্দিরের পোস্তা একেবারে ধবল হয়ে গিয়েছিল ;—যাত্রীর উঠানামার বিরাম নেই সকালে বেলা এগারোটা আর রাত্রে সন্ধ্যার পর নটা পর্য্যন্ত। মধ্যে যতটা সময় বন্ধ থাকে, তার মধ্যেও যদি একবার দিনমণিকে দেখা যায় তাহলে প্রাঙ্গন একেবারেই জমজমাট হয়ে পড়বে। কি অপূর্ব্ব ঐ কোলাহল।

দ্বিতীয় দিন সকালে, আকাশে ততোটা মেঘ আর বৃষ্টিও ছিল না, জোর বাতাসও ছিল না,—পূজার্চ্চনার পর আমরা কেদার মন্দিরের পিছনে ঐ ঢালু পর্ব্বত ভূমির উপর ওঠে কতকটা ঘুরে ফিরে দেখতে গেলাম। অনেকটাই গিয়েছিলাম। সঙ্গে যে ব্যক্তি গাইড হয়ে আগে আগে যাচ্ছিলেন তিনি ফেরবার মুখে বললেন, আর একটু গেলেই ভৈরব ঝাঁপা দেখা যাবে। কি অপরূপ বস্তু দেখবো ভেবে আমরা সবাই উৎসুক হলাম, তিনি

আরও খানিক চলে একজায়গায় নিয়ে গেলেন, যেখানে ঢালু তুষার স্তর হঠাৎ নেমে গিয়েছে কতদূর, অনেকটা গভীর খড, নীচে অন্ধকার পাতালে নিয়ে যায় বা কে জানে। তিনি বললেন এইটি ভৈরব ঝম্প। কোন ভৈরব এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করতে এসে ছিলেন পরে তুষারের এই ঢালু ক্ষেত্র দিয়ে একেবারে হড়কে গিয়ে পড়লেন ঐ গভীর খডের অন্ধকার পাতালে, এইভাবে প্রাণত্যাগের ফলে শিবলোক প্রাপ্ত হোলো। এখন সরকারী হুকুমে ওসব একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৈকালে আমরা ঐদিনেই ভৈরব পর্ব্বতের উপর ভৈরবের বৈভব দর্শনে গিয়েছিলাম। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা,কেদারনাথের মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বদিকে একটি চিরতুষারাবৃত শাদা ঘর দেখা যায়, তার উপর পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গেই তুষার লিপ্ত। শুধু উপরেই খানিক অল্প অল্প তুষার পড়েছে তা নয়—বেশ স্থূল, শক্ত আবরণ; আমরা লাঠির খোঁচা দিয়েও তার তলে পাথরে লাঠির নীচের লোহা ঠেকাতে পারিনি। চারজন ছিলাম, তার মধ্যে একজন খলিফা, লোকটি পায়ের তলায় একটা মোটা চামড়া নয়, গাছের ছাল জাতীয় কিছু, তার উপর ফিতে দিয়ে পায়ের সঙ্গে বাঁধা, ঐ ভাবে গিয়েছিল। সেই লোকটাই আমাদের সবার চেয়ে ভাল ভাবে চড়াই উৎরাই করতে পেরেছিল। যে সহজেই চড়ে ভৈরব দর্শন করতে পারবে ভৈরব তারই প্রতি সদয় হবেন। কি চমৎকার প্রতিজ্ঞা বা হেঁয়ালী,—অবশ্য একথা আমাদের গাইড যিনি তাঁরই উদ্ভাবনা, বোধ হয় তিনি একটু রঙ্গ দেখতে চেয়েছিলেন। সত্য হোক বা মিথ্যাই হোক কেউ সহজে উঠতেই পারেনি সুতরাং শিবের কৃপা পেলাম না. এ অনুযোগের পথ রইল না একলা আমার।

আসলে এই ভৈরব পর্ব্বতের ঐতিহ্য এইটুকু পাওয়া গেল যে এক সময়ে এক ভৈরব সাধক এসে ঐ পর্ব্বতের উপর মনোমত একটি স্থানে, যেখানে কেউ গিয়ে ত্যক্ত বিরক্ত না করে, ভৈরবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে যান। তারপর তাঁর দেহত্যাগ হলে স্থানটির একপাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেই অবধি যাত্রীদের তীর্থস্থানের অংশ হয়েই আছে।

শ্রীশ্রীকেদারের ধাম শুধু পথের জন্যই কঠিন নয়;—তীর্থের কিছু কাঠিন্যও আছে। এই ক্ষেত্রের যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে কঠিন রুক্ষ পাষাণ ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। কমলিবালার ধর্ম্মশালা ছাড়া আরও ধর্ম্মশালা একটি তখন ছিল, তা ছাড়া রাওয়াল সাহেবের কুটি, তাঁর নিজ স্থানের ঐ নিকটেই একটু অবস্থাপন্ন, অর্থব্যয় সক্ষম যাত্রিদের রাওয়াল সাহেব নিজ তত্ত্বাবধানে সেই বড় কোঠিতেও স্থান দিয়ে আপ্যায়িত করেন।

এখানে হাটের মত একটা আছে, তাকে বাজারও বলা যায়। যাত্রীদের সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা পাওয়া যায়। শুনলাম প্রায় এক মাস কাল হল মন্দির খোলা হয়েছে, সুতরাং যাত্রীদের ব্যবস্থামূলক যা কিছু সে সকলও সংগ্রহ

হয়েছে। চোগা-চাপকান, কানটোপ মাথায়, পূজারীর সহকারী, যাঁরা মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের সিঙারাদিতে সাহায্য করেন, ভোগ রান্না প্রভৃতি যা কিছু তাদেরও কাজ বড় হালকা মনে হলনা। পাণ্ডা যারা, তারা পৃথক শ্রেণীর, তারা যাত্রীদের কাছ থেকে যা পায় তার সঙ্গে পূজারী পাণ্ডাদের কোন সম্বন্ধই নাই, পূজারীরা পৃথক ভাবে উপার্জ্জন করেন, সচন্দন শুকনো ফুল বিল্বপত্রাদি যাত্রীদের মাথায় ঠেকিয়ে, হাতে দিয়ে তারপর এক চামচ করে চরণামৃত পান করিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ।

মন্দিরে প্রবেশের পর যাত্রীরা পূজারীদের অধিকৃত জীব হয়ে যান। বিগ্রহের কাছে যাবার, স্পর্শ করে নারিকেল প্রভৃতি পূজা দ্রব্য চড়াবার, তারপর বিশেষ ভোগ দেবার অধিকার সংগ্রহের পৃথক পৃথক মূল্য বা ফি আছে। আরতির সঙ্গে বিশেষ কিছু উপযোগের জন্যও পৃথক দেয় পরিমিত অর্থ যা কিছু যাত্রীরা ভেট দান করেন তা রাওয়াল সাহেবের গদিতে জমা দিয়ে সেখান থেকে পারমিশন স্লিপ পেতে হয়। সেটা হোলো অধিকার। দেবতার পূজা অর্চ্চন, ভোগ, সেবা, প্রভৃতি বিষয়ে এমন কি মন্দিরের ভৈরব, কেদার নাথ লিঙ্গসম্পর্কে সকল কিছুই সুচিন্তিত ব্যবসায় নীতিতেই চলে।

সন্ধ্যা হোলো, অমনি যাত্রীদের, কাল কখন যাওয়া হবে এই পরামর্শ সভা বসে যায় যাত্রীদের নিজ নিজ স্থানে। যদিও আমি কোন পাণ্ডার অধিকারে যাইনি তবুও এক পাণ্ডা যখন শুনলে ত্রিরাত্র এখানে বাস করবো,—সে বলে কি, কেন শুধু শুধু এখানে আবার এতটা সময় কাটানো, মিছে মিছে এত খরচপত্র করে থাকা, আরও আরও কত দেখবার, যাবার স্থান রয়েছে। বিশেষতঃ যারা এখান থেকে ফিরে ঘরে যাবে তাদের তো নিস্তার নেই। এই তীর্থ তো হোলো এখন সুফল নিয়ে কালই সকাল সকাল বেড়িয়ে যাওয়াই ভালো। খুব শীঘ্রই আমরা পৌছে দেবো। এইভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। যারা ঘরে ফিরবে তাদের অবশ্য এদের কথার প্রভাব অনেক কাজ করে। আমাদের মত যাত্রীরা তাদের কথা বড় গ্রাহ্য করে না। আমার বিশ্বাস যারা এখানে থাকবে ত্রিরাত্রি তারা ঠিকই থাকবে—কারো প্রতিবাদ মানবে না। এখানে একমাত্র শীত, এইটিই যথার্থই বাধা; আমরা কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী, শীতের সময়েও পুর্ণ শীতের প্রকোপ ভোগ করিনা। কলকাতায় দেখেছি অনেক বড়, মেজো, সেজো, তাদের দেখাদেখি আমাদের মত ছোট ঘরের যুবা পুরুষও প্রবল পৌষ মাসের শীতে আধিহ্যর পাঞ্জাবী পরে বেরিয়েছে গায়ে একখানা র‍্যাপার বা শাল জাতীয় গায়ের কাপড় পর্য্যন্ত নাই। এখানে একটা কথা মনে হোলো, একটি প্রকাণ্ড মুস-লিগ দলপতির স্ত্রী হিন্দু, তিনি কাশ্মীরে গিয়ে শীতের সময়, জর্জেট সাড়ি পড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন পথে পথে, ঘোড়ার উপর তাকে সারাদিন রাজপথে চলাফেরা করতে অনেকেই দেখেছে। এ একরকম জীব আছে, শীতকে অস্বীকার করাতেই তাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

বাঙ্গালীদের মধ্যে এক যুবা, আর প্রৌঢ় বয়স্ক দুজন সন্ন্যাসীকে ক্রমান্বয়ে তিনটি দিন ঐ সদ্য গলিত তুষার স্রোত মন্দাকিনী গর্ভে স্নান করতে দেখেছি। হিন্দুস্থানী সাধুরা তো সহজেই নিত্য স্নান করে ঐ জলধারায়। ঐ তুষার জলে কোন প্রকারে একবার গা ডুবালেই আর শীত থাকে না, শরীরময় বিদ্যুতের কাঁপুনী ; তার সুদ্ধ সরল ভাষা হোলো তড়িৎ প্রবাহ, চলতে থাকে। দ্বিতীয় বারে শরীর যেন অসাড় হয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় বারে, বললে পেত্যায় যাবেন কি আপনারা, শরীরে আগুণ ছুটতে থাকে। যেমন অনুভব করেছি ঠিক ঠিক সেইরকমই খবর দিলাম তারপর পাঠকের ইচ্ছা হয় যদি, এসে, অবশ্য একটুক কষ্ট স্বীকার করেই আসতে হবে, এখানে এই আষাঢ় মাসের চতুর্থ সপ্তাহে একবার স্বর্গের ধারা এই মন্দাকিনীর জলে নেমে দেখুন আমি সত্য বলেছি কিনা। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি দেবো, তা জানিনা। তবে যদি শরীরে অসুখ থাকে, একটু একটু ঠাণ্ডা ভাব বা শর্দ্দি কাশী,—কিম্বা জর ভাব তাহলে তপ্তকুণ্ডে স্নান করে যান, তিনটি দিন এখানকার কিম্বা গৌরীকুণ্ডের তপ্ত কুণ্ডে স্নানের পর যদি আপনার শরীরে কোন রোগ বা অশান্তির লেশ থাকে তাহলে আমায় যদৃচ্ছা অপমান সূচক কথা, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি যা খুসী বলুন আমি স্বীকার করে নেবো।

এদিকে ধনবান নাহলেও মানে জ্ঞানে রাওয়াল সবার বড় কারণ কেদারনাথের পূজার ভার তারই। এখানকার রাওয়াল সাহেবের কোঠির নিকটেই একজন সাধু থাকতেন,—তার সঙ্গে আমার দেখাশুনা হয়ে তো ছিলই একটু ঘনিষ্টতাও হয়েছিল। তিনি হৃষীকেশ থেকেই প্রত্যেক বৎসর সর্ব্ব প্রথমেই আসেন আর যতদিন এমন্দির খোলা থাকে ততদিনই থাকেন এখানে, তারপর দীপান্বিতা চতুর্দ্দশীতে মন্দির বন্ধ হয় এবং রাওয়াল সাহেব ও মন্দির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পূজারী প্রভৃতি এখানকার মহামূল্য জিনিষ পত্রনিয়ে যখন উখীমঠে যাত্রা করেন তখন তিনিও তাদের সঙ্গে নেমে আসেন হৃষীকেশে। এই ছয়মাস তীর্থবাসেই কাটে তাঁর। বলা বাহুল্য এখবর পাবার পর আমি তার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতে বেশী বিলম্ব করিনি।

একখানি খাটিয়াতে অতি পরিষ্কার গৈরিক রংয়ের তোষক, তাকিয়া, চাদর, বালিশ, তোয়ালে এমন কি লেপের খোলটা পর্য্যন্ত রেশমি বস্ত্র হলেও রং তার গৈরীক, উপরে একখানি পাতলা তোষক তার উপর একখানি কালসার মৃগচর্ম্ম পাতা, মোটা গদির উপর বসে আছেন একখানা রেশমের র‍্যাজাই গায়ে জড়িয়ে। তার ব্যক্তিত্ব কিছু আছে বোলে বোধ হলনা। লম্বা রোগা শরীর, শ্যামবর্ণ, কয়েক দিন আগের মুণ্ডিত মাথা। এঁদের নিয়ম, মাসে এক কিম্বা প্রতি পক্ষে একবার মুণ্ডন করেন, কারণ এঁরা দণ্ডী। এখানে দেখি আর এক বিচিত্র ব্যাপার, ঘরময় হেনা আতরের গন্ধভুর ভুর করচে। আমি যখন গেলাম দেখি আর একজন হিন্দুস্থানী, লালা গোছের মানুষ তাঁর কাছে জোড় হাতে

বসে আছেন। তার সঙ্গে আগেই কথা চলছিল,—শুনলাম, দণ্ডীস্বামী বলছেন,—সাকসাৎ ভগবান নেইয়ে বাৎ, যব আপনে মুখ্‌সে নিকালা, ইসিমে ঔর সকা ক্যা হো সাকতা ?

জি হাঁ, মহারাজ !—বেসক্। তারপর, আচ্ছা মহারাজ ! ফির কাল তো মইনে আনেবালা, বোলে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করলে পথের দিকে। কিন্তু যাবার সময় জোড়া আধুলি তাঁর চরণের উদ্দেশে বিছানার উপর রেখে গেল। এখানে যারা থাকে সাধু সন্ত—তাঁরা গৃহী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করেন ;—এটা এই উত্তর হিমালয়ের কঠিন তীর্থাঞ্চলগুলির নিয়ম। যেমন এখানকার পাণ্ডা, ছড়িদার, পূজারী, রাওয়াল, এদের একটা পাওনা বা দাবী,—বোর্ডে ছাপাকাগজের রেট অনুসারে দেবার নিয়ম। সাধুদের ও তেমনি একটা পাওনা থাকে, সেটা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানের কথা। যাক সে কথা—আমি যাঁর কাছে এসেছি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বসেছিলাম। তিনিই প্রথমে সম্ভাষণ করলেন,—উত্তরে, আমি তাঁর কাছে কিছু সৎকথা শ্রবণ করতেই এসেছি এই কথাই জানালাম।

তারপর, কিছু প্রশ্ন আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করলেন। তখন, যেটা মনের মধ্যে কোলাহল তুলেছিল, ত্যাগী সন্ন্যাসীর আতর গোলাপ ব্যবহার কেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করলেন না, বললেন,—এটা এমন কি দোষনীয় ব্যাপার ?—শরীর ছাড়া যখন আর কোন বিষয় নেই, অন্য বন্ধনও নেই। তিনি বললেন যে, আমরা ত্যাগী, বিষয় ত্যাগ করেছি, কোন ও বিষয়ে আশক্তি নেই,—মনের ক্ষেত্র পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এই শরীর মাত্র অবলম্বন করে আছি। কেন ?—প্রারব্ধ ক্ষয় করতে। অপর কোন কর্ম্মই নেই,—অর্থাৎ মনের সংকল্প বিকল্প চলে গিয়েছে। এমন কোন কর্ম্ম আর উৎপন্নই হবেনা যাতে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় বা ফলভোগের জন্য আবার জন্ম বা কর্ম্ম চলতে থাকে। এখন এই শরীরটুকুর সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা আছে, তাতে কোন প্রত্যবায়ই নেই। শরীর রক্ষার জন্য যা কিছু খাওয়া পরা এবং ব্যবহার তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এই সুগন্ধ মনে পবিত্রতা আনে, অথচ কোন প্রত্যবায় নেই, কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য, শরীর রক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট আহার, পরিমিত ব্যবহার, শীত গ্রীষ্ম থেকে শরীর রক্ষা করবার স্বাধীনতা সবারই আছে। তুমি যখন গন্ধের কথা বোলেছ তখন আরও একটু কথা জেনে রাখো ;—ঋতু পরিবর্ত্তন যখন হয়, যখন গরম থেকে শীতের মধ্যে আসা গেল যেমন আমরা এখন এখানে গরম দেশ থেকে এসেছি শীতের মধ্যে রয়েছি, কতকগুলি গন্ধ আছে যাতে শরীর গরম থাকে। যেমন এই হেনা আতর যা আমি ব্যবহার করি ;—এই হেনা আতর শীতে ভারী উপযোগী,—ব্যবহারে শরীর বেশ গরম থাকে। আবার গরমের সময়ে চন্দন অথবা খস্ আতর ব্যবহার করে

দেখো বেশ ঠাণ্ডা রাখে শরীর। গন্ধের প্রভাবও কম নয় আমাদের শরীরে। তুমি ব্যবহার করে দেখো কি সুন্দর ক্রিয়া আমাদের শরীরের উপর।

এই বোলে তিনি, অতি সুন্দর আতরের বাক্স একটি বার করলেন। ছোট কাঠের বাক্স হাতির দাঁতের কাজ, কি সুন্দর কাশ্মীরের তৈরী ঐ আবলুস কাঠের বাক্সটি। তার ভিতর থেকে একটি কাটগ্লাসের শিশি বার করলেন, তাতে রক্তবর্ণ পদার্থ। একটা কাঠির ডগায় তুলা জড়িয়ে ফায়া তৈরী করে আলতো একটু স্পর্শ করে তুলাটি আমার কানে গুজে, আঙ্গুলটি আমার কপালে রগের দুপাশে ঘসে দিয়ে আমায় কনভার্ট করে ছেড়ে দিলেন। সত্যই পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই আমার শরীর গরম হয়ে উঠলো আমি প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় তিনি এই কথাগুলি বললেন,—

মনে রেখো দুনিয়ায় যা কিছু উৎকৃষ্ট ভোগ আছে তাই আমরা দেবতাকে উৎসর্গ করি। আমরা তার প্রসাদ গ্রহণ করি, সে ভোগ পবিত্র। যাতে করে মনের অধোগতি না হয়, কারো স্বার্থে আঘাত না লাগে, এমন ভোগ যা কিছু আছে সব করে যাও;—কোন অন্যায় হবে না। আতর তো মোটা জিনিষ গন্ধের স্বাত্তিক ভোগ হোলো ফুল, ফুলকে কখনও অনাদর কোরোনা। যখন যে ঋতু তখন সেই ঋতুর ফুল রাখবে, ফুলের তুল্য স্বাত্বিক ভোগ আর নেই।

তৃতীয় দিনে আমাদের মধ্যে যারা কাল বদরীকাশ্রমে যাবেন, তারা যখন কেদার মন্দিরের প্রশস্ত চত্তরের উপর কলরব করছিলেন কারণ তখন এগারোটা কি বারোটা বেলায় সূর্য্য নারায়ণ দর্শন দিয়েছিলেন। যদিও রৌদ্র প্রখর নয় তবুও তার মধ্যে একটু এমনই তাপ ছিল যাতে হিম-কুয়াসাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে সবারই প্রাণে একটা সহজ আনন্দ এনে দিল,—সবাই যেন অমৃতের আস্বাদন পেয়ে আনন্দে একটু মেতে গিয়েছিল। দিনকরের আবির্ভাব সার্থক করে হাসি ফুটেছিল সবার মুখে। আলোর অমৃত-পরশে যেন ঠাণ্ডা মনের অন্ধকার নিমেষেই কোথায় মিলিয়ে গেল। এটা কল্পনা নয় এ সত্য প্রত্যেকেই তখন অনুভব করলে। বিশেষতঃ রোগা শরীর সন্ন্যাসীবেশে এক গৈরীকধারী; তাঁর স্থুল কম্বলখানি পর্য্যন্ত গৈরীক, গৌরবর্ণ, প্রৌঢ়—মূর্ত্তি, মনে হোলো তাঁর মনেও আলো-তাপের ছোঁয়াচ কম লাগেনি। তিনি পাশেই কয়েকজনকে উদ্দেশ করে এমন সুন্দর কয়েকটি কথা বোললেন শুনে বড় আশ্চর্য্য লাগলো।

প্রথমটা হয়েছিল মহাপ্রস্থানের পথের কথা। এই যাত্রীদের একজন বদরীকাশ্রমের পথেই যুধিষ্ঠির মহারাজ মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন এই কথা বলছিলেন। যাঁরা কথা কইছিলেন তাঁরা বেশ শ্রীমান, মনে হোলো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল না হয় পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ হবেন,—তাঁদের কাপড়-চোপড়, শীতবস্ত্রাদি সবই আমাদের তুলনায় খুব দামী যাকে মুল্যবান বলে তাই। এই সন্ন্যাসী, সম্ভবতঃ শুনেছিলেন তাদের কথাবার্ত্তা—তাই

যখন বক্তা থামলো তখন তিনি বললেন, নহি নহি জি, বো বাৎ ঠিক নহি। বোলে কি সুন্দর প্রসন্নমুখে বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর কথা। তিনি বললেন,—এই কেদারনাথের মন্দিরের পিছনে ঐ পর্ব্বতের উপর দিয়ে একটি সরল পথ চলে গিয়েছে বরাবর ঐ তুষার পর্ব্বতের পাশে পাশে; প্রায় পাঁচ ক্রোশের পর ঐ পথ দুভাগ হয়ে গিয়েছে। বাঁদিকের পথটি গিরিসঙ্কটের মধ্যে গিয়েছে, আর ডানদিকের পথটিই মহাপ্রস্থানের পথ, তুষার-রাজ্যের মধ্যে—সে পথে গেলে আর কেউ ফিরে আসেনা—তাই ঐ নাম মহাপ্রস্থানের পথ। ঐ পথেই মহারাজ দ্রৌপদীও ভাইদের সঙ্গে সোজা গিয়েছিলেন। তবে বদরীকাশ্রম দিয়েও ঐ পথে যাওয়া যায়,—ঐ অঞ্চল থেকে যাঁরা যাবেন তাঁদের পক্ষে ওপথে যাওয়া কিছু সহজ হতে পারে। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর রাজধানী থেকে যে পথ দিয়ে যেখানে যেখানে বিশ্রাম নিতে নিতে চলেছিলেন তাতে এই কেদার দিয়েই তো তাদের যাবার সহজ পথ।

তাঁর কথা শুনে কেউ প্রতিবাদ করতে পারলেনা বরং সবাই সশ্রদ্ধভাবেই মেনে নিলে দেখলাম। তাঁর কথার মধ্যে এমনই এক সংযমের তেজ ছিল যা কোন রকমেই উড়িয়ে দেওয়া চলেনা। তাছাড়া তাঁর মধ্যে একটি প্রীতি, মানুষের উপর ভালবাসা বিশেষতঃ যারা ঐখানে এই রৌদ্র উপভোগের অবকাশে কলরব আরম্ভ করেছিল তাদের প্রতি এমনই স্নেহ পরবশ হয়েই কথাগুলি বলেছিলেন।

তারপর সরল হিন্দিতেই বোললেন,—এই যে কেদারনাথ ধাম,—এখান থেকে যারা শ্রীশ্রীবদরীনাথ যাবে, প্রায় একশো মিল ঘুরে যেতে হবে তাদের। কিন্তু পূর্ব্বকাল হোতেই এখান থেকে সোজা পূর্ব্ব-উত্তর কোণাকুণি, পূর্ব্বদিকে শেষ একটা পথ আজ এখনও আছে। সে পথ—বারো তেরো ক্রোশ মোটে, একদিনের পথটা ছাব্বিশ মাইল হবে। এখান থেকে তারা ভোর বেলা সোজা যাত্রা করে বদরীনারায়ণে পৌছে যেতেন ঐদিনেই সন্ধ্যায়। যখন আচার্য্য শঙ্কর এখানে আসেন, এবং মন্দির স্থাপন করেন তখনও ঐ পথে এসেছিলেন। তারপরও বরাবরই আসতেন, শেষে যখন দেহত্যাগ করেন, তখনও বদরীবিশাল থেকে ঐপথে আসেন। সে পথ এমন কিছু কঠিন নয় কেবল অনেকটাই তুষার-রাজ্য অতিক্রম করে আর চড়াই উৎরাই সারা পথটা, তারই মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। যোগী ঋষী যারা তারা এখনও ঐপথেই যাওয়া-আসা করেন।

শ্রোতাদের একজন,—বোধ হয় পাঞ্জাবী বললে,—আপনি নিশ্চয়ই ঐ পথ জানেন, ঐ পথেই আপনি এসেছেন। শুনে তিনি মৃদু হেসে বললেন, হো সাকতা। দুই তিন জোয়ান প্রৌঢ়, বেশ দৃঢ় শরীর একটু এগিয়ে এসে, ধরে বসলো তাঁকে, বাবা, আপতো পরমহংস যোগীরাজ হোগা, কৃপা কর হামলোক কে বাৎলানা, মুঝে কোসিস তো কঁরু।

তিনি বললেন, একটু হেসে, ইয়ে দেখো, ইয়ে কভি হো সাকতা? তুমলোক বো সহজ

রাস্তে মে যব এতনা তকলিফ উঠাতে, তবিয়ৎ সুস্থ হো যাতে, কোই কোইকো ভি লৌটনেকো তাকৃত্ নহি রহতি, বো বরকান মে কিস্তরে যাওগে, হামারে সমঝমে নহি আতি। যাও আপনা কাম করো দেখো, লোটো-ফিরো, তীরথ কা মাহাত্ম্য হজম করো, ফির আপনা স্থান মে চলো। জয় কেদার নাথকি। এই মাত্র বোলে তিনি হাসতে হাসতে মন্দিরে উঠবার সোপানের উপর উঠিতে লাগলেন। যত উচু উচু ধাপ, প্রত্যেকটা এক ফুটের কম হবে না। টপ্ টপ্ করে সেই সিঁড়িগুলি উঠে, শেষ ধাপে আমাদের দিকে একবার মৃদু হেসে দ্বারপথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন মনে হোলো। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম, তাঁকে বাইরে আসতে দেখিনি।

কেদারনাথের কঠিন তীর্থ সুফল করে, প্রধান পাণ্ডার শ্রীচরণে গঙ্গাজল বিল্বপত্র চন্দনাদি দিয়ে কিছু রজত মুদ্রা রেখে গড় করে তবে তীর্থের সুফল পাওয়া যায়,—এটা নাকি সনাতন নিয়ম। আমার পক্ষেও বালাই না থাকলেও বাকী সকল নর নারীর এই তীর্থের সুফলের দুর্ভোগ আছেই তার পর নিষ্কৃতি;—তখন অন্য তীর্থের পাণ্ডার অধিকারে গিয়ে পড়লো ভাগ্যবান যাত্রীগণ।

চতুর্থ দিনে জেঠামশাই বড়ই প্রসন্নমনে মোটঘাট নিয়েতো নারায়ণ স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লেন। আমি একটু পরে যাচ্চি, বোলে একবার সাধু বাবার কাছে বিদায় নিতে গেলাম। বড়ই প্রসন্ন মূর্ত্তি। প্রণাম করে যাত্রার কথা নিবেদন করলাম।

তিনি আবার আমায় আতর দিয়ে আহ্বান করলেন। পরশু দিন যে আতর মাখিয়েছিলেন তাঁর গন্ধ আজও আছে। বাসায় গিয়েছি এখান থেকে, সতীর্থগণ সবাই, আসে পাশে পরিচিত অপরিচিত যাত্রী যারা ছিল, জেঠা ছিল, সবাই তো অবাক, এতো আতরের গন্ধ কেন বা কোথা হতে আমি সংগ্রহ করেছি। আতরের গন্ধ ও চন্দন ধূপের গন্ধ মিলিয়ে কেদার মন্দিরের মধ্যে পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম্মশালার ঘরে এত আতরের গন্ধ নিয়ে খানিক বেশ আলোচনা হয়েছিল সে রাত্রে; যাতে আমায় ঐ ধ্রুবানন্দ স্বামীর আতর মাখার কথা গল্প করতে হ'ল। যাই হোক, স্বামীজি আমায় সস্নেহে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং প্রশ্ন যদি থাকে তো বলতে অধিকার দিলেন। প্রথমে আমায় যা জিজ্ঞাসা করলেন সেকথা বলি,—আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিকার কতদূর তারপর আমার সংসার উপজীবিকা, আত্মীয়-বর্গের বন্ধন কতটা এই সব। আমার শিল্প উপজীবিকা শুনে বললেন, ঐটে খুব ভালো, আহার ওষুধ দুই হবে যদি ব্যবহার করতে পারো।

তিনি গুরুত্বপূর্ণ যে কথাগুলি বললেন, আমি এখানে কেবল সেইটুকু সংক্ষেপে বলে কেদারনাথের পালা শেষ করি। আমাদের এই যে তীর্থ দর্শন, এতে যে শুধু দৃশ্য দর্শনের

কথা, তা একমাত্র কথা নয়, আসল কথা সাধু সঙ্গ। কোন তীর্থে এসে, যে ভাবেই হোক না কেন যদি তোমার আদর্শ অনুসারে কোন উচ্চস্তরের জীবের সঙ্গে দেখাশুনা না হয় তাহলে তীর্থধর্ম্ম হোলোনা। সাধু বাবা যথার্থ অধ্যাত্ম জ্ঞানবান, উচ্চস্তরের মহাপুরুষ-গণের আগমনেই তীর্থক্ষেত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়, আচার্য্য শঙ্কর এই তীর্থ পুতঃ করে গিয়েছেন যখন থেকে, সেই সময় থেকেই যথাকালে সেই মহাত্মাগণ এসে এখানকার সেই তীর্থের ভাবই সঞ্জীবিত রেখেছেন। তাঁরা নিরিবিলি একলা চুপীচুপী এসে তীর্থে প্রাণ সঞ্চার করে যান না, যখন বহু যাত্রীর সমাগম হয় তখনই তাঁরা আসেন, সবার মধ্যেই থাকেন, সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে সবার সঙ্গে মিশে যাত্রীদের প্রচুর আনন্দ দেন। অপরিচিত হলেও পরিচিতের মতই থাকেন, তাঁকে চেনা যায় না কিন্তু ব্যবহারে আপন মনে হয় যেন তিনি আমার কত আপন। তাঁদের এভাবে এসে ভীড়ের মধ্যে থাকলেও কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হয় না। যাঁরা নিরালা খোঁজেন, নিজ স্থানে একাই থাকতে চান, তাঁরা প্রবর্ত্তক, তাঁদের জনসমাগমে ক্ষতি হয়, অপর ভাবের মানুষের সঙ্গে মিশলে তাঁদের ভাব নষ্ট হয়; তাঁরা সিদ্ধ যোগীও নয় মহাপুরুষও নয়। যারা সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁদের কোন বন্ধন নেই, তাঁরা জনসমষ্টির মধ্যে থাকতে পারেন, তাঁদের আবির্ভাবে সাধারণের মধ্যে মহা আনন্দের প্রবাহ চলতে থাকে। তাঁরা ধরা দেন না, সাধারণেতো তাঁদের ধরতেই পারবে না, আমাদের মত যাঁরা তাদের বিষয় অবগত আছেন আমরাও ঠিক ধরতে পারি না। বাইরে থেকে যদি আমরা ধরতে পারি তাঁরা তখনই তা জানতে পারেন, তখনই অন্তর্দ্ধান করেন। কারণ আমাদের ঐভাবে লক্ষ্য করাতে অন্তর্য্যামীত্ব থাকায় তাঁরা বুঝতে পারেন এবং তাতে তাঁর আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে তাই সেখানে আর থাকতে পারেন না। এই তীর্থে অনেক অধিকারীকে তাঁরা কৃপা করেন। বেশভূষা বা রূপ বা মূর্ত্তিতে সাধারণে তাঁদের ধরতে পারেনা। এমনও হয় একজন কোন বিশেষ অধিকারীকে তিনি ধরা দিলেন অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্ব তার কাছে প্রকাশ করে তাকে উন্নত করবার জন্য তাকে টেনে নেন। তখন সে ধন্য হয়। এটা ক্বচিৎ ঘটে।

১২

কেদারনাথ হতে নল—২৩, উখীমঠ—পোথিবাসা—তুঙ্গনাথ—৭॥০

ওখান থেকে ফিরে আমাদের নলচটিতে আসতে হবে, সেখান থেকে উখিমঠ দিয়েই পথ। এ পথের বিবরণ দেবার কোন প্রয়োজন নেই কারণ, মাঝের পড়াও বা চটিগুলি সবই জানা, কেবল চড়াই যেগুলি তা উৎরাই হয়ে গিয়েছে আর উৎরাইয়ের সহজ হাল্কা পথ এখন কঠিন চড়াই হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এই কথাই জানিয়েছে যে এইরকমই

হয়ে থাকে ফেরবার পথে এই হিমালয় রাজ্যে,—এইটুকুই বৈশিষ্ট্য, একথা তিনি বুঝবেন যিনি যাবেন আর ফিরবেন। কাজেই আমরাও তাই বুঝে আবার কেদারনাথ ভৈরবের মায়া কাটিয়ে সাড়ে তিন মাইলের মাথায় রামবরহা ছাড়িয়ে আরও প্রায় চার মাইল এসে গৌরীকুণ্ডে স্নানাহার ও বিশ্রামের পর রামপুর এসে রাত্রযাপন করলাম। ত্রিযুগী নারায়ণকে দক্ষিণে অর্থাৎ পশ্চিম কোণে ছেড়েই এলাম,—কেবলমাত্র একবার ওখানকার কথাগুলি স্মরণ করে নিয়েছিলাম। রাত্রে শুয়ে শুয়ে অপূর্ব্ব ঐ বাঙ্গালী শরীর যোগীর কথাও ভেবেছিলাম।

পরদিন প্রাতে তিনমাইল এসে ফাটায় পৌছনো গেল। সেখান থেকে একটু জলযোগ সেরে নিয়ে আবার চলা। বড়ো রকমের উৎরাই চড়াই করে প্রায় সাতমাইল পথ অতিক্রম করে নলচটিতে এসে এ বেলার মত রইলাম। স্নানাহার এবং বিশ্রামান্তে উখী মঠের পথে পা বাড়ালাম। মাত্র তিন মাইল পথ,—কঠিন, বড় বন্ধুর সবটাই চড়াই, উৎরাইটা খুব কম। তাহলেও সুন্দর, বড়ই মনোরম দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে পথটা, গুরুত্ব পূর্ণও বটে কারণ এটি হল সংযোগ পথ। কেদার হয়ে বদরীতে আসতে, মন্দাকিনী ধারা ছেড়ে, বিরাট একটা মধ্যপথ দিয়ে, বরাবর বদরীকাশ্রমের পথে চামোলীতে, অলকনন্দার ধারায় মিলবার এইটিই এক মাত্র প্রশস্ত পথ। যাই হোক এখন উৎরাই শেষে মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে আবার এক চড়াই আরম্ভ হল। কঠিন সেই চড়াই, অনেকটা উঠে তখন উখী-মঠ গ্রাম বা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নগর পেয়ে গেলাম।

উখীমঠের মাহাত্ম্য আছে। যে রাওয়াল সাহেবকে কেদারনাথে দেখেছিলাম সেই কেদারনাথের শ্রীমান মোহান্ত মহারাজের হেডকোয়াটার অর্থাৎ মূল কর্ম্মকেন্দ্র হল এই উখীমঠ নামক গ্রামখানিতে। কার্ত্তিকের অমাবস্যায় কেদারনাথের মন্দির বন্ধ হলে সবাই এইখানে নেমে আসেন আর পূজা এইখান থেকেই হয়, শীতের সময়। কেদারনাথের নিয়ে কয়েটি প্রাচীন তীর্থ আছে। তারমধ্যে মধ্য হিমালয়ের সেই পাঁচটিই প্রধান; তাদের নাম পঞ্চ কেদার। তারমধ্যে, প্রথম ও প্রধান হোলো ঐ কেদার যেখানে আমরা ঘুরে এলাম, দ্বিতীয় হ'লে মধ্য মহেশ্বর, তৃতীয়টি তুঙ্গনাথ, চতুর্থ রুদ্রনাথ পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর ; এই পাঁচটি অত্যন্ত কঠিন এবং মহিমান্বিত তীর্থ। শুনেছিলাম এই যে পাঁচটি শিবের স্থান, এর মধ্যে এক ঋষীসঙ্ঘ বিদ্যমান। আজও নাকি আছে। যদি কোনও ভাগ্যবানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায় তো তিনিই যথার্থ কিছু জানতে পারবেন। হিসাব মত তার মধ্যে তুঙ্গনাথ ভৈরব ১২০০০ ফুট উচ্চে, রুদ্রনাথও ঐ রকম কারণ একই পর্ব্বত শ্রেণীর দুই প্রান্তস্থ শৃঙ্গের উপর এই দুই শিবের স্থান। আমার মনে ছিল যেগুলি আমার যাত্রাপথের মধ্যে, মধ্য হিমালয়স্থ ধামগুলি যার পশ্চিমে শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে বদরীনাথ, এরমধ্যে যেগুলি আছে, না দেখলে আসল বস্তু দেখাই

না। সেই জন্যই আমি ঐ পঞ্চ কেদারের অন্ততঃ তিনটি কেদারের ক্ষেত্রে প্রণাম করতে পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম কোন প্রকারেই উপেক্ষা করতে পারি নি। প্রাণের টান এমনই ছিল, জানতাম একটু পরিশ্রম করলে তার ফল ভালই হবে, কখনই বৃথা যাবে না।

যাই হোক্ এই উখী মঠের মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে মন্দিরের যে শোভা চক্ষে পড়ে তা নেপালেরই বৈশিষ্ট্য মনে হয়। এখানে একটী বাজার আছে, একটি ডাকবাংলা এবং ডাকখানা, তারপর পুলিশ ষ্টেশানও আছে, হাসপাতাল ও আছে।

বাবা কমলীবালার ধর্ম্মশালায় উঠলাম। একবার ডাকখানায় গেলাম। মুদির দোকান খাবারের দোকান, তারই কাছেই ডাকখানা। পোষ্ট মাষ্টার ও মুদি একই ব্যক্তি। এখান থেকে দেশে একখানা চিটি লেখা হল, বন্ধুবরকে কিছু টাকা পাঠাবার জন্য, একেবারে বদরীকাশ্রমের পোষ্ট মাষ্টারের জিম্মায়। যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন ঐ খানেই থাকতে হবে।

কেদার থেকে বেরিয়ে, রাত্রে আর চুলা ধরাবার পাঠ রাখতে চাইনি কিন্তু জেঠামশাই ছাড়বার পাত্র নন। বাজারে হালুয়ায়ীর দোকানে খাবারের দাম বেশী, তা ছাড়া মাছিতে বোঝাই খাবারগুলি, কাজেই পয়সার অপব্যয়। জেঠামশাই রাত্রে হাতে চাপড়ে রুটি খাওয়ার পক্ষপাতি। আমি মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে দোকানের পুরী কচাউড়ী খেয়ে নিতাম সেটা যদি টাট্‌কা ভাজা পেতাম। রাত্রে মাছির উৎপাত নেই সুতরাং সে খাদ্য অখাদ্য নয়। আর ঐ ভাবে রাত্রের খাওয়ার কাজটী সেরে, রান্নার পরিশ্রম টুকু বাঁচাতে চেষ্টা করতাম।

ওদিকে অতটা পাইনি, শ্রীনগরের পর থেকেই মাছি ও পিশুর উৎপাত বিশেষতঃ রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকেই কি ভীষণ মাছি। একথালা খাবারের উপর যখন দল বেঁধে বসে তখন ঐ থালায় খাবারের কোন চিহ্নই দেখা যাবে না, তাতে যেন একটী কালো ঢাকা বিছান আছে। মিষ্টান্ন পাত্রের উপর মৌমাছিরই অধিকার। খাদ্যরসভেদে, মক্ষিকা ভেদ হিমালয়ের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

পশ্চিমের সর্ব্বত্রই মাছি আছে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু হিমালয়ের মাছির বৈশিষ্ট্য আছে। তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় গোটা কতক যদি গায়ে বসে, আর কিছুক্ষণ যদি বসতে পায় তারপর তাড়ালেও সহজে যায় না,—আঘাতের পর যখন যায় তখন বেশ একখানা ঘায়ের আয়তন ছকে দিয়ে যায়। সে ঘা এড়াবার যো নাই, আইওডিন দিলেও ফুটে উঠবে। স্বচক্ষে দু তিন জনের দুর্গতি দেখেছি। তারমধ্যে একজন যাত্রীর পায়ের ঘা যে অবস্থায় দেখেছি তাতে মনে হয় না, ঔষধে তার কোন প্রতিকার আছে। আবার তার বিশ্রামেরও সম্ভাবনাই নেই যে, কোথাও দুদিন থেকে চিকিৎসা করাবে। যেখানে হাসপাতাল আছে, সেখানেও সে থাকতে পারচেনা বলে, দুদিন হাঁটা বন্ধ দিলে দেশে পৌছাতে দুদিন দেরি হবে। এখন যত শীঘ্র দেশে ফেরা যায় সেই চেষ্টা।

এই উখী বা উখা অর্থাৎ উষা, সংস্কৃত ভাষায় অনেকটা খ'র মত শব্দ, তাই উষাকে উখা, তাই থেকে উখী হয়ে গিয়েচে। এই উষা, বান রাজকন্যা যাকে অনিরুদ্ধ বল পূর্ব্বক হরণ অর্থে বিবাহ করে ছিলেন। আসলে এটী ছিল গান্ধর্ব বিবাহ, এতে কন্যার পিতার সম্মতি ছিলনা তাই কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণের প্রয়োজন। না হলে এত সহজে হরণ শব্দটী কি করে এ ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

জ্যোতীর্মঠ ও উষামঠ প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ প্রায় দেড় হাজার বৎসরের কথা, আচার্য্য যখন এই উখী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে। একটু ঘুরে দেখতে ইচ্ছা ছিল, বহু প্রাচীন নিদর্শন, অনুসন্ধান করলে হয়তো মিলতে পারতো, কিন্তু তাড়াতাড়ি সমস্ত পথ পার হয়ে কতক্ষণে তুঙ্গনাথ, কতক্ষণে রুদ্রনাথ, বদরীনাথ, এই ভাবে যাদের কর্ম্ম ক্ষেত্রের নকসা তৈরী থাকে তাদের দ্বারা আর যা কিছু হোক, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান হবার কথা নয়, তাই আমার মত লোকের কল্পনাই সার। কিন্তু আগেই বলেছি, এখানে এই নগর কেন্দ্রেই কেদারনাথের গদি, অর্থাৎ শীতের সময়ের হেড্ অফিস্, এই হেডকোয়াটার থেকে বিষয় কর্ম্ম পূজাদি, সম্পত্তির ম্যানেজমেণ্টও চলে ; এখানে, সবই শীতকাল সম্পূর্ণই অবস্থিতি। বাবা কেদারনাথ এখানে এক রজত বিগ্রহ আকারেই থাকেন বা আছেন। সে বিগ্রহ নড়েন না।

এখানে যাঁরা মাতব্বর ব্যক্তি তাঁরা বলেন, ওপথে যোশীমঠ, বদরী, কেদার, ত্রিযুগী নারায়ণ, আর উখীমঠ এই কয়টি ঈশ্বরাদেশে একইকালে স্থাপিত। তাছাড়া এই কয়টি স্থানের মন্দির একই স্থপতির কাজ। এই চারটি মন্দির সংশ্লিষ্ট যাকিছু কাজ, জীবনের তাতেই শেষ, আর কিছুই করেনি সে। এখানে উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে এই মঠে। এখানকার মন্দির সীমানার মধ্যে যাত্রীশালা প্রভৃতি দ্বিতল পাথরের বাড়িগুলি সুরক্ষিত আর প্রাচীন প্রথায় সাজানো। দেখলাম অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্র পট, প্রাচান পদ্ধতিতে আঁকার কায়দাই আলাদা, এমনটা এখন দেখাই যায় না। প্রায় সকল বাড়িতে, মন্দিরের বারান্দায়, ঘরের ভিতরে নয়, বাইরের দিকেই এগুলি টাঙ্গানো আছে। উদ্ভট প্রেমের চিত্র তখনকার দিনে শিল্পিরা নিঃসঙ্কোচেই আঁকতে পারতো, এখনকার দিনে বোধ হয় এতটা পারে না। মন্দির মধ্যে এখানে উষা ও অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিই প্রধান।

কেদারনাথের এক পরিচিত যাত্রীর সঙ্গে উখীমঠে দেখা হয়ে গেল। আমরা যেখানে আশ্রয়, নিয়ে ছিলাম তিনি আগে এসে কাল থেকে ঐ খানেই ছিলেন, এবং বিশেষ ভাবেই এক সঙ্গীর অনুসন্ধানে ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে তুঙ্গনাথ যাবে। তিনি জানেন যে তুঙ্গনাথ ও রুদ্রনাথ উঠিতে ভয়ানক চড়াই ভাঙ্গতে হয় সেই জন্য যদি কোন যাত্রী সঙ্গ পান সেই চেষ্টাই করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কাল থেকে যতগুলি যাত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখাশুনা ঘটেছে কেউ তুঙ্গনাথ ও রুদ্রনাথ কোথাও যাবেন না। কারণ ঐ চড়াইকে সব্বাই ভয় করে। শেষে আমার পালা। এখন আমার কথা এই যে আমি যাবো তুঙ্গনাথে, রুদ্র নাথেও যাবো, তবে একটু কথা আছে। যদি সঙ্গ নিয়ে যাই, ফলে মত-বিরোধের অশান্তি আছে, যা বরাবরই আমি এড়িয়ে আসচি। হয়তো পথে কোথাও ভাল লাগলো, আমি রয়ে গেলাম, তাতে সঙ্গীর অসুবিধা হতে পারে। হয়তো পথে কোন সাধু পেয়ে বসে

গেলাম তার কাছে, সঙ্গী থাকলে এ সব পছন্দ করবেন কি? আমি সব কথাই খুলে বললাম। তিনিও বুঝলেন সব কথা, শেষে বললেন, না, আমি আপনার স্বাধীন ভ্রমণে বাধা দিবনা। তাঁর ভাষাতেই বুঝলাম তিনি আমার যুক্তিটা উদার ভাবেই নিয়েছেন। কাজেই আমি নিষ্কৃতি পেলাম। তা বোলে আজ তার মহামূল্য সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইনি। ভবিষ্যৎ ভেবে বর্ত্তমানের সুখশান্তি আনন্দ যে হারায় সে লোক আমি নই। অতএব এখানে বিকাল থেকে রাত নটা পর্য্যন্ত উখী মঠের ধর্ম্মশালায় বসে, একটা পুরা মোমবাতি খরচ করে আড্ডা জমিয়েছিলাম। তার পর শয়ন, এবং গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত হয়ে পড়লাম।

প্রভাতে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষে আমরা যাত্রা করলাম। যাত্রা কালে তিনি, অর্থাৎ আমার ঐ কেদারনাথের বান্ধব বললেন, তুমি ঐ বাহক সঙ্গীটি পেয়েছ ভাল, গাইড ত বটেই সঙ্গী হিসাবেও মানুষটি বড় মন্দ নয়। কি করে জানলেন? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন, চেহারা দেখে আর আপনার সঙ্গে ওর ব্যবহারেও বটে।

উখী মঠের মন্দিরকে কেন্দ্র করে আসপাশে বেশ একটা দৈব ভাবের পরিস্থিতি অনুভব করা যায়। ঐ যে মন্দির, সেখানে সুধু কেদারনাথ শিব লিঙ্গ নয়, ঐখানে শিব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তিও আছে। আর মান্ধাতা ঋষীর মুর্ত্তি, ত্রেতাযুগের জনকের মত। তিনি ছিলেন সত্যযুগের একজন পৌরাণীক রাজা। তীর্ব্বতেও এই নামে এক পর্ব্বত আছে মানস সরোবরের তীরে। অবশ্য এটা অনেক দিন পরের কথা অর্থাৎ আমার কৈলাস ও মানসরোবর দর্শনের অভিজ্ঞতা। এইখানে মন্দিরে উষার ও অন্যান্য যে সকল ধনুর্ধারী বীরগণের মূর্ত্তি আছে দেখলাম কোন মূর্ত্তির মধ্যে যথার্থ প্রাচীন কালের ছাপ নাই।

ধর্ম্মশালার ব্যবস্থাও ভালো, বাবা কালী কমলীর ধর্ম্মশালায় কত কত যাত্রী যে আশ্রয় পায় তার সীমা সংখ্যা নাই। শুনেছি এরা নাকি একটা হিসাবও রাখে। বিশেষতঃ সাধু সন্ন্যাসীদের সদাব্রত বিভাগে যাহাদের সাহায্য দেওয়া হয় তার একটা হিসাব থাকে। একটা গুদাম ঘরে চালডাল আটা, ঘি, গুড় কাট-কুটা মজুত আছে স্থানীয় অধিকারীর জেম্মায়। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ একজন গাড়োয়ালকী ছত্রি, বড় সরল প্রকৃতির মানুষ, আর সাধু সন্ন্যাসীর উপর অসাধারণ ভক্তি। তার মনের গোপন আশার কথাটা সে বলে ফেলেছিল। ভগবান কখন কোনরূপ ধরে এসে মানুষকে ছলনা করেন কে জানে, যদি কোনদিন এক গরীব-সাধুবেশে তার আশ্রমে এসে পড়েন এবং ভিক্ষা যাচিঞা করেন, চেনা তো যাবে না, তাই সকলকেই সমান ভক্তিকরে সদাব্রতের জিনিষ গুলি বাটতে হয়। এখানে একটি সাধারণ হাঁসপাতালও আছে আগেই বলেছি, কাজেই ডিসপেনসারীতো আছেই, সেটা না বললেও চলে।

পরদিন প্রাতে আমরা তার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম। সেই চড়াই পথই চলছে, মাঝ পথে গণেশ চটি পেলাম। এই একবারমাত্র গণপতির নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটলো, না হলে এই বিরাট মধ্য হিমালয় ক্ষেত্রে—কোথাও গণেশ দেবতার অধিষ্ঠান দেখিনি। এখানে চটিটি ছোট—পাঁচ সাত ঘর লোক নিয়ে এই পড়াও। তারমধ্যে চাষবাসও আছে কিছু, তাই নিয়ে এদের চলে। আর মাঝে মাঝে দুই একজন যাত্রী যদি আসে তো কিছু কিছু সওদা,—তাতে তাদের দু চার পয়সা হয়, এই মাত্র।

১৩

পোথীবাসা—চোপতা—তুঙ্গনাথ ৯ মাইল

আমরা বেশ ঘোরালো মেঘাড়ম্বর মাথায় করে উখীমঠের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। সেই চড়াই পথই চলচে, আমাদের সাড়ে আট মাইল পথ গিয়ে পোথিবাসায় উঠতে হবে। চড়াই, তার উপর এ পথ স্রধুই বনপথ। আমাদের পথের একদিকে ফাঁক থাকবেই সেই ফাঁকেই আমাদের মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেন মুক্তি পায়, ঐ দূরস্থ দৃশ্যের মধ্যে। আকাশ আজ আর নীল নয়, ঘোলা, মেঘভরা, তবে এখনও বৃষ্টি আসেনি আমাদের মহাভাগ্যে, কিন্তু শীতল হাওয়া চলছে মাঝে মাঝে। আমরা দুপুরের পর আন্দাজ একটা হবে, অত্যন্ত কঠিন চড়াই শেষে পোথিবাসার চটিতে সোজা-সুজি পৌছে গেলাম। এই যে নল চটি থেকে চামোলী পর্য্যন্ত মধ্য পথটা তা আগা গোড়াই হিমালয়ের উচ্চ স্তর দিয়ে। অরণ্য শোভা বর্ণনাতীত, চড়াই উৎরাই নিয়ে সকল পথই অরণ্যের মধ্য দিয়ে—সবুজ আর নীল রং এ ভরা, পথের মধ্যেই হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ তীর্থগুলি। আমরা বৈকালে আবার রওনা হলাম, আজ আমাদের চোপতা পৌছাতেই হবে কারণ কাল তুঙ্গনাথে উঠবো এটাই সংকল্প ছিল। খানিক চড়াই, খানিক উৎরাই মুখেই নদী বা একটি ধারা পার হয়ে অপর এক পাহাড়ে আরোহণ, এইভাবে প্রথমদিকে প্রায় সাড়ে আট মাইলের পথ, যার বেশীর ভাগই চড়াই। আমরা, পোথীবাসা থেকে এ বেলায় মাত্র তিন মাইল হেঁটে চোপতায় পৌছে গেলাম,—তখন মেঘের আড়ম্বর ততটা নেই।

এখানেও চারিদিকে অরণ্য বেষ্টিত পর্ব্বত। একস্থানে যেখানে ফাঁক বা মুক্ত আকাশ বেশী দেখলাম, সেইখানেই কোন তুষার মণ্ডিত শিখর নজরে পড়ে। বায়ুমণ্ডলে স্থানে স্থানে নীলাকাশের মহিমা,—তার মধ্যে তুষার শুভ্র পর্ব্বত শীর্ষে প্রাকৃত দেব মূর্ত্তি, শ্রমের কষ্ট আমাদের মনে উঠতেই দেয়নি।

এই চোপতার মধ্যে একটি প্রশস্ত সমতল ময়দান আছে। এখানে ধর্ম্মশালাটি বেশ প্রশস্ত। চারদিক ফাঁকা,—আজ এইখানেই রাত্রবাস। অনেকগুলি যাত্রী ছিল

তার মধ্যে বাঙ্গালী তিন চার জন ছিল নরনারী মিলিয়ে, তাঁরা বদরীনারায়ণ থেকে এবার চামৌলী আসছেন কেদারের উদ্দেশ্যে। যেই এক যাত্রী সঙ্ঘের সঙ্গে অপর দলের দেখা হয় অমনি, যারা কেদার থেকে আসছেন তা'রা জয় দেন, কেদারনাথজীকি! আবার যারা বদরী শেষ করে আসছেন তাঁরা বদরীনারায়ণের জয় দিয়ে আলাপ সূচনা করেন।

যাইহোক চোপতার ধর্ম্মশালায় আমাদের রাত্রটা কেটেছিল বড়ই আনন্দে। পর দিন প্রভাতেই যাত্রা, তুঙ্গনাথের পথে। এই চোপতা থেকেই একজন জোয়ান সন্ন্যাসী বা সাধু আমাদের সঙ্গে ছিল;—তার তুঙ্গনাথ যাবার ইচ্ছা। তার কথা যা কিছু মহা উৎসাহপূর্ণ। সে কেদার গিয়েছে তার আগে গঙ্গোত্তরী গিয়েছে, তার আগে যমুনোত্তরীতে গিয়েছিল, বান্দর—পুচ্ছ পর্ব্বত উঠে যমুনার উৎপত্তি স্থল দেখে এসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যাকিছু বলেছিল আমার মধ্যে ভবিষ্যতে ঠিক সেইগুলি দেখবার বাসনার ছাঁচও গড়ে উঠছিল। সারা পথটা আমার তার কথা শুনেই কেটেছিল—মন এতটা তার কথার মধ্যে ডুবে ছিল যে চড়াই পথের দুঃখ কিছু মাত্র মনে উঠতেই দেয়নি। এইভাবে তুঙ্গনাথ পর্ব্বতের পাদমূলে আমরা পৌছে গেলাম।

আমরা বরাবরই চলেছি এই অরণ্যময় পথে কতটা দূর গিয়ে একটা চটি পেয়ে গেলাম। ভুলকোনা চটি, কিন্তু ক্ষণেক বিশ্রাম ব্যতীত এখানে বেশীক্ষণ বসবার দরকার নেই, জেঠার আদেশ। সুতরাং দশ থেকে পনের মিনিটের পরেই যাত্রা। কতক এসে দুটি পথ আমাদের সামনে ফুটে উঠলো। একটি দক্ষিণে পাঙ্গড় বাসা, মণ্ডল চামৌলী আর বাঁদিকের পথ আমাদের তুঙ্গনাথ যাবার।

এই তুঙ্গনাথের বিশাল চড়াই উঠতে যারা অশক্ত তাদের জন্য ডাণ্ডী, কাণ্ডী ঝাপান, এসব অপেক্ষা করচে তুঙ্গনাথের চড়াই পথের নীচে, পর্ব্বতের পাদমূলে পৌছেই দেখলাম। একটু ইঙ্গিত পেলেই ছুটে এসে তুলে নেবে আর তিন-চার ঘণ্টায় পৌছে দেবে। আবার বৈকালে নামিয়ে তোমায় পাঙ্গড় বাসায় পৌছে দেবে। তবে তাদের দাম একটু বেশী দিতে হয়। এখন আমাদের এই জোয়ান সাধুটি, পিঠে তার বেশ বড় ঝোলা নিয়ে, আমাদের সঙ্গে বেশ কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল। এখন সে বলেকি, কুছ ধরম করোগে, সেঠজী, বোলে একটু মুচকে হেসে আমার দিকে চাইলে। শুনে বললাম, হমতো সেঠ নহি,—ঔর ধরম কি বাৎ ক্যা বোলতে বোলিয়ে না? উত্তরে সে বললে, হামতো থক্‌গেয়া, মুঝে এক কাণ্ডীমে বৈঠাও তো ভারী পুণ্য হোয়েগা। কথাটা এমনই অসঙ্গত যে পূর্ব্বাপর কোন দিকেই মিল নেই। হঠাৎ এই পট পরিবর্ত্তনে অন্তরে একটা আঘাত পেলাম, মনটা বিমুখ হয়ে উঠলো। কেবল বললাম,—হাম সে বো নহি হোগা জী;—বোলেই আমি একস্থানে একটু বসবো বলে এগিয়ে

গেলাম। জেঠা একটু পিছনে ছিল,—সে আসচে দেখে আমি একটু ছায়া যুক্ত স্থান দেখে বসলাম।

সাধুজী আমার কাছ থেকে বোধ হয় বিশ পঁচিশ হাত তফাতে,—তার পিঠের ঝোলাটা নামিয়ে রাখলে। তারপর যেই জেঠামশাই এসে তার পিঠের মোটটা একটা উচু জায়গায় ঠেকিয়ে রাখলে আর মাথা থেকে পটিটা খুলে ফেললে তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গেল। ঐ সাধু হঠাৎ হাত পা ছড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উবুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। দেখেই আমি তার কাছে গেলাম,—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া করতে করতে জেঠাও এসে পড়লো ;—সে বোললে, মৃগী রোগ মালুম হোতা। দেখতে দেখতে কাণ্ডিওয়ালা একজন এসে বলে, মুমে জল ছিটানা পড়ি। কোথায় জল ? এ এক বিষম উৎপাৎ। জেঠা লোটা বার করে চললো, কোথায় জল পাওয়া যাবে তার সন্ধানে। জেঠা জল নিয়ে এলো, সেই কাণ্ডিওয়ালা তাকে ধরে সোজা বসবার ধরনে নিয়ে বোসলো, জেঠা জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। বার কয়েক ঝাপটা দেবার পর সে চাইলে। চক্ষুদুটি তার লাল হয়েছে। কিন্তু তার চাউনিটা কিরকম অস্বাভাবিক মনে হোলো। যাই হোক এখন ক্রমে ক্রমে সে যেন একটু সুস্থ হয়েচে মনে হোলো,—ইতিমধ্যে আমরা সঙ্গে আনা খাবার বার করে কিছু জলযোগ করে নিলাম। শেষে সাধুকে কাণ্ডিওয়ালার কাছে রেখে আমরা তুঙ্গনাথে উঠতে সুরু করলাম। এ ক্ষেত্রে আমার দিক থেকে যে এই সহানুভূতির অভাব এবং তার পরিবর্ত্তে বিরক্তি, এই ভাবটাই মনে মনে জানিয়ে দিলে যে আমি কতটা অমানুষ হতে পারি সময় বা ক্ষেত্র বিশেষে।

চড়াইটা তিন মাইল। যখন আমরা মাঝা মাঝি উঠে একস্থানে দম নিচ্চি,—দেখি কাণ্ডীতে সেই সাধু মূর্ত্তি এসে গেল আমাদের কাছে। দেখলাম এখন বেশ ভালই আছে। কাণ্ডীটা বোসতেই সে নেমে পড়লো। একটু হেসে বললে, আপতো হামরা বাস্তে বহোত তকলফ উঠায়া। বলিলাম, ওবাৎ বোলনে কা নহি। অবতো আচ্ছা হৈ ? সে বললে জী হাঁ। লেকেন হামারা বহোৎ খরচা হোগেয়া, ইলোক ছয় রুপেয়া মাঙতে আপ কুছ মদৎ দেও, ওতনা রুপেয়া হামারা পাস নহি।

কি মুস্কিল, এ যে নাছোড় বান্দা দেখি। কিন্তু প্রাণ কিছুতেই দিতে চায় না, মনে হয় অপাত্রে দেওয়া হবে। মিথ্যা বললাম, হামারা পাসভি নহি, হামসে কুছ না হোগা, বলেই উঠলাম, জেঠাকে পিছনে আসতে সঙ্কেত করে।

এই তুঙ্গনাথের যাত্রা পথে যে পড়াও থেকে আমরা চড়তে আরম্ভ করি, ঐ সাধুর কথায় আসল স্থানের যে দৃশ্য মাহাত্ম্য সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। এখন সেই ভ্রম সংশোধন করে নিতে চাই। পথে বেরিয়ে অবধি ঝরনা আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু এই স্থুর আজয়ন্টকুতে যে চমৎকার প্রাকৃত ঝরনার রচনা দেখে নিলাম এমন আর কোথাও

দেখিনি, দেখবো কিনা তা জানি না। চারিদিকেই ঝরনা। চারিপাশেই কোথাও নিকটে কোথাও দূরে এক একটি জলপ্রপাত আমাদের আকর্ষণ করছে। তারা যেন বলছে, হে পথিক প্রিয়, তোমরা মানুষ স্বভাবের গুণে, স্বজাতি প্রীতিবশেই তোমাদের ভাস্কর নির্মিত মূর্তির মোহ কাটাতে না পেরে সেই অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন দেখতে কত কঠিন শ্রম স্বীকার করো, জন্মভূমি থেকে, কত দূর পথ অতিক্রম করে সেই প্রিয় বস্তু দর্শন করে তৃপ্ত হও। কিন্তু এই যে আশ্চর্য্য জীবন্ত শিল্প স্রষ্টার হাতে গড়া ক্রয়াশীল মূর্ত্তি আমাদের দেখে তোমাদের প্রাপ্তির আনন্দ ভোগ হয় না? আমরাও কি তোমাদের কাম্য বস্তুর মধ্যে বিশেষ একটি নয়?—

এ পথে যেতেও এক মহাত্মার সঙ্গে মিলনের সৌভাগ্য হয়ে ছিল। তাঁর যত কথা, চলতে চলতে, চড়তে চড়তে, ধীরে ধীরে সহজ গতিতেই বলা। তাঁর কথায়, চড়াই ওঠার কষ্ট কিছুই হুস ছিল না এখন তাহাই বলচি। তিনি বলছেন,—

আমাদের এই শরীরটি, প্রাণ মন বুদ্ধি কেন্দ্রস্থ আত্মাকে নিয়ে যখন খুব উচু কোন পাহাড়ে ওঠে, তখন ভিতরের দিকে হয় কি? সকল বৃত্তিগুলি নিয়ে আমার অন্তঃকরণও উঠতে আরম্ভ করে; আর পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রের তুলনায় যতটা উচু বোধ হতে থাকে ততই আনন্দ ও আত্মার উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে প্রতীতি হতে থাকে আর ঐ অবস্থায় প্রাণাত্মাও নিচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগের বস্তু প্রভৃতি পার্থিব ভাবভূমি ছেড়ে মেরুদণ্ড পথে উচ্চভূমিতে উঠে যান, শেষে কুটস্থ হয়ে যান। এই যোগের ক্রয়া সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে যেমন যেমন সেই মানুষটি বাইরে উচ্চভূমিতে আরূঢ় হতে থাকে তার শরীর নিয়ে। এ সব প্রাকৃত নিয়মে আপনি আপনি হয়। যার সূক্ষ্ম ফল মনের নিশ্চিত প্রসারতা। আর তা সাময়িক হলেও নিশ্চিত ভাবেই ঘটে যায়। তারপর সে জীব বা আধার উচ্চ হলে তাকে, সত্য সত্যই অতি দ্রুত প্রকৃতিগত করে নেবার জন্য ব্যাকুলতা আসে। তার মধ্যে সদ্‌ভাবাপন্ন যারা তাদের ওটা দীর্ঘকাল স্থায়ী তো হবেই, যারা তা নয়, নিতান্তই পার্থিব ভোগাসক্ত মন, আহার-নিদ্রা মৈথুনানন্দের মানুষ, তাদেরও অন্তরের ঐ উচ্চ ভাব কিছুক্ষণ তো থাকবেই। আরও ঐ সৎ ও আনন্দময় দৃশ্যের আকর্ষণ, ঐ সত্যকে উপভোগ মনের ঐ উচ্চ গতির সঙ্গে নিজের সত্তার বিস্তারের যে আনন্দ, তা যদি কারো একবারও আসে জীবনে, তাহলে ভবিষ্যতেও ওটা ভুলতে পারেনা। স্মৃতিতে তার ছাপ থাকায় তাকে মনে করতেও আনন্দ লাগে যে একবার অন্ততঃ ঐ অবস্থা আমি পেয়েছিলাম, অথবা ঐ আনন্দময় অবস্থা আমি এই সূত্রে পেয়েছিলাম;— আবার ঐ প্রকার যোগাযোগেও পেতে পারি। ভেবে দেখলে এটাও কম কথা নয়। কাজেই উচ্চ ভূমিতে উঠে নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতিদত্ত অধিকার, স্বতঃই মানুষকে উচ্চ উচ্চ, এমন কি মহা মহা উচ্চস্থানের

পানে টানে ঐ আনন্দের আশায়। ঐ উপলক্ষেই তো এভারেষ্ট চড়বার প্রবল টান; আর ঐ উপলক্ষেই তো অন্তরীক্ষে ভ্রমণের নেশা এক স্তরের মানুষের মধ্যে এতটা বলবান। উচ্চস্থানে উঠলে, ক্ষণেকের জন্য হলেও মানুষের মন উচ্চ হয় বৈকি, আনন্দই যে তার শেষ ফল।

কথা শুনে আনন্দে অনেকক্ষণ স্তব্ধ ছিলাম। তখন তিনি আরও একটু বললেন যে, এইসব কারণেই যারা সমতল ভূমির অধিবাসী, তাদের পাহাড়ে চড়ার একটা প্রবৃত্তি সহজভাবেই মনকে উদ্বুদ্ধ করে, আর সে যোগাযোগ ঘটলে তার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। এটাও লক্ষ্য করা যায়, একজন সমতলবাসী যদি একবার পাহাড়ে ভ্রমণ করে আসে তাহলে তার মন এবং গতানুগতিক কর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন কিছু না কিছু হবেই আর তার ফলাফল শুভ ব্যতীত অন্য নয়। সমুদ্রেরও ঐ প্রভাব আছে। সমুদ্র দর্শনেও মনের বিস্তার হয়, ফলে জীবনের লক্ষ্যও প্রসারিত হবেই।

যা হোক অনেক পুণ্যফলেই এই তুঙ্গনাথ ক্ষেত্রে এসে পড়েছিলাম। মনটা প্রথমে ভালই ছিলনা, ঐ সাধু সঙ্গীর জন্য। তারপর যখন তুঙ্গনাথে পৌঁছিয়ে আনন্দে চারদিক দেখলাম একের পর এক তুঙ্গমালা যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ, বদরীনাথের ঐ মহান্ চির তুষারময় শৃঙ্গগুলি তখনই সব কিছু অশান্তির কথা ভুলতে পারলাম। তারপর আর মন্দিরের দেবতা দেখবার জন্য মন্দির মধ্যে যাবার প্রয়োজন রইলো না। এ কথা সত্য, তীর্থের পবিত্র রূপ, মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই যথার্থ দেখা যায়। তারপর ঐ শুভযোগেই স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, মিলন। রাত্র একপ্রহর মুহূর্ত্তের মতই কেটে গেল।

পথটার কথা আরও একটু আছে,—অবশ্য পাকডাণ্ডি, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। সারা তুঙ্গনাথ পাহাড়কে চমৎকার বেষ্টন করে একেবারে শৃঙ্গে উঠে গিয়েছে যেথায় মন্দির। বন পথ প্রায়ই আনন্দময় যদি হিংস্র জানোয়ারের ভয়টা না থাকে। মনে মনে জানি হিংসা আমার মধ্যে থাকলেই আমাকে একজন হিংসা করবে। বাঘ ভালুক, বন্যবরাহ বা সাপ শুনেছি এসবই আছে এ পথে। তা থাক, আমার ভিতরে ঐ হিংসা আছে কিনা সেইটাই দেখবার কথা। খুঁজতে গিয়ে কিছুই বুঝতে পারিনি,—শেষ ঠিক করলাম দেখা যাক যখন থেকে হিংস্র জীবের সুমুখে পড়া যাবে তখনই বুঝা যাবে আসল কথাটা;—কাজেই একটু কৌতূহল নিয়েই উঠতে লাগলাম। পথে সেরকম কারো দেখা পাইনি।

ভেবেছিলাম ১২০০০ ফিটের উপর উঠে যখন তুঙ্গনাথের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখবো সকল পর্ব্বতশ্রেণী এর নীচে সুতরাং নীচের দিকে সব কিছুই দেখা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, উপরে উঠে নীচে লক্ষই হলনা, কেবল তুলনায় মনে হোলো এই তুঙ্গনাথ, আমাদের ত্রিযুগীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। যদিও তুঙ্গনাথ মন্দির, একেবারেই বৈশিষ্ট্যশূন্য মন্দিরের ছাঁচ; যেমন ত্রিযুগীনারায়ণ, উখী মঠ প্রভৃতি। ঐ শ্রেণীর মন্দির,

অতই উন্নত আকার ; অতটাই ঘোরবেড় চারদিকে ;—আর সেই মন্দির মধ্যে মহাদেবের লিঙ্গ, পার্ব্বতী আছেন, নন্দী আছে গণেশ আছেন—যিনি সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা। মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে দেখলাম দূরে উত্তর দিকে সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী, শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীটি চলে গিয়েছে দিগন্তে,—এই তুঙ্গনাথ থেকে অনেকটাই উঁচুতে তাদের মাথা। অতটা

দূরে থেকেও যখন এতটা উঁচু তা হলে সত্যই কতটা উঁচু হবে ঐ সব পর্ব্বতমালা। কিন্তু তুঙ্গনাথেরও মাহাত্ম্য আছে,—বিশেষতঃ আমরা এতটা কষ্ট করে যখন এসেছি তখন নিশ্চয়ই আছে। এই তুঙ্গনাথও শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে।

মোট দশ থেকেবারো খানি ঘর। বেশী লোকের বাস এখানে নিশ্চয়ই নেই তবে একখানা ময়রার দোকান আছে, রাত্রে আমরা তার অতিথি হয়েছিলাম। একখানি ছোট গ্রামের মত তবে এখানেও মানুষের জীবন দ্বন্দ্ব আছে আবার শান্তিকামীর শান্তিও আছে। এক পুরোহিত বা পূজারী, চমৎকার সংযত বাক মানুষটি,—একটি কথা বোললেন তা শুনে বুঝলাম এরা কোন উদ্দেশ্যে এই বিশাল হিমরাজ্যের মধ্যে বাস করছেন। তাঁরা সাধন লব্ধ জ্ঞানে অথবা সহজ জ্ঞানে এমনই মিমাংসা করে নিয়েছেন এই চঞ্চল সংসারী মানুষ-জীবনের কথা, যা ভাবতে বিস্ময় লাগে। তিনি বৈদান্তিক,—বলেন, মানুষ যখনই স্রষ্টার অভিমানে জগতের পানে চেয়ে থাকে তখনই সে নিজেকে ভগবান অথবা দ্বিতীয় স্রষ্টা দেখে, ব্রহ্মা হয়ে যায়। এই দেখোনা তুমি, কোন বাঙ্গালা মুলকের কলকাত্তা থেকে এসেছো হেথা, কি কঠিন চড়াই চড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে চার দিক দেখছো। কি দেখচো? কি দেখে আনন্দে উন্মাদ হয়ে একের পর একটা কঠিন যাত্রা অবহেলায় ঠেলে চলেছ? যা দেখে আনন্দে অধীর হয়েছ তা তোমারই সৃষ্টি, তাই দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছ,—সুখের সাগরে সাঁতার দিচ্চ। শুনেই আমার একটা প্রশ্ন জাগলো, চট করে বলে ফেললাম যে,—যারা এসেছে বা আসচে সবাই তো আনন্দ পাচ্ছে না, কেউ কেউ মহাদুঃখী হয়ে অনুতাপও করচে, কেন মরতে এলাম নিজ গৃহে কি দুঃখ ছিল? কত যাত্রী কঠিন রোগ পর্য্যন্ত সহ্য করে কত কষ্টে ফিরে যাচ্ছে,—তাদের সব দেখাও হচ্চে না—

একটু হাঁসলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মুখখানি বিষণ্ণ দেখলাম,—যে স্ফূর্ত্তিতে আগে কথা বলছিলেন এখন আর সে স্ফূর্ত্তিতে কথা বলতে পারলেন না, তবুও বললেন,—হে সন্ত! এটা বুঝতে পারলে না, তারা পরের দেখা দেখি এসেছিল, নিজের আত্মার প্রেরণায় আসেনি। আত্ম প্রেরণা নিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে শক্তি নিয়ে আসতো, সামান্য এই পথের কঠিনতা তুচ্ছ করে অনায়াসে নিজ উদ্দেশ্য সফল করতে পারতো। বুঝে দেখনা, পরিচিত একজন তার, এক কঠিন যাত্রায় হিমালয় ভ্রমণ করে গিয়ে গল্প করেছে, পাঁচ জনের কাছে শুনে মনে একটা ক্ষণিকের উত্তেজনা হোলো, মানুষের মন তো, ইচ্ছা হোলো আমিও যাবো, আমিও ঐ আনন্দের ভাগি হতে পারবোনা কেন? তারপর সন্দেহ, সংশয় নানা ভাবে দুলতে দুলতে কোন যোগাযোগে একপক্ষের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। সে দলের মধ্যেও আবার তার মত অনেক আছে। এইভাবে খানিক গিয়ে যখন কঠিন পথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তখনই আরাম প্রিয় মানুষের অন্তর কেঁদে উঠে, কেন এলাম, এত দুঃখ পথে কে জানতো? এইভাবেই অযোগ্যও অনেক আসে। শেষটা মন্দের ভালো, কষ্টে সৃষ্টে যেটুকু হয়েছে নীচে নেমে তাকেই পুঁজি করে, গৌরবের কারণ ধরে নিয়ে প্রাণকে ঠাণ্ডা করে। এটা বুঝতে তোমার কি কোন জ্ঞানের অভাব হয় কি?

সত্যই একথা কে না বুঝে, হয় তো স্পষ্ট ভাষায় বলেনা তার প্রাণে দুঃখ লাগবে বোলে। যাই হোক, তিনিই আমার এই তুঙ্গনাথের তীর্থ ফল বা স্থান মাহাত্ম্য সত্যই চেতন মনে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়ে দিলেন। এই মধ্য হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ তীর্থ স্থান, এখানে বেশীর ভাগ যাত্রী আসেনা, উৎকট চড়াইয়ের ভয়ে;—কিন্তু যারা আসে তারা কিছু যে নিশ্চয়ই পায় সে বিষয়ে আর সংশয় নেই। ভাগ্যে আজ রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই মহান্ ব্যক্তিরসঙ্গ পেয়েছিলাম; তীর্থের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়েছে। তিনি আমার একটি তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে এমনই একটি মহৎ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে দিলেন যা এর আগে আমি আর কোথাও শুনিনি। তারপর কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম, এই হিমালয়ে এসে খুব খানিক উঁচু পাহাড়ে উঠলেই কি যথার্থ উচ্চ ফল পাওয়া যায়?

তিনি বলেন, দেখো এই শরীর যন্ত্রটি নিয়ে যা কিছু বাইরের দূরত্ব বা উঁচু নিচু ওঠানামার ব্যাপার তো? কিন্তু এই যন্ত্রের মধ্যে প্রাণ আছে মন আছে আর বুদ্ধি আছে আর যন্ত্রীরূপী সেই আত্মাও আছেন। এই যে মহা মহা উচ্চ ভূমিতে তীর্থস্থানগুলি এগুলি যেন দৈব সম্পদের মত মানুষের মধ্যে কাজ করে। যে যতটুকু ক্ষুদ্র স্থানে থাকে তার মনও ক্ষুদ্র পরিধিতে ক্রিয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, প্রাণও তাদের সঙ্কুচিত অবস্থায় ক্রিয়া করে, প্রসারিত হবার সুযোগ পায় না।

দুজন যাত্রী দেখেছিলাম তুঙ্গনাথে, তারা সেই দিনই বিকালে নেমে গেলেন।

তাই, যখনই কোন প্রসারিত ক্ষেত্রে মানুষ যায় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ও মনের প্রসারতা অবশ্যম্ভাবী; চক্ষুরিন্দ্রীয় যখন দেখে সঙ্গে সঙ্গে মনও সেই প্রসার ধরে তদ্গত হয়ে যায় কারণ মন তদগত ধর্ম্মী। তারপর বুদ্ধি তাকে নিশ্চিত ভাবে ঐ প্রসার তত্ত্বটি অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ প্রসারিত ক্ষেত্রের সংস্পর্শে থাকবে ততক্ষণের জন্য স্থায়ী হতে সাহায্য করে। তারপর সবটাই স্মৃতির ভাণ্ডারে খোদিত লিপির মতই গভীর হয়ে থেকে যায়।

জেঠামশাই ধর্ম্মশালার মধ্যে আগুনের পাশেই আমার কম্বল-শয্যা রচনা করে রেখে অপেক্ষায় ছিল,—গিয়েই শুয়ে পড়া গেল। আমাদের আশপাশে আরও চার পাঁচটি যাত্রী ছিল। তার মধ্যে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক পাঞ্জাবী; তিনি তখনও জেগে ছিলেন। যখন আমি শুয়েছি তখন বললেন, ঐ সাধু বাবার সঙ্গে কি অত কথা হোলো বলুন তো, কিছু পয়সা কড়ি আদায়ের ফিকির বোধ হয়? উত্তরে আমি কিছু বলবার আগেই তিনি আবার এই কথা বোলে শেষ করলেন, আমি জানি, যাত্রীদের উপর ওদের বেশ একটা প্রভাব আছে, চাইলে তো দেবেই, না চাইলেও দেবে,—এমনই সম্মোহনের প্রভাব;—ওদের ঐ বিদ্যাটি ঠিক জানা আছে কিনা। ততক্ষণে আমার তন্দ্রাবস্থা আর বাক্যালাপের শক্তি ছিলনা, অচীরেই গভীর নিদ্রার কোলে ঝাঁপ দিলাম।

প্রভাতে যখন উঠলাম, শীতে বেশ একটা জড়তা ছিল, কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে শুয়ে

গত রাত্রের কথা আলোচনা করতে মনে ভাল লাগছিল। কিন্তু সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা গেল না, উঠতেই হোলো;—মনে হোলো আজকার দিনটা থেকে গেলে কেমন হয়? বাইরে তখন খুব জোরে হাওয়া চলচে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমার মনের কথা তখনও বলিনি, দেখি জেঠা আমার মুখের দিকে চাইলে, যেন জিজ্ঞাসা করলে কি ভাবটা তোমার মনে? তখন সসংকোচে তাকে বললাম,—একরাত্র তুঙ্গনাথ আশ্রয়ে থেকে আশ মেটেনা তাই বলি আর এক রাত্র থাকলে কেমন হয়? জেঠামশাইয়ের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে, বলে এ তোমার বাড়াবাড়ি। ওসব হবে না, চলো নেমে যাই। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত নামতেই হোলো। নামাতো সহজ মনে হয়, তিনটি মাইল পথ একনিশ্বাসেই নেমে যাওয়া যাবে উৎরাইয়ের পথে। ওখান থেকে মণ্ডল হয়ে আবার রুদ্রনাথে যাবার আয়োজন আছে। সে আয়োজন অন্য কিছু নয় চৌদ্দ পনেরো মাইলের ধাক্কা, সেই বিষয়ে মনকে প্রস্তুত করে নেওয়া।

১৪

পাণ্ডুবাসা—মণ্ডল—রুদ্রনাথ—গোপেশ্বর—২৭ মাইল

পাণ্ডুবাসা পেরিয়ে চার মাইল হাঁটার পর মণ্ডল নামে একটি চটি আছে। এই চটিটি রুদ্রনাথ পর্ব্বতের পাদমূলে। এইখানেও কাণ্ডীয়ালাদের অদৃষ্ট পরীক্ষার একটি আড্ডা। অনেক যাত্রী, নরনারী এখানে আসেন, মণ্ডলে এসে বুঝতে পারেন এর উপর তাঁরা তেরো মাইলের চড়াই উঠতে পারবেন কিনা। যদি কেউ নিজেকে অতটা শক্ত মনে না করেন তিনিই এখন কাণ্ডীর আশ্রয়ে যাবেন। কাণ্ডীয়ালা তাকে পিঠে করে নিয়ে রুদ্রনাথ পৌঁছে দেবে আবার তাঁর তীর্থ করা শেষ হলে তাকে পিঠে নিয়ে যথা-স্থানে গিয়ে নামিয়ে দেবে আর কখনও দশ কখনোও আবার পনেরো-টি টাকা নেবে গুনে গুনে। এ ব্যবস্থা কোন কর্ত্তৃপক্ষ করেন নি, কাণ্ডি বা ঝাঁপানওয়ালারা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছে এই সকল কঠিন চড়াই পর্ব্বতের পাদদেশ অবলম্বন করে। এখান থেকে প্রায় ১৫ মাইল গিয়ে তবে রুদ্রনাথকে পাওয়া যায়। মধ্যে অনসূইয়া দেবীর স্থান আছে।

আমাদের এখনও পর্য্যন্ত কাণ্ডীতে চড়বার মত অবস্থা হয়নি যদিও চড়াই অতীব কঠিন। ভগবদ্দত্ত দৃঢ় শরীর, মনে প্রবল উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ প্রাণ নিয়ে অবশ্য আমরা চড়েছিলাম। কিন্তু একথা বললে মিথ্যা হবে যে আমরা সুখেই চড়েছিলাম। শরীরের কষ্ট যা ছাতি ফাটা চড়াই উঠতে হয়ে থাকে তা ঠিকই ভোগ হয়েছে, তবে সহ্য মতই হয়েছে। সে যাই হোক, যারা কাণ্ডীতে যাবার তাঁরা গেলেন,—আমরা তিন চারজন

পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম এবং অনেকটাই এগিয়ে মণ্ডলের পথে এক জায়গায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে থাকি। এইভাবে অনেকটা দূরে একটা ভয়ানক জঙ্গলে এসে পড়লাম। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে জেঠামশাই বেশ দৃঢ়স্বরে আমায় বলে দিলেন, হামারা সাথ আনা, ইয়ে জঙ্গল আচ্ছা নহি। সুতরাং আমিও তটস্থ,—তখনই বহোৎ আচ্ছা, বোলেই অনুসরণ করলাম তাঁকে।

এ পথে দেখছি পথের মধ্যে পথটাই নেই আর সবই আছে। ভেষজের প্রকারই অদ্ভুত, এই জঙ্গল পথে কত রকমের গাছ যে আছে তার সংখ্যা নেই। কয়েকজন, বলিষ্ঠ শরীর শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক এখানে ঐ যে বনের মাঝে একস্থানে বসে আছে দেখা গেল। আমার বড় ইচ্ছা হোলো এদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করতে। অবশ্য বিষম পথের ক্লান্তি বিরামের উদ্দেশ্য যে মনে ছিলনা একথা কেমন করে বলি, কথাটা মনের নীচেই ঢাকা ছিল। আমি বসবো বসবো করছিলাম বটে কিন্তু তখনও বসিনি,—জেঠামশাই আমার এখানে বসাটা অনুমোদন করবেন কিনা একটা সন্দেহও ছিল। হোলোও তাই ঠিক,—জেঠা আমায় বসতে দিলনা, এদের সঙ্গে ;—অব্ বৈঠনা নহি, ঔর থোড়া আগে, উপর চলো, বলেই নিজে গোঁভরে এগিয়ে চলে গেল। ঠিক যেন আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল। কেমন একটা কৌতূহল নিয়ে চললাম, আর বসলাম না। খানিক এসে জেঠা পিছনে একটু ফিরে দেখলে,—তারপর আমায় বললে, উলোক সচ্চা আদমী নহি,—ডাকুভি হো যায় তো মুস্কিল হৈ। ময় লোক দোনো, উলোক তো চার, জওয়ান ভি বড়্ হরে,—কৌন জানে মনমে ক্যা হৈ।

সাবধানী মানুষ জেঠা, তার কথা শুনতেই হোলো। কিন্তু ভগবান সাক্ষী মনে আমার কোনপ্রকার আশঙ্কার রেখাপাৎ করেনি। যদিও ডাকাতের ভয় ছিলনা, সাপ আর বিচ্ছুর ভয়ই ছিল। আমরা ঐ জঙ্গলী পড়াও শেষে অনসূইয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামের চটিতে পৌঁছিয়ে বিশ্রামার্থে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম এক স্থানে। দেবীর মন্দির কতকটা উঁচুতে।

যতটা জঙ্গল, মণ্ডলে আসবার আগে পেয়েছিলাম, ততটাই এমনকি ততোধিক জঙ্গল মণ্ডলের পর রুদ্রনাথের পথে পেয়েছি।

আসবার পথে দেখে এলাম এক রেখাময়ী স্রোতস্বিনী, স্রোত তার নেই, ক্ষীণ ধারা বললেই হয় সুতার মতই, বয়ে চলেছে নীচের দিকে ঝির ঝির করে। তারই কাছে একটি মন্দিরাকৃতি, তার মধ্যে দেবতা আছেন কিনা কিম্বা কোন দেবতা তার কোন নির্ণয় হোলোনা, কারণ কৌতূহল ছিলনা।

একটি রাত্র আমরা এই অরণ্যময় হিমালয়ের নিভৃত আশ্রমে কাটিয়ে আনন্দের স্পন্দন প্রাণে অনুভব করতে করতে প্রভাতের শীতল বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে রুদ্রনাথের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রায় চৌদ্দ পনেরো মাইল বন পথ,—এইভাবে প্রায় পাঁচ মাইলের মাথায় একটু বিশ্রাম করবার মত দুই চারজন লোকের মুখ দেখবার জন্তও বটে একটি জঙ্গলী আড্ডা আছে। আবার ঐ চড়াই পথে কোথাও বা জঙ্গল মধ্যে চার পাঁচ মাইলের পর কোন পাথরের উপর বসে একটু বিশ্রাম। এইভাবে নানা প্রকারে বহুক্ষণ কাটিয়ে রুদ্রনাথ শৃঙ্গে পৌছানো গেল। শেষে জেঠা নিতান্তই কাতর হয়ে বললেন, ইহা আনেকো ক্যা কাম থা;—বে ফায়দা। আমিও কম ক্লান্ত ছিলাম না,—তাকে এই কথা বুঝাতে পারলাম কিনা জানিনা তবে বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, একটু কষ্ট স্বীকার না করলে দেবতার মাহাত্ম্য জানা যাবে কি করে? আমরা যে নরলোক, পাপী, আমাদের তো কষ্ট হবেই,—যাঁরা পুণ্যাত্মা তাঁরাও এসব পুণ্যভূমিতে আসতে একটু কষ্ট ভোগ করেন না কি? এতো শরীরেই কষ্ট, মনে তো সুখ আছে। আমাদের সবটা চড়াই তো শেষ হয়ে গেছে; অব কেল্লাতো মার দিয়া।

আজ এই বারোটি মাইলের পথের আকারে, নানা মূর্ত্তিতেই আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বাবা রুদ্রনাথ। যদিও তার মধ্যে ছিল স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য আর ছিল বন্ধুর চড়াই। হা হুতাশ, বা আক্ষেপের কথা, শরীরের পীড়া উপলক্ষ করে, বুক ভাঙ্গা বা ছাতি ফাটা চড়াইয়ের বর্ণনায় আর লাভ নেই, তাই সে সব কথা না বোলে মুখ্য ফলের কথাই বলা ভালো। মণ্ডল চটি পার হয়ে বরাবর রুদ্রনাথে পৌছে দেখি ঐ তুঙ্গনাথের মতই সবকিছু, কেবল একটু পার্থক্য এ পথের আছে সেটা গিরি রাজ্যের ঐ বিশাল অরণ্যময় শরীর, সেই নীচে রুদ্রনাথের পাদমূল থেকে তাকে চক্রাকারে বেষ্টন করে পথটা শীর্ষে রুদ্রনাথ মন্দিরেব প্রবেশ পথে শেষ হয়েছে। এখানে এসেই বুঝলাম কেন সাধারণ যাত্রীবর্গ এদিকে এই ভীষণ পথের কষ্ট সহ্য করতে চান না। অবশ্য এটা ঠিক যে কেদার থেকে এতটা এসে যে ক্লান্তি, যে শারীরিক অবসাদ ভোগ করতে হয় তাতেই বুদ্ধির সমতা রেখে কেউ তুঙ্গনাথ, বিশেষ এই রুদ্রনাথ আসতে উৎসাহ পান না। কিন্তু চামোলী থেকে যারা কেদাব যাবেন তাঁদেরও ত ঐ স্পৃহা বেশীর ভাগ যাত্রীদের থাকেনা। কারণটা একই,—বিশাল বদরীর পথ অতিক্রম করবার পর আর কেদারের পথে আসতে এই দুই মহোত্তম চড়াই শুনেই একেবারে প্রোগ্রাম থেকে তাঁদের সংকল্পিত ভ্রমণ স্থান গুলি বাদ দিয়ে দেন। একে আমার বয়স তখন ছিল কম, তাব উপর সাধুসঙ্গের একটা দুর্ব্বলতাতো ছিলই, যদি ওখানে কাকেও পেয়ে যাই এরকমের একটা আশাই আমায় পরিচালিত করেছে বরাবরই, তাই আমার পক্ষে বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতই তুঙ্গ ও রুদ্র দুই নাথই দর্শন সম্ভব করেছিল। তবুও মধ্য মহেশ্বরেও গিয়েছি দীর্ঘ পথ আর উৎকট চড়াইগুলি ভেঙ্গে। কিন্তু কল্পেশ্বর হবে কিনা জানি না বিপরীত পথে বোলে। যাই হোক আমার এখানে আসা হলেও যখন রুদ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হোলো তখনই

মনে যথার্থই একটা সহজ ধারণা হয়েছিল যে কেন তুঙ্গনাথের পর কেউ রুদ্রনাথে আসবার ক্লেশ স্বীকার করতে চায়না ভক্তরা। কেন রুদ্রনাথের প্রতি এতটা বিমুখ। যে যাত্রী তুঙ্গনাথ দেখেও আবার সারা মাটি মাড়িয়ে,—পনেরো মাইল পথের একটুও ফাঁকি না দিয়ে রুদ্রনাথের রূপ দেখতে আসেন বুঝতে হবে সে ব্যক্তি সাধারণ যাত্রীদলের এক ব্যতিক্রম। একটু সরল ভাষায় বলতে তার হেড অফিসের ব্যবস্থায় বিষম গোলমাল আছে। তুঙ্গনাথ থেকে এখানে এসে দাঁড়ালে মনে হয়না যে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য আছে। মণ্ডল থেকে পথটাও একই শ্রেণীর কেবল নগ্ন প্রস্তর স্তূপ ঝোপঝাপ, কাঁটা গাছের জঙ্গল কোথাও একটা পাইনের স্তম্ভ। উপরের দিকে যেমন হয়ে থাকে বৃক্ষলতা কিছু কম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণ খণ্ডই সারা ভূমি ব্যাপ্ত। আমরা ছাড়া এই রুদ্রনাথে যাত্রী আরও একজন দেখেছিলাম কিন্তু তুঙ্গনাথে যাত্রী পাঁচজন ছিল। এখানে মন্দিরও ঠিক ঐ একই আকারের এমন কি বোধ একই মাপের। দোকানপাট যা আছে তাতে একসঙ্গে যদি বিশ বাইশ জন যাত্রী আসে তাহলে তাদের রসদ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। একটি মুদির দোকান, আর বাবা কমলীবাগার অযত্ন রক্ষিত ধর্ম্মশালাই একমাত্র আশ্রয় না হলেও তবে একদিকে এর মাহাত্ম্য বিশাল, কারণ এখান থেকে বদরীনারায়ণ তুষার শৃঙ্গ চমৎকার দেখা যায়, খুব নিকট বোলেই মনে হয়, তা ছাড়া কিছু দূরের স্বর্গারোহণ পর্ব্বত দেখা যায়। আমাদের অদৃষ্টক্রমে মেঘে ঢাকা দিনকরের কর সংহরণের জন্য আমরা ঐ মহান দৃশ্যের কিছুই দেখতে পাইনি।

প্রাঙ্গণে আমি একাই দাঁড়িয়ে একটু ক্ষরদৃষ্টিতে চারদিকে দেখছিলাম। মোটা একখান ভোট কম্বলে সর্ব্বশরীর ঢাকা দেওয়া, দোহারা লম্বা শরীর এক প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী আবির্ভূতা হলেন। অবিলম্বেই আমিও কাছে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই তিনি কথারম্ভ করে দিলেন। অল্পক্ষণেই আমাদের অনেক কথাই হোলো। তিনি গত সাত বৎসর এই ধামেই আছেন, এস্থান ত্যাগ করেন নি, এই স্থান তাঁর অতি প্রিয়, আর তিনি রুদ্রনাথেরই উপাসক এইখানেই দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হয়েই আছেন। তিনি বল্লেন, মধ্য হিমালয়ের এই বিশাল ক্ষেত্রের মধ্যে এই রুদ্রনাথই জাগ্রত দেবতা। এখানে রুদ্রনাথ মন্দিরের কাছেই একটি ছোট শক্তি মন্দিরও আছে তিনি দেখিয়ে দিলেন, বললেন, তার কাছেই তিনি বাস করেন। রুদ্রনাথ ও রুদ্রাণীই এখানকার আদি দেব দেবী। তবে এখানে যাত্রী সমাগম অত্যন্ত কম, নেহাত সুকৃতীর যোগাযোগ না থাকলে এখানে সাধারণ যাত্রী আসে না। শুনে আমার সাহস দ্বিগুণ হয়ে উঠতে চায়।

এই ভাবে তিনি অনেক কথাই বললেন,—আরও বললেন, দেব দর্শনাদির পর আহারাদি বিশ্রামের পর আমি আবার যেন তার কাছে যাই, তিনি আশীর্ব্বাদ করে তখনকার মত বিদায় নিলেন। বৈকালে যখন গেলাম, ঐ মন্দিরের কাছেই তিনি ছিলেন

আমি যেতেই ভিতরে নিয়ে গেলেন, বসলেন, আমায়ও বসতে দিলেন। একটা নকুল অর্থাৎ বেজী, অদ্ভুত তার রং, প্রকাণ্ড শরীর, এতবড় বেজী জীবনে দেখিনি, মাথাটা প্রায় নীল, গলায় দুধের মত সাদা একটা চওড়া 'ডোরা, তারপর বাকী দেহ তার ঈষৎ রক্তাভ বেগুনি, দীর্ঘ পুচ্ছ তার অনেকটা ছাই রঙের। আসবামাত্রই তিনি সস্নেহে তাকে বুকের কাছে তুলে নিলেন বললেন,—

এই জীবটি এখানে আমার রক্ষাকর্ত্তা। কি রকম, জিজ্ঞাসা করলে আবার বললেন, এই জীবটি দেবলোকের এখানে রুদ্রনাথের, আশ্রয়ে এসেছে, আমাদের সবারই প্রিয়। সবাই জানে এ রুদ্রনাথের পরম ভক্ত। আমি একে রুদ্রনাথ মনে করেই ভালবাসি। সেবা করি,—একে নিয়েই এখানে আছি। একবার একে নিয়ে চলে যাবো ঠিক করেছিলাম। একে কোলে করে কতকটা পথ নেমেও গিয়েছিলাম, তারপর এ আর কিছুতেই আমার কাছে রইলো না, ছটফট করে নেমে গেল আর চোঁ চাঁ দৌড় দিয়ে উঠে গেল মন্দিরের দিকে। আবার আমায় ফিরে আসতে হোলো। তখন থেকেই সংকল্প করলাম এ জীবনে আর কোথাও যাবো না এইখানেই দেহত্যাগ করবো। আমি তাঁর কথা শুনে অন্তরে একটা জাগ্রত ভাবের শিহরণ অনুভব করলেম। ভাবলেম এই ক্ষুদ্র জীবটিকে উপলক্ষ করে এই ভৈরবীর জীবনে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, যা তার ইহ ও পর জীবনও নিয়ন্ত্রিত করছে।

যাই হোক এইভাবে ভৈরবীর সঙ্গে কথায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমি ধর্ম্মশালার মধ্যে এসে গেলাম ততক্ষণে জেঠা বেশ করে আগুন জ্বালিয়ে শোবার যোগাড় করে অপেক্ষায় ছিল।

অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে একরাত্র কাটিয়ে প্রাতেই উঠেছি। প্রসন্ন মনে পূজারী বললেন, এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এসে এই দেবস্থানে এত কাল থেকে লাভ কি? কিছুকাল থাকতে হয় তবেই না স্থান মাহাত্ম্য অনুভূত হবে। এমনই যদি তাড়াতাড়ি যাবার দরকার তাহলে আসার জন্য এত যত্ন কেন, এত শ্রম কেন? তারপরেই ভৈরবী এসে বললেন, এত তাড়া কেন? একদিন আরও থেকে গেলে রুদ্রনাথের কৃপা পেয়ে যাবে। যারা থাকে তারাই পায়। বিশ্বাস না হয় থেকেই দেখনা আজ রাত্রে, এ দেবস্থানে, বিশেষতঃ এই রুদ্রনাথের মত এতবড় একটি মহান আশ্রয়ে দুরাত্র তিন রাত্র থাকায় তোমারই কল্যাণ, স্থান মাহাত্ম্য বুঝতে সাহায্য করে।

ভৈরবী, ঐ সন্ন্যাসিনী কুমাউ বিভাগের লোক, আলমোড়ার অধিবাসিনী, তাঁর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোন তীর্থ বাকি নেই, সবশেষ কন্যাকুমারী থেকে এখানে এসেছেন আর কোথাও যাবেন না। এখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ,—বিধাতার এক অপূর্ব্ব বিধান। আমাদের তপস্যার সঙ্গে যদিও এর সম্বন্ধ নিগূঢ় তবুও মনের দুর্ব্বলতার জন্য এই সব

যোগাযোগগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আমার প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে ভেবে সুখ পাওয়া যায় ; আবার বলতে বা নির্লজ্জ ভাবে প্রচার করতেও বেশ লাগে, নিজেকে দৈব-শক্তির অধিকারীর পর্য্যায়ে ফেলে। যাই হোক এখন ঝরণার জলে স্নান, জেঠার প্রস্তুত ঘৃত পক্ক রোটি ভেণ্ডি কি শাক, আমাচার, লাড্ডু ইত্যাদি। রাজভোগের পর আবার একটু ঘুরতে যাবো, ভৈরবী মাতা এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন,—চলিয়ে এক চিজ দেখাউ। আজ্ঞা মাত্রই সঙ্গে গিয়ে রুদ্রনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে পৌছালাম। তিনি বোললেন এখানে বড় ঠাণ্ডা হাওয়া, এখানে নয় নাট মন্দিরের ভিতরে চলো। সেখানে,—কুণ্ডের ধুনিতে আগুণ আছে আর উপরে ধোঁয়া, সারা ঘরটা কালো ঝুল হয়ে গিয়েছে। সব সময়েই ঐ ধোঁয়ার মিষ্ট গন্ধ। একোণে কতক ওকোণেও বা কতক মালপত্র রাখা, পূজারীর প্রয়োজনীয় বস্তুবিশেষ মনে হোলো। ভিতরে গিয়ে তিনি বসলেন, আমাকেও ছোট কম্বল গোছের আসন দিলেন, বসলাম। ইতিমধ্যে বেজীটা এসে তাঁর কোলের উপরে চড়ে খানিক কাঁধের উপর উঠলো। তিনি সেদিকে লক্ষ্য না করে বললেন।

হামারা ইয়ে জীবনমে এক ভারি চিজ মিল গই, দেখোতো। গলায় ছিল একছড়া রুদ্রাক্ষ ও প্রবাল মিলিত হার বা মালা। তার নিচে একটী পেণ্ডেণ্টের মত একটি রূপার কৌটা ছোট এক আংটায় আটকানো ছিল। এখন কৌটা খুলে যেটি বার করলেন, সাদা চক্ষে দেখতে যেন ছাই রংয়ের একটা পাথর। হাতে পড়তেই লালের আভা, তারপর আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখো। আমি দরজার দিকে পূর্ণ আলোর সামনে রেখে দেখে চমৎকৃত হলাম। প্রথমটা সিঁদুরের আভা সেটী গাঢ় লাল হয়ে কেন্দ্রে এসে এক অপূর্ব্ব নীলাভ জ্যোতির্ম্ময় বড়ো একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল মানিক ; কিন্তু মানিক নয়। মানিকের এতরকম আভা কেন। ভৈরবী বললেন, এটা পেয়েছি আমি উখীমঠ থেকে মধ্য মহেশ্বরে যাবার পথে এক তুষার ভূমির উপর, আমার লাঠির আঘাতে ওটা ছিটকে যায়। আর সেই সময় সিন্দুরের আভা দেখেই আমি ওটা তুলে নিলাম। সেই থেকে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। বুঝেছিলাম এ রত্ন দৈব,—পাওয়াও মহা ভাগ্যে ঘটেছিল বোলেই মনে করি। ভৈরবী আরও বললেন, আমি সবাইকে একথা বলিনি, এর কথা যাকে তাকে বলা চলেনা। ভাল লোক দেখলে আমি এটী তাকে না দেখিয়েও থাকতে পারিনি। এখানকার রাওয়াল আমায় বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে। রোজ রুদ্রনাথ মন্দিরে এটিকে আমি রুদ্রনাথের সঙ্গেই পূজা করি।

১৫

রুদ্রনাথ, গোপেঁশ্বর, চামৌলী

রুদ্রনাথ থেকে গোপেশ্বর আসতে পথে যে অরণ্য, গ্রাম্য কথায় তাকে অজগর জঙ্গল বলে থাকে,—সে ভাবের অরণ্য এ পথে আর কোথাও পাইনি। হিমালয়ের মধ্যস্তরে উখীমঠের পর থেকেই সারা পথটা এই অরণ্য রাজ্যের ভিতর দিয়েই। কিছু কিছু অরণ্য সকল পথেই আছে কিন্তু সেই মধ্য-মহেশ্বর সীমানা থেকে একেবারে লালসাঙ্গা না হোক গোঁপেশ্বর পর্য্যন্ত অঞ্চল সবটাই অরণ্যময় বললে ভুল হয়না। জেঠামশাই আমায় চক্ষের আড়াল করেননি। সারা পথটা সহজ উৎরাইয়ের পথই ছিল। জঙ্গলের কথা এইখানেই শেষ করবার আগে একটু বলে নিতে চাই। কারণ সে অবকাশ আর পাবোনা। পোথীবাসা থেকে তুঙ্গনাথ, আবার পঙড়েবাসা থেকে মণ্ডল-চটি হয়ে রুদ্রনাথ, আবার সেই রুদ্রনাথ থেকে গোপেশ্বর এই যে মধ্য হিমালয়ের অঞ্চল এমন ভয়ানক হিংস্র জন্তু সঙ্কুল দীর্ঘ অরণ্য সংযুক্ত ভূভাগ আর এদিকে নেই। ভয়ঙ্কর বোলেছি যথার্থ অবস্থা বিবেচনা করেই। যথার্থ ভয়ঙ্কর তো বটেই, আর হিংস্রজন্তুপূর্ণও বটে যদিও আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি একথাও সত্য বটে। কোন কোনও স্থানে এমন ঘন জঙ্গল যে সূর্য্য রশ্মি মাটি স্পর্শ করেনা—ঘোর অন্ধকার স্থানে স্থানে, পথ রেখা কষ্টে দেখা যায়। ছোট বড় সকল রকমেরই গাছ,—আবার লতা গুল্মও কম নয়। এত রকমের বনৌষধি এ রাজ্যে আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। এই সব গাছের মধ্যে পরিচয় কেবল আছে, পাইন, চৗড়, দেওদার এদের সঙ্গে। এখানকার উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে অনেক দূর দূরান্তরের দক্ষ ঔষধিবিদ, লোকজন সঙ্গে এসে থাকেন একথাও শুনেছি। এই ঘোর বনভাগের একটা মাহাত্ম্য আছে যদিও জেঠা আমাদের, সারা পথটা বিপদতারণ মন্ত্র, রাম নাম জপ করতে করতে এসেছিলেন। আমার অন্তর ক্ষেত্র ও গুরু গুরু করে উঠছিল যখন এক একটা বিশেষ বিশেষ স্থান অতিক্রম করেছিলাম। আনন্দের অভাব ছিলনা এবং ঘনীভূত আনন্দ তখন অপর কোন তরল ভাব মনের উপর কৃপা করতে দেয়নি। এইভাবে আমরা সারা পথটা অতিক্রম করে গোপেশ্বরে পৌছে নিশ্চিন্ত হলাম।

এখানে একটা বিশেষ দেশাচারের কথা আছে। যদিও সর্ব্বত্রই আছে—কিন্তু সেই উখীমঠ থেকেই জানতে পেরেছি এটা। ভাজীকা ঝাণ্ডার-বিচিত্র ব্যবহার নিয়েই কথা। একটা খুব উচু গাছ তাতে একটা দীর্ঘতম দণ্ড বাঁধা, উপরে একটা পতাকা দেখা যায়, প্রত্যেক তীর্থের দেব মন্দিরের কাছাকাছি। সেটাই হোলো ভাজীকা ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডা অর্থে নিশান,

পতাকা আর ভাঙ্গী অর্থে যা, তা ভারতের মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং অবস্থান করে নয়াদিল্লীতে কলোনি নামে জগৎ বিখ্যাত করে গিয়েছেন। সেই মেথরদের ব্যবসায় এই সকল ক্ষেত্রে বেশ সহজেই প্রচলিত আছে। এই যে তীর্থস্থানের গুরু পবিত্রতা, সেটা রক্ষার দায়িত্ব সর্ব্বাগ্রে এখানকার অধিবাসীদের উপর তারপর বাকী দায়িত্বটা এসে পড়েছে যাত্রীদের উপর। ঐ পতাকা হোলো অবশ্য প্রতিপাল্য তীর্থ কনসারভ্যানসি বিধি বা হুকুম যা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসচে যে, ঐ পতাকাকে কেন্দ্র করে যতদূর দেখা যাবে ততটা পরিধির মধ্যে কেউ মলমূত্র ত্যাগ করতে পারবে না, করলে আইনানুসারে দণ্ডনীয়, তীর্থাপরাধ বোলে গণ্য হবে। অবশ্য তার দণ্ডটা অন্য কিছু নয় অর্থদণ্ড মাত্র।

কিন্তু সত্যইকি এটা ওখানকার অধিবাসী অথবা আগত তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে পালন করা সহজ? অনেক দূর থেকেই ঐ ঝাণ্ডা দেখা যায়, কারসাধ্য অতদূর এই পর্ব্বত রাজ্যে, চড়াই উৎরাই করে প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে যাবে। কাজেই এখানে ভাঙ্গী মহারাজদের উপাসনা, তীর্থের মুখ্যদেবতার যেমন পূজা বিধি এখানে সেই মত ভাঙ্গীদের সন্তোষ, তাঁদের হুকুম তামিল অবশ্য করণীয় যাত্রীদের। শেষটা দু আনা চার আনা পয়সায় রফা করতেই হয়।

গোপেশ্বর স্থানটী মনোরম, এমন চিত্তাকর্ষক স্থান আমাদের ভাগ্যে উখীমঠ ছাড়বার পর পথে আর পড়েনি। এবার আমার বদরীনারায়ণের অধিকারে আসক্তি, অরণ্য মরু জঙ্গলে থেকে আমরা যেন মনোহর উপবনে, তা থেকেও অপরূপ পার্ব্বত্য উদ্যান রাজ্যে প্রবেশ করলাম। গোপেশ্বরের মন্দির যদিও ঐ একই রূপের যেমন এ অঞ্চলের সকল মন্দির হয়ে থাকে, তবুও পারিপার্শ্বিক স্থান মাহাত্ম্যে এই প্রকাণ্ড মন্দিরটি মনে হলো যেন যথার্থই দেবমন্দির। এ মন্দিরে রাওয়াল বা পূজারী আলাদা রকমের; যদিও দক্ষিণ দেশবাসী শঙ্করাচার্য্যের নিজ স্থানের লোক। অষ্ট ধাতুর তৈরী একটি ত্রিশুল এখানে দেখলাম। এরা বলে শিবের নিজের হাতের ত্রিশুল এইটি।

স্নানাহার ও বিশ্রামের পর তিনটা নাগাদ পাড়ি লাগালাম, লালসাংগার উদ্দেশ্যে, প্রাণে আনন্দ শরীরে বল, মনে প্রচুর উদ্যম নিয়ে,—যাকে বলে মনের সুখে ছয়টি মাইল অতিক্রম করে অলকনন্দার উপর সেতু দিয়ে আমরা চামোলীতে এসে গেলাম। তখন অনেকটা বেলা আছে সুতরাং সন্ধ্যার আগে অনেক কিছুই দেখা যাবে।

বেশ বড় গ্রাম না বোলে ক্ষুদ্র নগর বললেই ঠিক হয়। চামোলীতে কি নাই যা সভ্যজগতের পরিচয় বোলে আমরা জানি। তার মধ্যে প্রধান হল হাসপাতাল। ডিসপেন্সারী তো আছেই, আরো আছে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস। স্কুল, বাজার খেলারমাঠ, বালক যুবা ও বৃদ্ধের সমবেত প্রাণোন্মাদনা। আর কি চাই। শ্রীনগরের পর আর এমন জনপদ দেখা যায় নি। আমার মনে হোলো যেন বিশাল বনভূমি

থেকে, বিরাট বনদেবতার অধিকার থেকে এখন সভ্য নাগরিক জীবনে এসে গেলাম। এখানেও অলকনন্দার পুলের উপর থেকে মন্দির, আর সাধারণ গৃহ সকল দেখা যায়। এখন থেকে প্রাণে সহজ আর স্বচ্ছন্দ ভাবই এসে গেল, ঠিক যেন এতদিন অসীমের রাজ্য থেকে প্রাণ আমার সসীমের পথ পেয়ে যেন অনেক সহজেই ইষ্ট মন্দিরে যেতে পারবে।

চামোলীতে উঠলেম, বদরীনারায়ণের এলাকায় আসা গেল। এখন থেকে অলকনন্দার প্রবাহ আমাদের নিয়ে চললো আর সারাক্ষণ মনের মধ্যে একটা সহজ, সরল, প্রাপ্তির আনন্দ জাগিয়ে রাখলে প্রাণে। এখান থেকে যে পথ তা রাজপথ, আর টেলিগ্রাফের তারযুক্ত লম্বা লম্বা পোষ্টগুলি চলে গিয়েছে, বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত তাদের গতি। কোথাও এক পাহারের শৃঙ্গ থেকে অন্য পর্ব্বতের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তার চলে গিয়েছে, এতো এখন থেকে সারা পথেই দেখা যায়।

চামোলীর মহিমা আছে। যদি রেলের পথই হতো তা হলে চামোলী ই. আই. আর. এর মোগলসরাই। এখানে কয়েকটি স্থানে যেতে বড় একটি কেন্দ্র। সেই জন্য চামোলী কখনও নীরব, নির্জ্জন, নিঝুম শান্তভাব থাকে না। যারা বদরীনারায়ণ যাচ্ছেন হরিদ্বার থেকে, যারা বদরী থেকে যাত্রা শেষ করে সমতল ভূমিতে আসচেন, যাঁরা রুদ্রনাথ—তুঙ্গনাথ হয়ে কেদারের পথে যাচ্ছেন অথবা, যারা কেদার পথ থেকে বদরী নারায়ণ যাচ্ছেন তাঁদের এই চামোলী ভূমিকে স্পর্শ করতেই হবে। হাসপাতাল, ডিসপেন্সরী, ডাকবাঙ্গালা, ধর্ম্মশালা, বাজার, পোষ্ট অফিস, আবগারী বিভাগ, স্কুল, পাঠশালা, মায় কুলী ডিপো ঘোড়ার আস্তাবল পর্য্যন্ত, ভাড়ার জন্য। পথে যেতে যা যা দরকার, কাণ্ডিডাণ্ডি কঠিন পথের সম্বল এসব তো আছেই, আরও আছে মালামালের কারবার, কারণ এই কেন্দ্র থেকেই বিভিন্ন পথে যাত্রীবর্গের এবং ঐ অঞ্চলে অধিবাসীদের যত কিছু মালামাল যাতাযাত করে। তারপর ষ্টেশানারী দোকান, হালুয়াই, তারপর আর কি চাই?

দৃশ্য সৌন্দর্য্যের তো কথাই নেই, অলকনন্দার উপর এই ক্ষুদ্র নগরটি এই অঞ্চলস্থ হিমালয়ের একটি সুন্দর নগর। যখন আমরা ওপথের শেষে গোপেশ্বর থেকে চামোলী পড়াওটি সামনে রেখে অলকনন্দার লৌহ সেতুটির উপর দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ চামোলিতে প্রবেশ করলাম আনন্দে প্রাণ এমনই নৃত্য সুরুকরে দিলে যেন এতদিন পর নিজ ভূমিতে, নিজ গৃহে এসে পৌঁছে গেলাম। এত আনন্দ সুন্দর এই স্থানটি দৃশ্যের মধ্যে ধরা ছিল আগে কল্পনাও করিনি।

চামোলীতে আমার কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, অন্ততঃ তিনদিন থাকবো, কিন্তু আমার এই যে এক জেঠা সঙ্গে এঁর অমতে কিছুই করবার যো নেই। তিনি

বলেন হেথা তিনদিন থাকার কোন মানেই হয় না, ইয়ে আচ্ছি বাৎ নহি, ইসি রাস্তেমে সওয়ায় বদরী বিশাল ঔর কোই জাগাহ্‌ রহনে কো লয়েক নহি। সুতরাং দুরাত্রের অবস্থিতি কোন রকমে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হোলো. তাও নিতান্তই অনিচ্ছা সত্বেই, সেকথা না বোললেও চলে।

গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর শিবমন্দির আছে। এটা ছিল শুক্ল পক্ষ। সন্ধ্যার সময় আমি, এখানে শীতের বিশেষ উপদ্রব নেই দেখে ঐ মন্দিরে গিয়ে বসলাম। শ্রাবণের মাঝামাঝি, বোধ হয়, দুই, তিন, চারদিন পর পূর্ণিমা, এখনই প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্নার সঙ্গে গঙ্গার লালজল, যা এখানকার বৈশিষ্ট্য, আনন্দে বসে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কি চমৎকার যোগাযোগ, এতটা পথ অলকানন্দা সেই হৃষীকেশ থেকে বরাবরই নীল ধারায় প্রবহমানা এখানে এমন ঘোলা এমনরূপ হোলো, কি করে সে নীলিমা হারালো? আশপাশে যে পর্ব্বত, যেখান থেকে ঝরণাধারা এসে অলকনন্দায় মিলেছে তার মধ্যে একটাতে লালমাটি আছে। সেইমাত্র একটি ঝরণার ধারায় চামোলী লাল সাভায় পরিণত হয়েছে। ওদিকে কিন্তু কোথাও আর নীল ব্যতীত অন্য রং নাই। দেখি নীচে ঘাট থেকে উঠে আসছে দুটি মূর্ত্তি। নরনারী উঠে আমার কাছেই এসে পড়লো বাঙ্গলায় কথা কইতে কইতে। বাঙ্গালী দেখে বুকের মধ্যে কে যেন সাড়া দিয়ে উঠলো, আমি উঠে দাঁড়ালাম। তাঁরা ফিরে চেয়ে দেখলেন। নমস্কারের সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করলাম বাঙ্গালী আপনারা?

তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন, দেখলাম, অনুমানে বুঝলাম স্বামী স্ত্রী; স্বামী কথা কইলেন, আমার পরিচয় নিলেন, তাঁদের পরিচয় দিলেন। শ্যাম সুন্দর বটব্যাল, বালিতে থাকেন, ই. আই. আর. অডিট অফিসে কাজ করেন, সস্ত্রীক বেরিয়েছেন কেদারবদরী ভ্রমণে। চমৎকার। কি সুন্দর এই যোগাযোগ। তাঁরা উঠছেন একটা ছোট চটিতে। আমরা যে কমলীবাবার ধর্ম্মশালাতে উঠেছি সেখানে তাঁরা স্থান পাননি তাই কাছেই আর একটা ছোট চটিতে উঠেছেন। উপরে দুতলায় একখানি ঘর পেয়েছেন,—একটি ছেলেও আছে সঙ্গে, পনেরো ষোলো বৎসর বয়স। তাঁরা কালই ভোরে যাত্রা করবেন কেদারনাথের পথে। তাঁদের বদরীনারায়ণ আগেই হয়ে গিয়েছে। আমি তাঁদের পেয়ে যেন একটি আত্মীয় পেলাম মনে হোলো কিন্তু কালই তাঁরা যাচ্ছেন একপথে আর আমিও যাচ্ছি অন্য পথে, সঙ্গে তো যাবার যো নেই। দুঃখ একটা রয়ে গেল যেন এক অতি আপনজন পথে পেয়ে হারালাম। বেদনাভরা অন্তরেই আমরা বিদায় নিলাম।

১৬

পিপল-গড়ুর-পাতাল-হেলং—ঝারকুলা—২৪ মাইল

পরদিন সকালে আমরা ছিনকা চটির উদ্দেশ্যেই হাঁটা দিলাম, বদরীবিশালের বিশালতা স্মরণ করে। অবশ্য এই চামোলীর মায়া কাটাতে যেন একটু লেগেছিল। তা লাগুক, ফেরবার পথে এক সপ্তাহ থাকব এই ভাবটাই মনে ছিল। পথ কঠিন নয়। চামোলীতে দুটি চমৎকার পাহাড় দেখেছিলাম, মনে হল মার্বেল পাহাড়, সাদা আর একটি গৌরীক বর্ণের। এ দুটি সবার চক্ষেই পড়েছিল। এখন আমরা চললাম সব কিছু পিছনে ফেলে। সামনের দৃশ্যও বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল তাই তখন মনের প্রফুল্লতা বজায় ছিল।

সিয়াসেন ছয় মাইল; মধ্যে মঠ চটি আর সিয়াসেন বোলে দুটি ছোট গ্রাম বা চটি পেরিয়ে আমরা মাইল খানেক চড়াই পেয়ে গেলাম। এই চড়াই শেষ হলে এক ছোট্ট পল্লীগ্রামে, তার নাম হাট, তারপর আর কষ্ট নেই; এখান থেকে দু মাইল হোল পিপল কোঠি। বেলা এগারটা নাগাদ গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় দশ মাইল হাঁটার পর পিপল কোঠিতে উপস্থিত হলাম। জেঠামশাই এখানেই জলযোগের পরামর্শ দিলেন। বাজারের মাঝখানেই একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আছে, এরা বলে পিপল, তাই এটা ঐ পিপল চটি। বেশ বড় চটি, বাজার, দোকান, খাবার দ্রব্য সবই পাওয়া যায়। স্নানাহারের ব্যবস্থা ভালই হল।

সব বাড়ীতে জল কষ্ট, মাড়ওয়ারীরা জলদান করছেন, কানেস্তারা ভরে জল এনে সব জায়গায় দেওয়া হচ্চে। পিপল কোটির বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রামের মাঝখানেই পথ, বরাবর সোজা চলে গিয়েছে। পথের ধারে ঘরগুলি কোনটা উঁচু ফ্লোরের উপর, কোনটা খানিক উঁচুতে। মেয়েরা কর্ম্মঠ, তারা পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সকল কাজেই তাদের সাহায্য করছে। ছোট ছোট অর্থাৎ আট থেকে দশ বৎসরের মেয়েরা বেশ বোঝা নিয়ে চলেছে। উপর থেকে এরা ভুটিয়াদের শ্রমোৎপন্ন অনেক কিছু নিয়ে আসে যাত্রীদের বিক্রি করতে। আবার একখানা পাহাড়ী জিনিষের দোকানও আছে বড় রাস্তায়। তারমধ্যে চামড়া, পশুচর্ম্ম, মৃগ, ভালুক, বাঘের চামড়া, মোটা পশমের কম্বল, বাঘের নখ, দাঁত ইত্যাদি কত রকমের জড়ি বুটি নিয়ে আসে। চামড়াগুলি হাতে নিয়ে দেখা যায় বেশ নরম অর্থাৎ ট্যান করা, এমনি কাঁচা নয়। তাছাড়া হরিণের মুণ্ড, সিং এ সকলও আছে। লাল নীল মোটা পুঁথী প্রবালও ছুরী, ছোরা, ছোট ছোট নেপালী কুকরী এসবও পথের ধারে,—ঐ দোকানেই মৃগনাভি শিলাজি বিশেষ

করে পাওয়া যায়। আমার এসব কেনা কাটার দিকে মন ছিল না, কেবল দেখলাম এখানকার কারবার। বেশ সমৃদ্ধ পার্ব্বত্য গ্রাম। একটি ছত্রির ছেলে রেঁধে দিলে, ডাল, ভাত, তরকারি শেষে দই। বেশ করে ক্লান্তি অপনোদন করে নিলাম। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা রওনা হলাম গড়ুর চটির উদ্দেশ্যে।

পিপল কোঠি থেকে সোজা পথ মাইল চার এসে গড়ুর গঙ্গা পেলাম। চটিও আছে। এখানেও এক প্রয়াগ অলকনন্দার কোলে গড়ুরের আত্মসমর্পণ। এই সঙ্গমস্থল গড়ুরের মন্দির, তারপর বিষ্ণুমন্দির, বাহণ গড়ুরের কাঁধের উপর বিষ্ণুমূর্ত্তি। আমরা গড়ুর গঙ্গায় খানিকটা লোক্যাল ইনজিনিয়ারীং দেখলাম। ঐ সঙ্গম ভয়ানক বেগবতী সহজে কোন নরনারী ঐখানে দাঁড়াতে বা স্নান করতে পারে না, তাই পাথরের পাঁচিল ঘিরে খানিকটা স্নান গঙ্গার উপরেই বেশ বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেখানে মেয়েরা অনায়াসেই স্নান করতে পারে। এখান থেকে পাতাল গঙ্গা চার মাইল মাত্র কিন্তু প্রথমে পথটা চড়াই।

এ পথে দেখছি এক দুমাইল অন্তর চটি, এত চটি কোন পথে নেই। গড়ুর চটি পেরিয়ে আমরা দেখতে দেখতে তাঙ্গানী বোলে দুমাইলের মাথায় একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এসে পড়লাম। পাইন ফরেষ্ট এর ভিতর দিয়ে পথ, দিব্য দৃশ্য, দিব্য গন্ধ, দিব্যভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা এ পথে চলে ছিলাম, যৎসামান্য চড়াই প্রায় সবটাই উৎরাই। বেশী কিছু পাথরের কুচি পথে ছিল না। এ পথের সবটাই আরামের এতটাই সুখের যে স্মৃতির মধ্যে দাগ বড় গভীর হয়েই রয়েচে। তারপর দু মাইল গেলে, ঠিক যেন মর্ত্তলোক থেকে একেবারে পাতাল প্রবেশ কোরে পাতাল গঙ্গায় এসে সেই চঞ্চল ধারার সঙ্গে একই গতিতে মনকে ছেড়ে দিলাম। কি প্রখর দুর্দ্দান্ত গতিতে পাতাল গঙ্গাকে এককরে নিয়ে অলকনন্দার প্রবাহ।

দেখতে দেখতে আরো দু মাইলের মাথায় গুলাব কোঠিতে এসে নিঃশ্বাস ফেললাম। আজ আমাদের দশ মাইল হল। এই গুলাব কোঠিতে ডাকবাংলা আছে। আর চটির উপাদান যা যা তাতো আছেই। পাকা পাথরের ধর্ম্মশালা ফিট্ ফাট্ ঝরঝরে চমৎকার। সবসুদ্ধ আমাদের আজ প্রায় আঠারো মাইল পথ চলা হলো তারমধ্যে এক দেড় মাইল চড়াই ছিল। মনে হিসাব করে দেখলাম একমাসপূর্ণ হয়েছে। তবুও বেশী দিন কোথাও থাকিনি, ত্রিযুগীনারায়ণে ও কেদারে ত্রিরাত্র, আর কোথাও দুরাত্র তার বেশী নয়।

যোশীমঠ যেতে পাতাল থেকে মধ্যে একটা সাড়ে তিন মাইলের চড়াই আছে সেই চড়াই অন্তে কুমার চটি। এই স্থানটির নাম হেলাং। চমৎকার স্থানটি, ছোট চটি বটে কিন্তু অনেকটাই উঁচুতে, আমরা আড়াই মাইল সমুদ্র তল থেকে প্রায় উপরে উঠেছি, সেই

অনুপাতে সূক্ষ্ম বাতাস, আর শরীরে টান, মাংস গায়ের কুচকে এসেছে, রুক্ষ বাতাসে চড় চড় করচে শরীর, আর শীতল হাওয়ায় যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠচে। আর সাতাস মাইল পথ আমাদের সামনে যা অতিক্রম করবার পরেই আমরা ইষ্ট মন্দিরের সোনার চূড়া দেখতে পাবো।

এই হেলং চটির নীচে দিয়ে একটি পথ বরাবর পাঁচ মাইলের মাথায় ধ্যান বদরীতে গিয়েচে। পঞ্চ বদরীর এইটি দ্বিতীয় বদরী অতঃপর ধ্যানবদরী দেখে এক মাইল চড়াই উঠে কল্পেশ্বরের মন্দির পাওয়া গেল। এই যে শিব মন্দির এটিও খুব প্রাচীন, আর এই কল্পেশ্বরই পঞ্চ কেদারের শেষ কেদার। এই সূত্রে আমাদের পঞ্চ কেদার দেখাও হোলো। ধারার জলে স্নান আর শিব লিঙ্গ দর্শন, আর মনোরম দৃশ্য চারিদিকে। যাইহোক আমরা ফিরে আবার হেলাং চটিতেই সন্ধ্যার খানিক পূর্ব্বেই এলাম। পর দিন ঝারকুলা যাবার সংকল্প ছিল। সেটা ঐ হেলাং থেকেই যেতে হবে তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার চেষ্টা করলাম। ফিরে এলামও বটে কিন্তু পথে একটু চোট খেয়ে এলাম। অপ্রত্যাশিত এই চোট খাওয়াটাও অদৃষ্টে ছিল বলতে হবে। এখানকার শীতল বাতাস উপভোগ করতে করতে যখন চড়াই উঠছি, আকাশ পরিষ্কার ছিল বোলেই হাওয়াটা তীক্ষ্ণ ছিল। যে পাহাড়টি পাতাল গঙ্গার সঙ্গম পার হয়েই পেয়েছিলাম তার মধ্যে পাইনের বীথি, আর একরকমের গৈরীক মাটীর মতই রং কতকটা পথে পেয়েছিলাম,—তার উপর গাছ গাছড়া, বনৌষধীর অভাব ছিল না,—কিন্তু ঐ দিব্য দৃশ্য ও গন্ধপূর্ণ পথেই আমাকে একটি আঘাত পেতে হয়ে ছিল;—চড়াইয়ের মাঝে একটা বাঁক ঘুরেই এক গরুর ধাক্কা খেলাম বিষম, পাশেই একটা স্তূপ, পাথরেই হবে, তার উপর আছাড় খেলাম। ঘটনাটা নাটকীয়। একটা লোক, গাঁওয়ার, তাঁর কাঁধে একটা ছেলে হাট হাট করতে করতে উৎরাই পথে নামছিল, খুব সম্ভব পাকডাণ্ডি পথেই সে ছিল, কারণ ঐ বাঁকে মুখেই পাকডাণ্ডির আরম্ভ দেখলাম। আমি চড়ছি, সে নামছিল তারি হাতে, গরুর দড়িটা টাইট ছিল না। আমারই দুরদৃষ্ট; বাঁকের আগেই গরুটা হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরেই একটু দ্রুত নেমে, তড়তড় করে আমায় গ্রাহ্য না করে নিজের গতিতে নেমে গেল। তার ফলে আমি ছিটকে পড়লাম একটা টিপির গায়ে। আমার ডান হাতের দাবনাতে লাগলো চোট্। গুরুতর কিছু নয় প্রায় ইঞ্চি দুই আড়াই মাংসের ছাল উঠে গেল আর একটু রক্তপাত হোলো, জামাটা আর কাপড় কতকটা ভিজে গেল। শেষে কুমার চটিতে গিয়ে যখন পৌছালাম তখন একটু বেদনা হয়েছে। একটা ঝরণা ছিল, জেঠা, চটিতে মালপত্র রেখেই একখানা কাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে গেল, ধারায় স্নান ও ঐ ক্ষতস্থানের ঔষধ ধারার শীতল জল। সত্যই শীতল, তুষার গলিত ঐ জলই আমার পরমৌষধের কাজ করেছিল। যে গাছের পাতা, কেদার নাথের কবিরাজ, দাঁগিন্নির হাঁটুতে লাগিয়ে-

ছিলেন সে গাছ আসে পাশে কোথাও পেলাম না। ডিসপেনসারি থাকলে আইওডিন বা বেনজয়েন দেওয়া যেতো। দেখি যোশীমঠে গিয়ে যদি পাই। তবে কাল যেতে আমাদের বৃদ্ধবদরী মন্দিরে ইচ্ছা আছে, আজ বৈকালে যেহেতু যা কিছু 'এখানে দেখবো এই ইচ্ছা ছিল। আজ আমাদের এখান থেকে কোথাও যাওয়াটা বিধাতারই ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমরা যাত্রা করবার আগেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে বোধ হয় অবিশ্রান্ত বর্ষণ হোলে, শিলা অবশ্য প্রথমেই পড়ে ছিল। বারান্দা থেকে কয়েকটা বড় বড় শিল কুড়িয়ে একটা রুমালে পুরে হাতের ঐ স্থানে জড়িয়ে রাখা হোলো। একে শীত তার উপর অঙ্গে তুষারের পরশ ;—এখন যতই অপ্রিয় হোক শেষে দেখলাম পরদিন প্রাতে বেদনা নাই। এই উপকার ফলে আমায় আর বেশী ভুগতে দেয়নি।

এই হেলাং থেকে আমরা এর পরের চটি এখানে ও বাবা কমলীর ধর্ম্মশালা ছিল যদিও আমরা তাতে উঠিনি কিন্তু খবর হিসাবে পাঠকের জেনে রাখা ভালো। বেশী ভীড় না থাকলে এখানে ঘর সহজেই পাওয়া যায়। সুখ স্বচ্ছন্দের সকল বিধানই এখানে হতে পারে মোটামুটি রকম। আমরা পথে বিশেষ চড়াইতো পাইনি বরং খানিক উৎরাই পেয়েছিলাম। যোশী মঠের মন্দির, হেথায় দূর হতেই দেখা যায়,—ঐ মঠ সংশ্লিষ্ট বিস্তৃত আয়তনের মধ্যেই যাত্রী নিবাস, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি। আজ প্রায় আট মাইল হেঁটে গেলেই প্রায় ন'টার সময় যোশীমঠে পৌছে যাবো।

পৌছে বৃদ্ধ বদরী যাবার সংকল্প করলাম। কারণ এ তীর্থগুলি কাছাকাছি মাত্র দুই এক মাইলের মধ্যেই আছে এতে বঞ্চিত হবো কেন ? যতটা সম্ভব শীঘ্র কাজ সেরে পরে আসল তীর্থের পথে এসে উঠবো, এই ছিল উদ্দেশ্য। এই হেলাঙ্গ থেকে পাঁচ মাইল দূরে আমাদের পড়াও। অল্প চড়াই পথ, সেই পাঁচ মাইল আমরা দুই ঘণ্টায় পৌছে গেলাম। চটি আছে ধর্ম্মশালাও আছে, ঝারকুলা বেশ বড় গ্রাম। সেখানে একটু জিরিয়েই আরও মাইল দেড় দুই অবতরণ করতে হোলো,—বৃদ্ধ বদরী দর্শনে। পঞ্চ বদরীর তৃতীয় বদরী এই নারায়ণ মূর্ত্তি। অনি-মঠ এই স্থানের নাম। অতি প্রাচীন স্থান, এখানেও মঠে বহু সাধু সন্ন্যাসীর অবস্থিতি। এরা বলে শঙ্করাচার্য্য যোশী মঠ স্থাপনের পূর্ব্বেই এই মঠে থাকতেন। আর এখান থেকেই আগে বদরীনারায়ণের পূজা হোতো। এখান থেকেই আমরা যোশী মঠে যাত্রা করলাম। সোজা পথ, একেবারেই সোজা যাকে বলে তাই।

১৭

যোশীমঠ—বিষ্ণুপ্রয়াগ—পাণ্ডুকেশ্বর—লম্বগ্রহ—হনুমান—২৪ মাইল

প্রায় এগারোটার সময় যোশীমঠের পবিত্র ভূমিতে পৌছে গেলাম। কিন্তু এই যে সুন্দর পথ আমরা অতিক্রম করলাম তার প্রসারিত রূপের তুলনা নাই।

পথে হেলাং চটির কথা আগেই বোলেছি; যদিও আমরা কেবল সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই কিছুক্ষণ ছিলাম, পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশী হবেনা; এই প্রাকৃত সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ক্ষেত্রে থাকে কারা? এই হিমালয়বাসী প্রত্যেককেই পুণ্যাত্মা বোলেই আমার বিশ্বাস। এখানে আর্য্য উপনিবেশ তো প্রথম থেকে প্রবল ভাবেই আছে, সেই কারণে শুধু ব্রাহ্মণ ছত্রি আর বৈশ্যরাই থাকে একথাও সত্য,—এই জন্যই বলছি যে, সেই হৃষীকেশ থেকেই দেখতে দেখতে আসচি, প্রত্যেক পড়াও, যত যত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গ্রামেই—ঐ তিনটি ব্যতীত কোথাও চতুর্থ জাতি দেখতে পাইনি। দেবপ্রয়াগ, কিম্বা শ্রীনগর, বড় জোর রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত সে আর্য্য বংশীয় জাতির বাস তারা শিক্ষা দীক্ষায় সমতল দেশীয় নাগরিক সভ্যতার অনুগামী, অর্থাৎ তাদের সামাজিক জীবনের আদর্শ, উন্নতি, গতি এবং অগ্রগতি ঐ ভাবের ধারাতেই চলে আসছে। কাশী, এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি অধিবাসীরা এদের পাহাড়ী বোলেই জানে। তারপর রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ করে যেই মন্দাকিনীর উপত্যকার সংস্রবে প্রবেশ করলাম সেখানেও ঐ হিন্দু আর্য্য বংশীয়গণ কেউ ব্যবসায়ী অর্থাৎ বণিকবৃত্তি আশ্রয় করেছেন। কুলীবাহকও ব্রাহ্মণ। ঐ সকল উচ্চস্তরের হিমালয়ের অধিবাসীরা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে শুধুই পবিত্র আচারের মধ্যেই ধরে রেখেছে। বিদ্যার প্রভাব বড় নেই, তবে অবিদ্যার প্রভাবও বেশী নেই। নিত্য স্নানাহ্নিক ও সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া টুকুই ধর্ম্মাচার। বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারগুলি ঠিক ধরে আছে,—কিন্তু বৃত্তিতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কি শূদ্র কোনও ভেদ নেই। যারা ওর মধ্যে ধনবান, খরচ করতে পারে তারাই ছেলেদের জেলা স্কুল পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে পারে। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পাঠিয়ে শিক্ষিত করতেও তারা পরাঙ্মুখ নয়;—কিন্তু আরও উপরের দিকে যে গৃহস্থ হিন্দুরা বাস করে তাদের আদর্শ বড় জোর হিমালয়ের নিম্ন দেশবাসীদের অনুকরণ। কাজেই সে একরকমের অব্যবস্থিত ভাব, যার মধ্যে কোন সামাজিক সভ্যতার ছাঁচ বা বৈশিষ্ট্য নেই যা থেকে তাদের ভবিষ্যৎ গতি নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে। তবে মোটের উপর অল্পেই সন্তোষ এই ভাব মাত্র এখন তাদের অবশিষ্ট আছে। শারীরিক পরিশ্রম করতে এরা কাতর হয় না। চাষ আবাদ আর মোট বওয়াটাই একমাত্র উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনকার দিনে। সার্থক এই

অঞ্চলে এসে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়। গাড়োয়ালেই এদের সরল শ্রমজীবনই লক্ষ্য করেছিলাম যে শ্রমজীবী জীবন কতটা সরল এবং নির্ম্মল হতে পারে।

এখন এই যোশীমঠের কথা—প্রায় ছয় হাজার ফুটের উপর এই স্থানটি কাজেই সর্ব্বঋতুতে লোক থাকেই। বদরীনারায়ণের রাওয়াল, মহান্ত এইখানেই সারা শীতকালটা যাপন করেন আর এইখান থেকেই বদরীনারায়ণের পূজাও করেন। শঙ্করের জ্যোতিঃ মঠ প্রায় আড়াই হাজার বছর থেকে এই জনপদকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। এ গ্রাম বা নগরে অনেক গৃহস্থ অধিবাসী ছড়িয়ে আছে। সুতরাং এখানে এক চমৎকার, শান্ত, উচ্চাভিলাসশূণ্য সভ্যতার অস্তিত্বও বজায় আছে। প্রাচীন গৌরবে দীপ্ত অদ্বৈত বিজ্ঞান তত্ত্বে চির সচেতন এখানকার শিক্ষিত অধিবাসীরা,—বিশেষতঃ ঐ জ্যোতির্মঠের বিদ্যার্থীরা। এই মঠের মহান্তও শঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। কাজেই শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠানে তাঁর নির্দ্দিষ্ট বিদ্যাশিক্ষা ধারা এরা সতেজ রেখে দিয়েছে। লুপ্ত হবার বস্তু নয় বোলেও বটে আর এদের রক্ষণ রীতি এমনই মৌলিক যে কোন কালে তা লোপ পাবে না। শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত চার ধামের প্রতিষ্ঠা এমনই কৌশল পূর্ণ, এবং বিজ্ঞানসম্মত যে, কোন কালেই তাঁর, মানবজ্ঞানের চরম আবিষ্কার সেই পরমতত্ত্ব অনুশীলনের সুযোগ থেকে ভারতবাসী কখনও বঞ্চিত হবে না। সমুদ্রবেষ্টিত এই ত্রিকোণ ক্ষেত্র ভারত ভূমির সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে সাগর কূলে রামেশ্বরে সিঙ্গেরি মঠ, পূর্ব্বপ্রান্তে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, সুদূর পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকাপুরীতে সারদা মঠ আর উত্তরে এই হিমালয়ের কেন্দ্রে জ্যোতির্মঠ; এই চারটি ধামের মধ্যগত সারা ভারত ভূমিতে শঙ্কর তাঁর অদ্বৈত তত্ত্বটি ব্যাপ্ত রেখে গিয়েছেন। আচার্য্যের প্রবল তপস্যা, অধ্যাত্ম শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই তত্ত্ব. সারা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দ্বীপময় ভারতভূমিতে আজ পর্য্যন্ত তা অটুট রয়েচে। এভাবে প্রচার তাঁর পূর্ব্বে ভারতে হয় নি। এই যোশী মঠ অন্য দিকে ও স্থান মাহাত্ম্যেও অসাধারণ। এখান থেকে একটি পথ তিব্বতের দিকে গিয়েছে নিতি গিরিসঙ্কট পার হয়ে। সে পথে তিব্বতে, পূর্ব্বে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে তীর্থপুরী ও ভস্মাসুরের স্থান, অনেকটা নিকট মনে হয়। আবার সেখান থেকে প্রায় বিশ মাইল গেলে কৈলাস পৌছানো যায়। এ পথে যাওয়া সমীচীন নয় প্রথম কারণ সঙ্কটপূর্ণ বন্ধুর পথ, তীর্থগুলির দূরত্বও বেশী, ধৌলী গঙ্গার তীরে তীরে পথ অবশ্য প্রথম দিকে তত খারাপ নয়,—তবে আরও উপরের দিকেই পথটা কষ্টকর।

এখান থেকে কেদার যাবার একটি পথের কথা শোনা যায়, যে পথে শঙ্কর এখান থেকে কেদারে যেতেন। কিন্তু সে পথের ব্যবহার এখন সাধারণের জন্য মুক্ত নেই। কত কত সাধু ও যোগীগণ সেই পথে উপর থেকে আসেন এখানে, আবার এদিক থেকে ওদিকে যান। এখানে একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের চারিদিকেই মন্দির এবং কয়েকটি

প্রতিষ্ঠান আছে। নরসিংহ মন্দির এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির। ধর্ম্মশালা, বাজার, ডাকঘর সবই আছে।

যোশী মঠের আসল নাম জ্যোতির্মঠ একথা আমরা বহু পূর্ব্বেই বলেছি। একটি কিংবদন্তি আছে যে,—এই মঠ থেকে অল্প দূরে এক মাইলের মধ্যেই, জ্যোতিঃ-লিঙ্গ নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শঙ্করাচার্য্য, সেই শিব মন্দিরই আদি মন্দির আর এই মঠ স্থাপনা তিনি এইখানেই করেছিলেন ; এবং এই মঠের নামটিই আগে শঙ্কর মঠ ছিল। কালক্রমে শঙ্কর ও শিব এক হয়ে সাধারণের মধ্যে মঠটি জ্যোতির্মঠ বোলেই প্রচলিত হয়ে গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে পল্লি সমাজে এই জ্যোতির্মঠ ব্যবহার ক্রমে যোশীমঠ হয়ে গেল। শুদ্ধ শব্দ বা নামের অপভ্রংশ এই ভাবেই হয়। এখানকার প্রধান মন্দির নরসিংহ দেবের আগেই বোলেছি, দ্বিতীয় মন্দিরে বাসুদেব ও বলরাম দুই ভাইয়ের মূর্ত্তি আছে। এখানে বদরীনারায়ণের মন্দিরও আছে, দেওয়ালীর পর যখন উপরের ঐ বদরী-নারায়ণের মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, রাওয়াল এখান থেকেই নারায়ণের পূজা করেন। এখানে পুরাণের প্রায় সব দেবতাই আছেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তো আছেনই, তারপর সবার উপরে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের বাঙ্গালার একচেটে বোলেই যাঁকে ধারণা ছিল সেই শ্রীশ্রীমতী শীতলা ঠাকুরুণও আছেন দেখি। দুর্গাও আছেন ঐ মন্দিরেরই বাইরে। বাইরে দুর্গাকে ঠেলে দিয়ে আমাদের দেবী শীতলা কি ভাবে গর্ভগৃহের রত্ন বেদীর উপর স্থান দখল করলেন এটাও আমার কম আশ্চর্য্য লাগেনি। আবার জগদম্বাই বা এটা সহ্য করলেন কি করে? ভেবে ঠিক করলাম, দুর্গা, কালী, এঁদের তো আপন স্থান এই হিমালয়ের সর্ব্বত্র বললেই চলে, হয়তো ভাবলেন কোন সুদূর পূর্ব্ব দেশের নূতন ভগিনীটিকে স্থানটা ভিতরেই করে দেওয়া যাক, না হলে বরফের দেশে শীতে কষ্ট পাবে। এই শীতে তো তাঁর সেই পূর্ব্ব দেশের ছেলেরা এসে রক্ষা করতে পারবে না, তাকে ভিতরেই রাখা ভালো। এইরকম পাঁচ সাত ভেবেই সদয় হয়ে শীতলা ভগিনীকে মন্দিরাভ্যন্তরে রেখে বোধহয় জগদম্বা নিজে বাইরে স্থান করে নিয়েছেন।

যখন আমরা ওখানে পৌছে আনন্দে কলরব করছিলাম তখন ধর্ম্মশালার রক্ষক এসে বললে, একটু আওয়াজ কম করবেন, কারণ এখানে একদল পীড়িত যাত্রী, তারা কৈলাস ও মানস সরোবরের ফেরত এসেছে আর এখানেই আছে আপনাদের পাশের ঘরেই। একজন বললে, এখানে তো হাসপাতাল আছে সেখানে যায়নি কেনো? অধ্যক্ষ বললে যে, তারা এখানে এসে পর পীড়িত হয়েছে। তবে এখানেও কিছু দীর্ঘ কাল রাখা যাবেনা, যদি আজকালের মধ্যে আরোগ্যের পথে না যায় তো শেষে হাসপাতালেই পাঠাতে হবে।

আমি দেখতে গেলাম কি রকম কৈলাস মানস সরোবরের ফেরত যাত্রী। রক্ষকের সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করলাম ঘরে। অন্ধকার, তিন চার জন শুয়ে আছে খাটিয়াতে,

আরও দুজন নীচে কম্বল পেতে তার উপর বসে আছে। জোয়ান মরদ সবগুলিই কেবল খাটের উপরের একজনের বয়স চল্লিশের উপর বোধ হোল। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিলে, কিছু পথের খবর জানবার জন্যই আমি খানিকটা ওখানে ছিলাম। একজনের সঙ্গে কথায় তাদের পরিচয় পেলাম। লকনৌ নিবাসী তারা। আলমোড়ার পথেই তিব্বতে পৌছে মানস-সরোবর তারপর কৈলাস হয়ে তীর্থপুরীও ভস্মাসুর দেখে এই নিতি পাস দিয়ে পাঁচ দিন হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেচে। পথেও তিনজন তারা পীড়িত হয়ে পড়ে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পূর্ব্বেই তিব্বতী ডাকাত দলের পীড়নে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বাধ্য হয়। নিতি গ্রামের এ দিকে বামপা বোলে একটা ভোটিয়াদের গ্রাম আছে সেই গ্রামে তারা প্রায় দশ দিন কাটিয়ে তারপর সুস্থ হলে তবে এখানে আসতে পেরেছে। এখানে আসবার পর আজ তিনদিন অসুস্থ।

যথার্থ অসুস্থ সেই পাঁচজনের মধ্যে দুজন মাত্র। কিন্তু সবার চেহারা এমন হয়ে গিয়েছে দেখলে ভয় হয়। বিশেষ পীড়িত যারা দুজন তাদের বয়স কারও ত্রিশ বৎসরের বেশী বোধ হয় না; কিন্তু এমন বিকট চেহারা যে সবার কি কারণে হয়েছে জানতে প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছিল। অথচ এক কথার ব্যাপার নয় তো, নানা প্রকার প্রশ্ন করে সামান্য কিছু সেবা করে, তাদের কাছেই বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে যা উদ্ধার করলাম তা বড়ই কষ্টকর। তবে এই পাঁচজন হিন্দুস্থানী সুস্থ শরীর এবং যোয়ান তারা একটু ভয়তরাসে বোলেই এতটা বিপত্তি। কৈলাস ও মানস সরোবর দেখতে বা ঐ অঞ্চলে ভ্রমণকালে কোন কষ্টই হয় নি। কৈলাস শেষ করে তারা তীর্থপুরীর পথেই এক দল ডাকাতের হাতে পড়ে তারপর থেকেই যা কিছু অশান্তি। পথে, ওদের সঙ্গে তাকলাথার থেকে তিনজন কুলী ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র চাল, ডাল. আটা, ঘি, শুকনো ফলাদি, তারপর ওদের গরম কাপড় চোপড় কম্বলাদি সবই কিছুই ছিল সঙ্গে। ঐ কুলীরাই, এদের প্রাচুর্য্যের পরিচয় পেয়ে লুব্ধ হয়। তারপর পথে এক ডাকাত দলের সঙ্গে যোগ সাজস করে এদের আক্রমণ করে এবং যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। প্রত্যেকে এক এক খানি কাপড় আর যা কিছু পরা ছিল তাই নিয়ে এরা রুদ্ধশ্বাসে নিতিপাশের পথে মরণাপন্ন অবস্থায় বামপায় এসে পড়ে. সেখানে গ্রামবাসীদের যত্নে তারা প্রাণ পায়। তাদের সঙ্গে প্রায় বারোশত টাকার মধ্যে প্রায় সাতশো টাকার রেজকীও কাঁচা টাকা ছিল, একশত টাকার নোটগুলি আর দশটাকার নোট তারা নেয়নি—আর সব কিছুই নিয়েছিল। পাঁচখানা দামি খুব পুরু রাগ ছিল সেগুলি নিয়েছে।

বামপায়ের, অধিবাসীরা অতিথীবৎসল, যথেষ্ট যত্ন করে তাদের রেখেছিল বলেছি। ভয়েতে মানুষের শরীর কতটা জীর্ণ ও দুর্ব্বল করে তা এঁদের দেখেই অনুমান করা যায়। যে নোটের টাকা এদের কাছে ছিল তা এইখানকার পোষ্ট অফিস থেকে ভাজিয়ে খরচ

চালানো হচ্ছে ; টাকার কোনও অভাব নেই এদের । এখানে আরও কিছুদিন থেকে সুস্থ হলে পর তবেই যাবার কথা।

লখনৌওয়ালা পাঁচ জনের কথা এই পর্য্যন্ত। এই রকমের তিব্বতের ঘটনা আগেও শুনেছি। তবে এতটা যে হয় আমার ধারণা ছিল না ভারতীয় বৃটিশ রাজনৈতিক প্রভাবে তিব্বতে ভারতের বৃটিশ প্রজারা নিরাপদ। শুনেছিলাম,তিব্বত সরকার এর জন্য বিশেষ একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারত সরকারকে নূতন ট্রেড রুট খোলা হবার পর। কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু হয়েছিল বোলে শুনিনি।

এই যোশী মঠেই আরও একটি বিষয় আমায় অবাক করেছিল। গ্রামের মধ্যে একজন দোকানদার, যখন আমি পথে একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম, সে ব্যক্তি আমায় ডাকলে। তার দোকানখানা ঘরের ভিতর, অন্ধকার, সামনে বারান্দায় সে বোসেছিল একটা মোড়ায়। গিয়ে দাঁড়াতেই আসন ছেড়ে, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, বোলে বসালে তার আসনে, সে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি। তখন সে চলে গেল ভিতরে, খানিক পর এলোএক খাতা হাতে করে। সেই খাতার পাতা অনেকগুলি উলটিয়ে একখানা লম্বা অফিসের খামের মধ্যে ভরা লম্বা এক খৎ বার করলে, আমার হাতে দিয়ে বললে দেখিয়েতো। টিরী ষ্টেট থেকে তাকে জানানো হয়েছে যে, শ্রীনগর থেকে না জানিয়ে চলে আসবার সময় তার দিক থেকে সরকারী প্রাপ্য চুকিয়ে আসেনি, অপরাধও এক নম্বর, তা ছাড়া দ্বিতীয় অপরাধ, কয়েকটি ব্যাপারে সরকারকে প্রবঞ্চনা করার অপরাধ, আর তৃতীয় গুরুতর অপরাধ হোলো তোমার ভাই দরবারে নালিশ করেছে তুমি তার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তাকে বললাম, আমি কি করবো ?

সে বলে, বাবুজি তুমি লেখা পড়া জানো, এর একটা জবাব লিখে দাও; যে ও সব মিথ্যা কথা আমি কখনই এমন কাজ করতে পারি না,—আমি রোজ ভগবানের পূজা না করে অন্ন জল গ্রহণ করি না ইত্যাদি। আমি তার কথা শুনতে শুনতেই উঠলাম, তখন সে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে, বাবু আমায় রক্ষা কর, তুমি ভাল লোক ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানকার চমৎকার এক বৈশিষ্ট্য গোলাপ। এমন গোলাপের প্রাচুর্য্য বোধ হয় বৈদ্য-নাথ, শিমূলতলা, ঝাঝায় নেই। ক্ষেত্র হয়তো ভালো, নানা প্রকার গোলাপ যা চাষ করতে হয় তা তো আছে আবার এক রকমের বন গোলাপ যা চাষ করতে হয় না, আপনি পথে ঘাটে বনে জঙ্গলে ফোটে। তারপর সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় এই যে সারা হিন্দু ভারতের কোথাও গোলাপে ভগবান বা ভগবতির পূজা হয় না কারণ ফুলটি যবন-ভূমি থেকে এসেছে সুতরাং অপবিত্র বোলেই দেব পূজক ব্রাহ্মণেরা এ ফুলটিকে জাতে

ঠেলে রেখেছেন। এইখানেই কিন্তু মহানন্দে এর বিপরীত আচরণও দেখলাম। এখানে ঐ গোলাপেই সকল দেবতার পূজা হয় এমন কি বদরীনারায়ণের গদীতে অর্থাৎ হেড কোয়ার্টারে স্বয়ং নারায়ণই ঐ গোলাপেরই পূজা গ্রহণ করেন এবং মাল্য ধারণ করেন। সুতরাং অভিনব, অ-পূর্ব্ব এবং আনন্দময় এর সবটুকুই। গোলাপে বিষ্ণু বা নারায়ণ পূজা শুনে আমাদের পুরোহিত বা পূজারী ব্রাহ্মণ কি বলবেন জানি না, তবে আমি আপন বিবেকের প্ররণায় এক সময়ে গোলাপই সূর্য্যার্ঘ্য দিয়েছি আবার সূর্য্য পূজাও করে এসেছি। চমৎকার ব্যাপার গাছে মনোমুগ্ধকর ফুলটি দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম; তখন আমরা শিমুল-তলায় থাকি, পনের বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্রভাতে উঠে বাগানে এমন সুন্দর তাজা ফুল দেখে সূর্য্য-অর্ঘ্য দিতে এমনই লোভ হোলো সম্বরণের প্রবৃত্তিও হোল না। একথাটাই মনে এলো যে, এই জগৎ পুজ্য, পুষ্প রানীকে ভগবানের পূজায় উৎসর্গ করে তাঁর জন্মগত অধিকারকে সার্থক করার গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে এদেশের সমস্ত পূজক শিরোমণিরাই পারেন কিন্তু ভক্ত শিল্পীরা কখনই পারে না।

এখানে মন্দির সীমার মধ্যে দুটি ধারা আছে এ দুটিই ঝরনা; একটির নাম দণ্ড ধারা অপরটি নৃসিংহ ধারা। এখানকার যা কিছু সবই শঙ্করের কীর্ত্তি। নলযোগে জল চৌবাচ্ছায় পড়চে সেখানে থেকে প্রয়োজন মত ব্যবহার চলছে। এই দুই ধারায় গ্রামখানা চলচে। এখানে পিলগ্রিম ট্যাক্স আদায় হয় প্রত্যেক যাত্রীর কাছে, কেউ বাদ যায় না তবে যার যা সাধ্য। একজন এক টাকার কম দিয়েছিল, ঘৃণা ভরে ছুড়ে ফেলে দিলে। দেখলাম যখন যাত্রী আর বেশী না দিয়ে চলে গেল তখন আবার কুড়িয়ে নিলে। আট আনা দিতে গিয়ে এক যাত্রীর প্রতি এই ব্যবহার দেখে আমি যখন চার আনা দিলাম, তখন একটু মুচকে হেসেই নিয়ে নিলে।

যোশী মঠ থেকে পাণ্ডুকেশ্বরের দিকে খানিক এসে একটি সেতু দিয়ে গঙ্গা পার হতে হয়, তার পরই একটি বনপথ পাওয়া যায়, কয়েকটি তীর্থ এই পথে আছে যা দেখার সুযোগ ছাড়তে নেই। ভিউন্দর গঙ্গার কাছেই সরু চড়াই পথ, কাছেই গঙ্গা থাকে নীচে। প্রথমেই তিন মাইলের মাথায় পুণ্য-তীর্থ নামে একটি তীর্থ,—তারপর আট মাইলের মাথায় ভিউন্দর স্নান তীর্থ, সেখান থেকে তিন মাইল গাঙ্গোরিয়া, শেষ হেম কুণ্ড ও লোক পাল তীর্থ। এই সব কয়টিই স্নানের তীর্থ, অবশ্য সাক্ষিগোপাল স্বরূপ একটি দুটি দেব মন্দিরও আছে, কোনটিতে শিব, কোনটি বিষ্ণু কোনটি গণেশ শেষের দিকে লোকপাল বিষ্ণুমূর্ত্তি জেঠা বলেন, যাবার দরকার কি, তবে জানা ভালো।

এই যোশীমঠ তীর্থের শেষ কথা এই যে, কতদিন থেকে শুনে আসচি,—ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শেষ জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত; আর স্থানটির বাহ্য সৌন্দর্য্যও যত অধ্যাত্ম মাধুর্য্য ও গুরুত্বও কম নয়। গঙ্গা অর্থে অলকনন্দার কতকটাই উপরের

স্তরে গ্রামখানি, তারপর চারিদিকেই পর্ব্বতমালা, উত্তরে চির তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে। গ্রামের অনেকেই প্রত্যহ নীচে স্নান করতে নামেন। এখানে সবাই প্রাতঃস্নান করে থাকেন, ব্রাহ্মণ, ছত্রী, বৈশ্য, সবাই,—শূদ্র নাই।

শিব মন্দির আরও দুটি দেখলাম পথে। এখান থেকে দুই মাইলের উৎরাই শেষে ধৌলী অথবা বিষ্ণু গঙ্গা অলকনন্দায় মিশেছে, এই সঙ্গমই বিষ্ণু-প্রয়াগ নামে খ্যাত। অতীব প্রাচীন এই তীর্থে আমরা স্নান করে নিলাম। বহু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত এই তীর্থ, আমি সে সকল কথা উত্থাপন করবো না, মাত্র যে কারণে সেটা এই যে, এখনকার দিনে আমরা তীর্থময় ভারতে তীর্থস্থানের গুরুত্বটি দৃশ্য-সৌন্দর্য্যেই চরিতার্থ করি। কারণ বাস্তববাদী আমরা বাস্তবক্ষেত্রে ঐ দৃশ্যের প্রসারতাই আমাদের আনন্দ দেয়,—তার সঙ্গে কাহিনীর সংযোগ চাই না, যিনি চান, তার তো অভাব নেই, সে সকল তাঁরা পর্য্যাপ্ত পাবেন তীর্থে অনুসন্ধান করলে। আমরা এই তীর্থ স্থানে, নানা তীর্থযাত্রীর কোলাহলের ভিতর দিয়ে,—স্তব, স্তুতি, মিনতি প্রণতি এবং ভক্তির কোলাহল পেরিয়ে মহানন্দে ধৌলীর ঠিক কোল দিয়েই চললাম কতক পথ। তখন কোলে কোলেই আমরা গিয়েছিলাম তবে এখন নিশ্চয়ই সে পথ উন্নত হয়েছে। আসলে কিছুদিন পূর্ব্বে একটা বড় রকমের ধস নেমে পথ বলতে কিছুই রাখেনি কতকটা জলের উপর আর কতক জলের ধারে নোড়নুড়ির উপর দিয়ে, আবার স্রোতের ধারে এক এক স্থানে পাষাণস্তূপ তারই উপর দিয়েই চলেছি। এই পথ চলতে ভগবান জানেন মনে স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ ছাড়া পথের অসুবিধার কথা একটিবারও মনে উদয় হয়নি। যে অপূর্ব্ব প্রকৃতির লীলাভূমির মধ্য দিয়ে আমরা চলছিলাম, পাঠককে একবার এখানে আনতে পারলে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে কি আনন্দে চলে ছিলাম এই বিশৃঙ্খল পথে। পাশেই এক পর্ব্বত থেকে ঝরণা নেমেছে, জল কোথাও বৃষ্টিধারার মত আবার কোথাও ইলসে গুড়ির মত বাতাসে বহুদূরেই ছড়িয়ে পড়চে, আবার মাঝে মাঝে স্নানের ফলও পেয়েচি সহস্র ধারার জলে। কত কতই যে দৃশ্যের বৈচিত্র্য এপথে তা বলবার নয়। এখানে স্থানে স্থানে মার্ব্বল-রক্, ঠিক জব্বলপুরের নর্ম্মদার যেমন দুদিকে মর্ম্মর পর্ব্বত অথবা স্তূপের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে, অলকনন্দাও সেই রকমই দুদিকে পর্ব্বত স্তরের মাঝ দিয়ে দুর্দ্দান্ত গতিতে চলেছে নীচের দিকে। হিমালয়ের এই অংশে শুভ্র মর্ম্মর স্তূপ আরও চমৎকার। চক্ষু ফেরানো যায়না, একথা সত্যই একবার জেঠার ধমকানীও খেয়েছিলাম। সে বুঝতেই পারেনি আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে কি অপরূপ বস্তুই দেখছি। স্রোতের দুদিকেই কতরকমের রং এই পাথরের, যেন জীবন্ত একটি রং-এর রাজ্য। রত্নগর্ভ হিমালয়ের মাত্র অল্প ঐশ্বর্য্যের সঙ্গেই আমরা পরিচিত, আরও কত কত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য গুহ্য রয়েছে মানব চক্ষে। দুর্দ্দান্ত এই

প্রবাহিনীর দুই দিকেই কত কত রং-এর খেলা দেখতে দেখতে চলেছি আমরা,—যথার্থ প্রত্যেক বাঁকের মুখেই, কেমন ক্রমে ক্রমে উপরদিকেই উঠছি সেই পথের সঙ্গে অলকনন্দাই আমাদের তা জানিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছে-ছিলাম। কিছুক্ষণ মাত্র বিশ্রামের পরই আবার চলতে আরম্ভ করতে হোলো কারণ আগেই বোলেছি, আজ পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছাতেই হবে।

বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে, এই সকল অপরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চারটি মাইল অতিক্রম করে ঘাট চটিতে আমরা এসে উঠলাম। ঘাট, বলতে একটি ছোট চটি। এ বেলার মত এইখানেই বিশ্রাম করা যাবে বোলে ঠিক ছিল মনে, কিন্তু এই যে আমার গাইড বা মুরুব্বি জেঠা, তিনি বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বুঝিয়ে দিলেন আজিকার আমাদের মোটে আর ছ'মাইল মাত্র বাকী তখন আর এখানে কালক্ষয় করবার দরকার কি? কাজেই অম্লান বদনে আমায় চলতে হোলো। এক মাত্র চড়াই, তা হোক বাকী পথ অসহ্য মত এমন কিছু নয়,—সুতরাং নানা পথ বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আমরা সশরীরে এসে সব চড়াই শেষে যখন পাণ্ডুকেশ্বরে এসে মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়ালাম তখন মনে হোলো ধন্য হোলো আমাদের হিমালয় আসা আর সার্থক আমার জন্ম ও জীবন। এখানে অনেকগুলি মন্দির। পাহাড়ের কোলে গ্রামখানি, অতীব প্রাচীন এই গ্রাম, আর গ্রামের কোলেই অলকনন্দা স্বর্গের মহিমা প্রচার করতে চলেছে ধরা পানে। বদরীনারায়ণ ফেরত অনেকগুলি যাত্রীর সঙ্গে দেখা হোলো। তার মধ্যে বাঙ্গালীও কম নয়, বিশেষতঃ দুটি পক্ককেশ বুড়ো বুড়ি কাণ্ডিতে তীর্থ সম্পূর্ণ করে এসেছেন। তাঁরা শ্রীরামপুরের,—গন্ধ বণিক, ব্যবসায়ী, ধর্মাত্মা,—জীবনের এই একটি সাধ পূর্ণ হোলো। তিনি বড়ই সরল ভাবেই কথা প্রসঙ্গে বোলে ফেললেন আরও একটি সাধ আছে,—বাবা বিশ্বনাথের ধামে এই মাটির খোলোসটা ছাড়বো। কি অপূর্ব্ব উৎসাহ তাঁর চক্ষে। ভিউন্দর গঙ্গার সঙ্গে অলকনন্দার সঙ্গমের কাছেই পাণ্ডুকেশ্বর।

যোগ বদরীর দেউলটি অতীব প্রাচীন। মন্দির দেখলেই যেন পুরাণের কালটি আমাদের সামনে আসে;—তারপর অলকনন্দা তটে এই পাণ্ডুকেশ্বর,—আমাদের সেই পুরাণের ভাবকে প্রাণবন্ত করে দিলে। পঞ্চ প্রয়াগ, পঞ্চ কেদার, আর পঞ্চ বদরী। তার মধ্যে দেব প্রয়াগ প্রথম বলেছি, রুদ্রপ্রয়াগ দ্বিতীয় প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ হল তৃতীয়, নন্দ প্রয়াগ চতুর্থ আর বিষ্ণু প্রয়াগ হোলো পঞ্চম। কেদারের কথা আগেই বলেছি আমাদের তা হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখনও দুটি প্রয়াগ বাকী তা ফেরবার পথে হবে। তবে বদরীর প্রথম বদরীনারায়ণ যার উদ্দেশ্যেই আমরা চলেছি,—তারপর দ্বিতীয়টি এই পাণ্ডুকেশ্বরের যোগবদরী, তারপর অনিমঠে, বা কুমার চটির নীচেই হল ধ্যান বদরী তৃতীয় বদরী, কর্ণ প্রয়াগ থেকে রাম নগরের পথে আদ বদরী, চতুর্থ বদরী, আর যোশী মঠ থেকে

আট মাইল দূরে তপোবনে ভবিষ্য বদরী, এই পঞ্চ বদরী। এই তিনটি পঞ্চ, পঞ্চ, পঞ্চ, কেদার, বদরী আর প্রয়াগই হোলো আসল, বাকী সব পথের পাশের দেবতা, ভক্তি করতে হয় করো না হয় না করো,—তাতে হিমালয়স্থ তীর্থ দেবগণের দরবারে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ঐ তিনটি,—পাঁচ দুগুনে দশটি তুষার শিখর আর পাঁচটি হিমজলে স্নানই

হিমালয়ের প্রধান তীর্থ। তারপরের স্নান, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, মন্দাকিনী ও অলকনন্দোত্তরী দিয়ে যত যত জল বয়ে যাচ্ছে স্নানের পর স্নান করতে করতে নেমে হরিদ্বারে এসে যাও, আর কোন জন্মের পাপক্ষয় হতে বাকী থাকবে না, আর কত কোটি পূর্ব্ব-জন্মের সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে তখন হয়তো পুণ্যের পুঁজী এতটা বেড়ে

যাবে যে আবার একট্রা পাপ করতে হবে অনেক জন্ম ধরে তার কারণ বিস্তর পুণ্য কর্ম্মের ক্রেডিট থাকবে গঙ্গাময় হিমালয়ের বহু সংখ্যক তীর্থে স্নানের ফলে।

পাণ্ডুকেশ্বরের মহিমা ভূমিতে এসে দাঁড়ালেই অনুভব করা যাবে বলেছি। এখানকার অধিবাসী সবাই সুন্দর, ইতর-ভদ্র পৃথক শ্রেণী নেই বোলেই আমার ধারণা হয়েছিল। এখানে এক নাপিতের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ ঘটেছিল মুণ্ডনের জন্য নয়, নখ কাটতে। তার কি জ্ঞান, সংসার, সমাজ, শাস্ত্র এবং লোক-চরিত্র জ্ঞান, ভেবে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। যেখানে হিন্দু-সমাজ সেখানে নাপিত থাকবেই, আর তার কর্ত্তব্যের প্রসার বহু দূর,—ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের অগতির গতি, শুচিতা রক্ষার এবং জন্ম বা জাতকর্ম্ম থেকে মৃতাশৌচান্ত পর্য্যন্তই বিস্তৃত। নরসুন্দরকে হিন্দুসমাজে পুরোহিতের নীচেই স্থান দিতে হয়। ঐ নরসুন্দরের কাছেই শুনলাম, পাণ্ডুকেশ্বরের সঙ্গে পাণ্ডুরাজার পৌরাণিক ইতিহাস জড়িত আছে। এইখানেই পাণ্ডু মহারাজ হিমালয়-বাস করেছিলেন; এইখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ। হস্তিনাপুর থেকে এসে ঐ পর্ব্বতের স্কন্ধদেশে দীর্ঘকাল শান্তিতে বাস এবং জীবন শেষও করেছিলেন। এইখানেই পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম। অলকনন্দার অপর পারে যে অত্যুচ্চ অভ্রভেদী দেখা যায় ঐ পর্ব্বতের উপরই তিনি মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন ঐখানেই তিনি মৈথুনাক্ত কিন্নর মিথুনের উপর বাণ প্রয়োগ করেন এবং কিন্নরীর অভিসম্পাতেই তাঁর জীবনের অন্তিমকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। এইখানেই তাঁর মৃত্যুও ঘটে, এইখানেই মাদ্রী সহমৃতা হয়েছিলেন। এই সব কাহিনী এই তীর্থের সঙ্গে জড়িত। তারপর ঐ পাণ্ডু মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শিব পূর্ব্বাপর পাণ্ডুকেশ্বরের নামে সেই কাল থেকেই চলে আসচে। স্থানের শান্তভাবটি আর এইখানে প্রকৃতির মূর্ত্তিটিও আপন ভুলায়। জীবন্ত ঐ বিশাল পর্ব্বতের কোলে প্রবাহিণী অলকনন্দার গতিবেগ এদিকে নিরাপদ পাহাড়ের আড়ালে থাকায় এখানকার অধিবাসীরা সুরক্ষিত। শান্তপ্রকৃতির মানুষ এরা অতীব নিষ্ঠাবান ধর্ম্ম, আচার ও অতিথীপরায়ণ।

তীর্থের ফল তো আছেই তা ছাড়া স্বাস্থ্যকর স্থান মাহাত্ম্যও আছে,—এখানকার এই শক্তিপূর্ণ জল বায়ুর গুণে প্রত্যেকেরই শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। বালকেরা পথে খেলা করচে, কি সুন্দর তাদের মূর্ত্তি যেন দেব বা ঋষীকুমার মনে হয়। প্রায়ই গৌরবর্ণ এখানকার লোক। তীর্থের এই পবিত্র হাওয়ায় পুষ্ট এদের পার্থিব উন্নতির মূল যে কোন জীবন-দ্বন্দ্ব—সেটা খুব কম, প্রাবল্যের লক্ষণই নেই। এই গ্রামের পাঠশালায় যেটুকু শিক্ষা, তার বেশী শিক্ষা পেতে হলে বহুদূর যেতে হবে। হিমালয়ের এই অঞ্চলে বিশেষতঃ অলকনন্দার উত্তর দিকে যে গৃহস্থ তাদের বিদ্যার্থীদের একমাত্র টিরী, শ্রীনগর আর পাউড়িতেই শিক্ষা নিতে যেতে হয়। সেখানে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত চলে। আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য লকনৌ, এলাহাবাদ, বেনারস ইত্যাদি বিদ্যার পীঠস্থান।

কেদারের পথেও দেখেছি সাধারণ পাঠশালা ব্যতীত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে কোন যোগই নাই। তবে প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে যেমন রুদ্রপ্রয়াগ, রামপুর, অগস্ত্যমুনী, গুপ্তকাশী, ফাটা পর্য্যন্ত আর এদিকে যোশীমঠ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যমটাই কম,—বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষার অভাব প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। এদিকের সাধারণতঃ লোকের চেষ্টা, যখন নিজে থেকেই নেই তখন পরদেশী সরকারের সাহায্যের আশা বা সম্ভাবনা কোথায়? তাই না উচ্চ-বর্ণের মধ্যেও নিরক্ষরতার প্রসার এখনও ভয়াবহ। ব্রাহ্মণ, ছত্রি এরাই কৃষক, বাহক পশুপালনের কাজ ছাড়া আর কোন কাজে লাগবে না এখানে? আমার সঙ্গে যে বাহক জেঠারাম, সে ব্রাহ্মণ-সন্তান আর অকাতরে শরীর-পাত করে দিন গুজরাণ করচে। ওতে আমাতে তফাৎ কোথা? খুব কমই পার্থক্য দেখেচি,—কেবল আমি সমতলবাসী, পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কতকটা বিদ্যালাভ করেছি যা ওর সুযোগ হয়নি লাভ করবার,—কারণ তারা সুদূর পর্ব্বতে জন্মেচে, এবং থাকে এমন স্থানে যেখানে আধুনিক বিদ্যা প্রবেশ করেনি; বাকি সহজ জ্ঞান-বুদ্ধি, সৎভাব, ন্যায়ান্যায় বিচারে সে কোন অংশেই কম নয়, বরং সহজাত ভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতি সৎভাব-প্রবণতা সাত্ত্বিকভাবে সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে পরিচয় তো অনেকভাবেই পেয়েছি। তবে এটাও ঠিক এখানকার ব্রাহ্মণ বংশের বাচ্ছারাই রাজ সরকারে উচ্চ উচ্চ বিভাগে নিযুক্ত আর গাড়োয়াল রাজ্যে গ্রাজুয়েট গত বৎসরে ছিল জন পঁচিশের মধ্যে। যিনি পাশ করবেন তার চাকরী'র দরখাস্ত ছাড়া অন্য বৃত্তিও নেই।

তবুও বলতে হবে যুগের হাওয়া এদের গায়ে লাগেনি, পবিত্র ভূমিই এদের রক্ষা করে এসেছে। কেদারনাথ বা বদরীনারায়ণ অথবা হিমালয়ের মধ্যাঞ্চলের কোন স্থানই জনবহুল নয়, কাজেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম্ম-তৎপরতা, জীবনযাত্রার যত প্রকারের ছন্দ দ্বন্দ্ব ও সহজ অর্থাগমের উদ্ভাবনা এ ভূমিতে ক্রিয়াশীল হতে পায়নি বটে কিন্তু তার প্রভাব অনেক স্থানেই অনুভূত হয়। বৃটিশ অধিকারের মধ্যে যত যত পার্ব্বত্য সহর গড়ে উঠেছে পূর্ব্বে দার্জ্জিলীং থেকে বরাবর আলমোড়া নৈনীতাল মুসৌরী সিমলা ল্যানসডাউন ডেলহাউসী জাম্মু শ্রীনগর এ সকল সহরের প্রভাব পল্লি-অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় কিন্তু তা সত্বেও আমাদের পুরানো সমাজের রীতিনীতি বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। এদের মধ্যে শ্রমপটুতা এবং কর্ম্ম শক্তি বেশীর ভাগ বাহকের কাজেই ব্যয় হয় কারণ সুস্থ শরীর থাকলে ঐ শ্রমটাই সুলভ, যেহেতু চাষ-আবাদ বা পশুপালন প্রভৃতি জমি এবং পশু না থাকলে হবে কি করে? যার জমি নেই সেইই পরের জমীতে মজুরী করবে। কাজেই মজুর হয়ে মোট বওয়াটাই সুস্থ শরীরের পক্ষে সুলভ অন্ন। তারপর পাহাড়ের উপর ডাণ্ডি, কাণ্ডি, রিকস্ ঝাঁপান বাহক এসবই এই বাহক-

শ্রেণীর। কিন্তু যুগের আবহাওয়ার প্রভাব ছাড়িয়ে যাবে কোথা? উন্নত সমাজের অনেকের মধ্যে যা হচ্ছে তাইতে বুঝা যায় এরা যুগ প্রয়োজনকে স্বীকার করে এবং তাকে নিজেদের জীবনে ধরে নিতে আর বিশেষ দেরী হবেনা। কারণ, জেঠাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, জেঠা তোমার ছেলে কয়টি। সে বলে তিনটি, বড়টি খেতিবাড়ি করে, মেজটি শ্রীনগরের কাছেই পাউড়িতে ডেপুটি কালেকটারীর অফিসে ষাট টাকা পায় কেরানী, আর ছোটটি সতোরো আঠারো বছর টীরীতে মহারাজার স্কুলে পড়ে, আসচে বছর পাশ দেবে। এখন এ সমাজের কথায় আর কাজ নেই পথের কথা যেটুকু আছে বোলে পাণ্ডুকেশ্বরের কথা শেষ করে নি।

চড়াই পথে কাল আমাদের ভূর্জ্ ভবনের মধ্য দিয়ে আসতে হোয়েছিল। আমরা এই ভূর্জ্পত্র কি পবিত্র চক্ষে দেখি বাঙ্গালায়, সেই ভূর্জগাছ এপথে অজস্র। দেখতে সুন্দর সাদা, চক্চক্ করচে তার ডালপালা, গুঁড়ি। খুবই হালকা কাঠ, ওর ছাল, পরতে পরতে সুন্দর খুলতে থাকে। হাওয়া লাগলেই লাল হতে আরম্ভ করে না হলে সদ্য ছাড়ালে সাদা থাকে। উচ্চস্তরের হিমালয়ের এই অঞ্চলে এই ভূর্জগাছই খুব বেশী, ইংরাজী নাম বার্চ্চ। তা বোলে দার্জ্জিলীং-এর বার্চ্চহিলে এ বার্চ্চ নেই, সুধুই নামমাত্র সার। যে ভূর্জ্জীপত্তর আমরা পূজাপাঠ ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহার করি, তার জন্ম এখানেই। এখানে বন এক একটা ভূর্জগাছে পূর্ণ। শুনেছি নেপাল থেকেই ওসব কলকাতায় আসে।

যাই হোক যাবার আগে ভাল করে দেখলাম এই গ্রামখানি ভারি সুন্দর লাগলো। অধিবাসীরাও সুন্দর আর্য্যমূর্ত্তি। তবে বেশীর ভাগ যেন সবাই গোঁফের পক্ষপাতি। দাড়ি কম। নারীরা শ্রমপটু এবং সুশ্রী। এখানে দোকানপাটও যথেষ্ট। দুধকি পেঁড়া আর উৎকৃষ্ট দহি যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা ছাড়া বানিয়ার দোকান, নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই মেলে। আসলে এখানে অন্ন ও বস্ত্র ব্যতীত আর কারো কিছু দরকারই নেই। তবে এখানে ভেসজ সংগ্রহশালা একটি আছে যেমন কেদারের পথে অগস্ত্যমুনীতে দেখেছিলাম। পথের মধ্যেই এইভাবে নানা বিচিত্র গাছপালা, না দেখে যখন চলে যেতে পারিনা, জেঠা মশাইয়ের তাড়ায়, একটু অন্ততঃ দাঁড়িয়ে খানিক দেখে তারপর চলতে থাকি।

পাণ্ডুকেশ্বরে যথার্থ সুন্দর যোগ বদরীর মন্দিরটি; তারপর গঙ্গা তীরে যে দুটি মন্দির খুব কাছাকাছি বলেছি ভিতরে দেবতা দেখার বেলা দেখা গেল একটি সোনা ও রূপার মুখোশ আর নরনারী অথবা দেবদেবী ভেদে বস্ত্র-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য। ফুলের মালা এখানে দুর্লভ পদার্থ তাই শোলার উপর নানাবর্ণে রঞ্জিত পুষ্পমালার প্রতিকৃতি। তা ছাড়া পুঁথির মালা রত্নমালার স্থানে এতো হামেশাই দেখি। মন্দিরের উপর সবদিক ঢাকা চতুষ্কোণ ছত্র এ যেন মধ্য হিমালয়ের প্রসিদ্ধ সর্ব্বস্থানেরই বৈশিষ্ট্য। এ সকল

নেপালেরই প্রভাব। না হলে মন্দিরের সাধারণ কাটামোটা তাহা উড়িষ্যার, পুরী ভুবনেশ্বরের ছাঁচ দেখলেই বুঝা যায়। কেবল উপরের দিকেই ঐ ধরণের চতুষ্কোণ ছত্র। শীর্ষে উপরি উপরি ক্রমান্বয়ে ছোট তিনটি কলসের উপর পতাকা-সংযুক্ত দণ্ড। ভিতরে যেতে হবেনা কারণ অন্ধকার। দীপের আলো আছে, অগ্নিকুণ্ডও আছে কিন্তু সেখানে দেবতা নেই। সব জায়গায় দেখেছি দেবতাকে দেখতে পাওয়া যায় মন্দিরের বাইরে এসে।

হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম থেকেই আর্য্য মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল,—যা মুষলদের আবির্ভাবের পর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর শেষদিকে হিন্দু রাজ্যের শক্তি যতই ছিন্ন ভিন্ন হোক এখনও সারা হিমালয়ব্যাপী বিশাল কাশ্মীর থেকে আসাম পর্য্যন্ত সকল স্থানই হিন্দু অধিকার এই সত্যই প্রতিপন্ন করে নাকি যে যখন সময় ছিল তখন সমতল ভূমিতে স্থাপিত রাজ বা সমাজের তুলনায় হিমালয়ের সর্ব্বস্থানেই এই আর্য্য বা হিন্দু সভ্যতা এতটাই সর্ব্বদিকেই প্রভাবশালী ছিল যাতে সমতলবাসীগণ, হিমালয়ের সর্ব্বস্থান স্বর্গের দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। যার শেষ প্রমাণ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা, শেষ পুণ্যাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। তবে সেটা এপথে নয়—কেদারের পথে।

যাই হোক পাণ্ডুকেশ্বরে এই ভাবে আমাদের নির্দ্ধারিত দিন ও রাত্র কাটলো পরদিন আমরা লম্বগ্রহ যাত্রা করলাম।

সাধারণতঃ বলে লামবাগড়া। ওখান থেকে যাত্রা করেছিলাম গঙ্গাতীরে তীরে। পথ বোলেতো আলাদা ব্যবস্থা নেই কিন্তু তার অভাবও নেই। আমরা যে অলকনন্দার ধারা ধরে তাঁর উৎপত্তি স্থানের দিকে চলেছি আর, নদীর তীরের পথ যে ক্রমান্বয়ে উঁচু দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে সেটা একবার আমাদের ডানদিকে চাইলেই স্পষ্টই ধারণা করিয়ে দিচ্চে। উপর থেকে নামার বেগ ক্রমে বেড়েই চলেছে যতই আমরা উপর দিকে চলেছি ততই সেটা অনুভব করচি তার দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি ও গতিবেগ দেখে। আরও উপরে খানিক মাটির পরশ আছে তার প্রমাণ জলের রং আর স্বচ্ছনীল নেই। এই মাটির পরশ অপর কোন মলিন শাখা নির্ঝরিনীর ধারার সঙ্গে মিলনের ফলেও হতে পারে। আসলে পাণ্ডুকেশ্বর থেকে লম্বগ্রহ যে তিন মাইল পথ এটা সহজ সরল মনে হয় আরম্ভ থেকে, কিন্তু এ পথটার আগাপাশতলা চড়াই। এর হিসাব একটা সরল অঙ্কে করা যায়। ধরা যাক যেমন পুলের উপর উঠেছে যে রেলের রাস্তা, সেটাকে নীচে সমতল থেকে পঞ্চাশ কিম্বা ষাট ফুটে এক ফুট চড়াই, এই হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েচে, এ রাস্তাও সেইরকম কেবল প্রকৃতির গড়া, সুতরাং তার এনজিনীয়ারীং এর মধ্যে প্রবেশ আমরা না করতে পারি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে মোটামুটি হিসাব করে নিতে পারি।

এইভাবেই পথটির চড়াইকে প্রকৃতি আশ্চর্য্য রকম সরল করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন আমরা লম্বগ্রহ পৌছে গেলাম সেই সঙ্গে পাণ্ডুকেশ্বরের ভূমিতল থেকে খুব কম করে আর পাঁচ শো ফুট উঠেও এলাম। কিন্তু হনুমান পৌছাবার চার মাইল পথ আর হনুমান থেকে বদরীতে পৌছাবার সাড়ে তিন সেখানে মা জগদম্বা নিজের এনজিনীয়ারীং যা কিছু দেখিয়ে সরে পড়েছেন, পশ্চাৎ ক্ষেত্রে মানুষ যাত্রীদের উপর সর্ব্ববিধ শক্তি ও বুদ্ধির খেলা দেখবার সম্পূর্ণ দায়ীত্ব অর্পণ করে। এখন সে কথায় কাজ নেই যথা সময়ে বলাই ভালো, অবশ্য এতে ভয়ের কিছু নেই।

এই লম্বগ্রহ একটি ক্ষুদ্র চটি বা পড়াও। এখানে বিশেষ কিছুই নেই, ছোট্ট একখানি গ্রাম, অধিবাসীরা এখানকার সামান্য চাষবাসের উপরেই নির্ভর করে,—যাত্রী দুচার জন যদি যায় তাদের, সেবার জন্যে একটু গুড়, একটু দুধ, সামান্য এক আধসের আটা বড় জোর একটু ঘী দিতে পারে। কিন্তু ডাক পিয়নের আড্ডা ছাড়া এখানে আশ্রয় নেবার অন্য স্থানও নাই। সরকারী ডাক, নীচে পাণ্ডুকেশ্বর হয়ে একজন পিয়ন এখানে নিয়ে আসে, তেমনি আবার উপরের ডাক বদরী থেকে হনুমান হয়ে পিয়ন একজন নিয়ে আসে, তারপর নিচের ডাক উপরের দিকে আর উপরের ডাক নিচে চলে যায়। যাই হোক আমরা এই স্তরের স্বর্গে ক্রমে যতই উঠছিলাম, ততই নিজেকে ভুলে যাচ্ছিলাম এই সুন্দর ও অপরূপ স্থান মাহাত্ম্যে। আরও একথাটা না বোলে থাকা যাবে না তাই চেষ্টা করছি কিন্তু ভাষার অভাবেই প্রাণের কথাটা বলতে কতকও পারছি না। যতই আমরা

বদরী বিশালের নিকটবর্ত্তী হতে চলেছিলাম ততই কি আশ্চর্য্য দৃশ্য যে আমাদের দৃষ্টির উপর এসে পড়ছিল তা বোলতে যাওয়াই দুষ্কর তপস্যা। তখন এই ইচ্ছাই প্রবল ভাবে মনকে পীড়ন করছিল, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব যে যেখানে আছে সবাইকে এনে দেখাই—ইতিমধ্যে আমি একবার, জয় জগদীশ হরে, বোলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। জেঠা ভাবলে আমি চড়াই উঠতে উঠতে বুঝি পাগল হয়ে গেলাম। উচ্চ স্তরের এই ধীর চড়াই পথে, নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে যেতে আজ খানিকটা পথের বেশ বৈচিত্র্য দেখা গেল। প্রবাহিনী গভীর খাতেই বয়ে চলেছিলেন, পথ থেকে অনেকটা নীচে, তাই আমাদেরও বন্ধুর পথে নামতে হোলো। নেমে এক প্রাচীন ঝুলা পুলের কাছে এসে পড়লাম। ইনি আমাদের পুরাতন লছমন ঝোলার নবীন বৈমাত্র ভাই। দেখেও আনন্দ হয় প্রাণে পারাপারের কি সরল উপায়। পূর্ব্বকালে সারা হিমালয়েই এই ভাবের ঝোলাই কাজ চালিয়ে এসেছে সর্ব্বপ্রকার যাত্রীদের। তাতে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে ঘনঘন দুর্ঘটনাই ঘটতো। সে কথাটা, আধুনিক ব্যয়সাধ্য এনজিনীয়ারীং এর ফলে স্থানে স্থানে লৌহ সেতু প্রতিষ্ঠার পর বৃটিশ সরকার প্রচার করেছিল যে, এই দেখো, তোমাদের বর্ব্বর প্রথার ভয়াবহ পরিণাম থেকে আমরা বাঁচিয়েছি। আবার ষ্ট্যাটিসটিকস রচনা করে দেখিয়েও দেওয়া হোলো বৎসরে এতগুলি মানুষ এই ঝোলা পুল থেকে দড়ি ছিঁড়ে নদীতে পড়ে প্রাণ হারাতো। অর্থাৎ এখনকার এনজিনীয়ারীং এমনই কৌশল পূর্ণ, স্থায়ী সেতুর প্রতিষ্ঠায় আর কোন দুর্ঘটনাই ঘটে না। যাই হোক দেখলাম, এই দুজোড়া মোটা কাচির পুল, রচনা, পদ্ধতি মডার্ণ আর এনসিয়াণ্ট দুই কালের পার্থক্য কিন্তু ক্ষেত্রে একই দেখলাম। কেবল ধাতু আর উদ্ভিদের উপাদান গত যা পার্থক্য। পায়ে পায়ে চলার নাচনের সঙ্গে নাচতে নাচতে আমরা পুল পার হয়ে গেলাম। দেড় দু মন বোঝা সহজেই পারাপার করতে পারে, আর আবহমান কাল থেকে করেও আসছে, কাজেই ভয়ের কিছুই পাইনি বরং পুরাতন কীর্ত্তির নমুনা এই ব্রীজের উপর দিয়ে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চলতে চলতে এবং আনন্দে উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম,—কি চমৎকার পথের সেতু আমরা অতিক্রম করলাম হিমালয়ের এতটা উচ্চ স্তরে। এভাবের পুল এবং এর চেয়ে সহজ রচনায় কালী নদীতে পারাপার করতে কুমায়ুঁ সীমান্তে প্রয়োজনের গুঢ় তাগিদের ফলে আবিষ্কারের ব্যাপার হিমালয়ের অন্যান্য স্থানেও দেখেছিলাম; সেটা অনেক পরে অবশ্য।

এর পর খানিকটা লাঠি মার্কা চড়াইয়ের অধিকারে এসে পড়লাম। এই লাঠিমার্কা চড়াই এ পথে মাত্র এই লম্বগ্রহ থেকে হনুমান, আর সেখান থেকে বদরী বিশালের শেষটুকুই। তারপর আর এ পথে কোথাও নেই। একটি লাঠি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলে যেমন হেলে থাকে চড়াইটি সেই রকম। তাই ঐ কঠিন চড়াইয়ের

নাম লাঠি মার্কা। সেতুবন্ধ পেরিয়ে একটু দম নিয়ে চড়াইটুকু কাবার করা গেল। কষ্টটা মক্ষমই হোলো জেঠামশায়ের। এই চার মাইলের শেষটুকুই একটু কষ্টকর তথা দণ্ডবৎ চড়াই ছিল। এ চড়াই ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে সৃষ্টি। ঐ ভাবে, হয় বজ্রাঘাতে না হয় পর্য্যুপরি ধস নেমেই স্থানে স্থানে দুরারোহ করে তুলেছে। যাই হোক এবার হনুমান চটিতে পৌছে বুঝলাম অলকনন্দার গতি ধরে কতটা উপরে এসে উঠেছি আমরা। সুতরাং অহো ভাগ্য।

সেই বৈকালে আজ আমরা পবনন্দনের অধিকারে এসে দেখলাম আর সেই দেখাতেই বুঝে নিলাম যে, বাপে বেটায় মিলে কি হাল করেছে আমাদের স্বর্গের অলকনন্দার। বরাবরই দেখে এসেছি ছোট হোক, বড় হোক সারা পথটা সেই হৃষীকেশ, বা লছমনঝুলা থেকে গঙ্গা, ভাগিরথী, অলকনন্দা একই খাতে প্রবাহিত হয়ে আসছেন বা নামছেন, দুদিকে দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে কোথাও বিস্তৃত কোথাও সরু। যেখানে সরু দেখেছি সেখানে দুই পাশের পর্ব্বতের মধ্যস্থানটি সঙ্কীর্ণ বোলে,—কিন্তু এখানে দেখছি সে প্রবাহিনীকে উন্মাদ করে ছেড়েছে। হনুমানের নীচে এ প্রবাহ আর এক ধারায় নেই, পাহাড় ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দুর্দ্দান্ত গতিতে শতমুখী হয়ে অলকনন্দা যেন রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছেন নীচের দিকে। কি আকুল গর্জ্জন তার, ঐদিকে লক্ষ্য করে একটু দাঁড়ালেই সমাধিস্থ হতে হবে, হে পথিক! যতই চঞ্চল হোক না তোমার প্রকৃতি।

হনুমান চটি হোলো শেষ চটি, এইখান থেকে যে চড়াইটুকু সেইটি অতিক্রম করলেই একেবারেই নারায়ণের প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছানো যাবে। আজ যেটুকু শ্রম হয়েছে তাই সার্থক করে রইলাম হনুমান চটিতে। একে আনন্দে ছটফট করছি কাল, আগামীকাল বেলা নয়টার মধ্যেই আমাদের সকল পথশ্রম সার্থক করে ইষ্ট মন্দিরে উপস্থিত হতে পারবো, এ আনন্দ রাখবার স্থান কোথা? জায়গা খানিক করে নেওয়া গেল অন্তর ক্ষেত্রে। এমনই সময় একটা বড় দল এসে নীচে পৌছে গেল, মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে বদরী নারায়ণ ক্ষেত্র ত্যাগ করেছে তারা। তাদের দর্শন মাত্রই এমনই একটা রব উঠলো, জয় বদরী বিশাল কি জয় বোলে যে, আমি চমকে উঠলাম যদিও আমারও ইচ্ছা ছিল ওদের সঙ্গে গলা মেলাই।

হনুমানে অনেক স্থান, চটিও যত ধর্ম্মশালাও ততই, বিশেষতঃ কালী কমলীওয়ালার দুটি ধর্ম্মশালা আছে, প্রশস্ত, সকল প্রকার সুখ এবং স্বচ্ছন্দে থাকা যায় এমনই ব্যবস্থা প্রত্যেকটিতে। খাদ্যদ্রব্য সব কিছুই পাওয়া যায়, এক দুধটা একটু দুষ্প্রাপ্য। হনুমানের মন্দিরই এখানকার প্রধান, তাছাড়া অন্য মন্দিরও আছে। কিন্তু প্রথমেই নজরে পড়ে এই বিশাল হনুমানজীরই মন্দির। তার পাশে দ্বিতল, পাথরের বার‍্যাকটি সব চেয়ে বড় ধর্ম্মশালা এবং বেশী লোকের লক্ষ্য স্থল। এই পার্ব্বত্য গ্রাম হনুমানের বেশ অনেকটা

নীচেই স্রোত, দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ নিয়ে হনুমান গঙ্গা এসে অলকনন্দায় মিলেছেন। তা মিলুন কিন্তু সেই মিলনটা দেখবার জিনিস,—সেই মিলনোৎসাহে দুই পক্ষই বিষম উন্মাদনায় চঞ্চল। যতগুলি প্রয়াগ বা মিলন বা সঙ্গম দেখেছি এই হনুমানের সঙ্গে

অলকনন্দার সঙ্গমের মত জীবন্ত, প্রাণশক্তিতে চঞ্চল মিলন আর কোথাও দেখবো না। এখান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে হনুমানের সঙ্গে ক্ষীরাওয়ান গঙ্গার আর একটি সঙ্গম আছে।

এখানে যতগুলি যাত্রী ছিল, আবার যতগুলি এলো, সবই দেখছি মুক্তির আনন্দে

চঞ্চল,—যেন সর্ব্বার্থ সিদ্ধির আয়ত্তাধীন ফলটা সবাইকে চঞ্চল করে তুলেছে, নীচেকার ঐ সঙ্গমের মতই। জয়, জয়, জয়, শত সহস্র জয়, পরমাত্মার জয়, সংসারের এতটা বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যেও তাঁর কৃপাকাঙ্ক্ষী, এতোগুলি মুগ্ধ দর্শনাকাঙ্ক্ষী সংসার কীটদের এই সুযোগে ঘর ছেড়ে এতটা দূরে এসে এত প্রকার সঙ্গ, এত রকমের দৃশ্য, এত প্রকারের বিভিন্ন প্রাণে আনন্দ লক্ষ্য করে যিনি মিলনের সুযোগ দিয়েছেন;—যার ফল প্রত্যেকের জীবনে অন্ততঃপক্ষে কিছু সল্প কালও মহৎ ফল দেবে, শুভ, কল্যাণ দেবেই, এখানে তাঁর জয় ছাড়া আর কার জয় গাইব?

শীত ছিল খুব। কিন্তু যতক্ষণ বেলা ছিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খোলা হলেও যতক্ষণ দিনমনি আলোটুকু ছড়িয়ে সবার চক্ষের সামনে সবার মূর্ত্তি দেখার সুযোগ দিয়ে ছিলেন, নিকট, দূর, এই স্থানের দৃশ্যের প্রভাব সবার প্রাণে আনন্দের বিহ্বলতা এনে সবাইকে একই স্পন্দনে নাচাতে পারছিল, ততক্ষণ বোধ হয় কেউ ভিতরে যায়নি। দোকানে দোকানে মাল, যার যেভাবের জিনিস দরকার সেই সব সংগ্রহের অবকাশে কেউ একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে তবে ছেড়েছিল। যেই অন্ধকার হয়ে এলো, পথের ল্যাম্পপোষ্টও জ্বলে উঠলো সবাই তখন ভিতরে ঢুকে ঘরের দ্বার দিতে তৎপর হয়ে উঠলো, এদিকে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল।

আহারাদির পর সবাই কম্বল, লেপ মুড়ি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। লেপের কথাটা মিথ্যা বা কল্পনা নয়, আমি একাধিক যাত্রীকে লেপ ব্যবহার করতে দেখেছি, আর সে রাত্রে আপাদ মস্তক কম্বল মুড়ি দিতে বিলম্ব সইছেনা। অনেকে বাজারের খাবার দিয়ে চালালে, কম লোকেই রাঁধলে, বাঙালীদের দলে একজন গরম জলে, আটা গুলে গুড় দিয়ে সিন্নির মত মিশিয়ে লেহনেই তৃপ্ত হলো।

১৮

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ ধাম—৩॥ মাইল

যাঁরা বদরীকাশ্রমে আসবেন অনেকেরই এই লম্বগ্রহ থেকে হনুমান চার মাইল, আর হনুমান থেকে সাড়ে তিন মাইল, এই দুটি পথের কথা, বিশেষতঃ হনুমান থেকে বদরী নারায়ণের পথের কথা কখনও ভুলতে পারবেন না।

আমরা গত পাঁচটি সপ্তাহের মধ্যে যতগুলি চড়াই উত্তীর্ণ হয়েছি, কষ্টকর বন্ধুরতায় হনুমান থেকে বদরীর পথে চড়াই সবার উপর। পথের সঙ্কটময় অবস্থাটা আছে মাঝামাঝি। বড়ই সাবধানে চলতে হয়। চলার আগে সেই সকল স্থানে অত্যন্ত সাবধানে পা বাড়াতে হয়। তোমার হাতের লাঠি, যা এতদিন অবলীলাক্রমে যথেচ্ছা অলসভাবে

ব্যবহার করে এসেছ এখন তাকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে হবে সংযত হয়ে, তাকে ঠেকাতে হবে সংযত হয়ে, কোনপ্রকারে সংযমের অভাবই তোমার বিপদ এনে দিতে পারে। ঐ পথ দিয়ে চড়ার সময়ে যে কঠিন সংযমের, তপস্যা, যখন এই পথে নামতে হবে তখনও অতই কঠিন সংযমের অধিকারী হয়েই নামতে হবে, অন্যান্য সহজ উৎরাই পথের মত অবলীলাক্রমে নামা চলবেনা। আসল কথা এই যে, সাধারণ চড়াই পথের মধ্যে কতকটা অসাধারণ চড়াই আছে, স্থান বিশেষে এমন সব অবস্থার উপর নির্ভর করে চলতে হয় যাতে, যাঁরা একটু দুর্ব্বল চিত্ত লোক তাদের প্রাণে একটু ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা প্রায় বাইশ থেকে পঁচিশ জন হনুমান থেকে ভোর বেলা যাত্রা করি,—সকলকার উপর সবারই নজর কখনই থাকতে পারে না, আরও দেখেছি পরস্পর একটা আন্তরিক সঙ্গ প্রিয় স্বভাবের জন্যও বটে তারই মধ্যে এক একটা ছোট ছোট দল হয়ে যায়,—সেই যোগাযোগের ফলে সহজেই আমরা চারজনে কাছাকাছি যাচ্ছিলাম তার মধ্যে সবই আমাদের বাঙ্গালী নয়, একজন খোট্টা ছিল। আমরা পর পর ঐ চারজনেই সারা পথটার কঠিন অংশ প্রায় একত্রই উত্তীর্ণ হয়েচি।

গোলাপের জঙ্গল, কোথাও ভাঙ্গ সিদ্ধির জঙ্গল, ছোট গাছের ঝুপিজঙ্গলও কিছু কিছু আছে। কঠিন, বন্ধুর, অত্যন্ত বিষম, সরু পথে কোথাও এক ফুটের বেশী, এক পায়ের পর আর এক পা ফেলে চলবার জায়গা নেই, এই ভাবের কতকটা অতিক্রম করবার পর যখন খানিকটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর স্থান দিয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া গেল, তখন আমরা এই চারজনের মধ্যে একটা সুন্দর প্রীতিময় দৃষ্টি বিনিময় করে নিলাম এবং তখনই প্রাণের মধ্যে একটু রহস্য পরিহাস প্রবৃত্তিটা আসাই স্বাভাবিক। একজন আরম্ভ করলে এই বোলে,—আজ আমাদের জীবন সার্থক হোলো, মানুষের মত মানুষ বোলে মনে হচ্চে নিজেদের। ঠিক তার পরে যে আছে, একটু টিপ্পনি কেটে সে বললে, কেন বলুন তো? সামনের দিকে চেয়ে আমি তখনই বললাম,—দেখছেন না? খোট্টা যাকে বোলেছি, সে বোললে, আমিও কিছু কিছু সমঝিয়েচি। এতটা পুণ্য আমাদের কি ছিল? এ সবই দেবতার কৃপা।

সে দৃশ্যটি আমি দেখলাম আর ওদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, সেটা সামনের তুষার ভূমি সংযুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত পথ যেটুক অংশ এখান থেকে দেখা যাচ্চে। দৃশ্য হিসাবে সুন্দর তো ছিলই তা ছাড়া সামনে যেতে প্রস্তুত হবার জন্যই বলেছিলাম। সর্ব্বশেষ চড়াই উঠে সেখানে দেখলাম অবশ্য ঐ সকল কঠিন তুষার ভরা উঁচু নীচু ক্ষেত্রে, তারই মধ্যে মধ্যে, আবার আসেপাশে কি চমৎকার ফুলের ক্ষেত্র, নানা বর্ণের ফুল তার রূপরেখা গভীর অধ্যাসের বিষয় বস্তু। বড় বড় গাছ আর নেই, দূরে পর্ব্বতের কোলে কোলে যেন গাঢ় সবুজের খানিক খানিক মাথার দিকটা। এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ

আমাদের বড় সহজে ঘটেনি, পথে সংযমে ও তপস্যায় যে মূল্য দিতে হয়েছে তা কম নয়। আমরা বেশ অনুভব, অন্তরে অন্তরে এইটি সংস্কারের মতই ধারণায় দৃঢ় হয়েছিলাম যে, বিনামূল্যে কোন দুর্লভ পদার্থের অধিকারী হওয়া এ ভুবনে কোথাও, কোন অবস্থায়, কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ পথেরও শেষ হোলো। যখন চড়াইয়ের সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমাদের বামে উত্তর দিকে ক্ষীণ কুয়াসার বিস্তৃত আবরণ, দূরে, বহু দূরে এক মায়াপুরী, যেন একখানি যবনিকার মতই চিত্রিত আমরা দেখলাম। সামনেই, অনেকটা নীচে একটি স্রোতের প্রশস্তধারা, তার উপরেই এক ক্ষীণ সেতুরেখা দেখা যায়, তারই পিছনে ঐ মায়াপুরী, প্রবাহিনীর উপর থেকেই যেন উঠেছে। কারণ ঐ দৈব নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে নর পর্ব্বত, আর পশ্চিমে, সুদূর পশ্চিম প্রান্তে নারায়ণ পর্ব্বতমালা, দুই পাশের দুটি বিশাল অভ্রভেদী, শৃঙ্গ তাদের চির তুষারে ঢাকা। সেই তুষার তুণ্ড হতে ধীর বিলম্বিত-লয়ে নেমে এসে ঐযে দুই দিকে বিশাল উপত্যকার সৃষ্টি করেছে, তারই মধ্যে দেখা যাচ্চে বিচিত্র ঐ মায়াপুর যেন মায়ের কোলে শিশুর মত,—তার তলেই গঙ্গা প্রবাহিতা। উপর দিকটা তার পিছনের পর্ব্বতের অঙ্গে মিশে গিয়েছে। কুয়াশা তার সবটাই লোপ করেনি, বরং খানিক আভাস রেখেছে। ক্রমে ক্রমেই সামনেই ফুটে উঠলো এক ঐযে বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখায় নানা আকারের পার্ব্বত্য গৃহ সকলের আয়তন, নানা ভাগে বিভক্ত, উঁচু নীচু, ক্রমে উচ্চে সবার উপর অবস্থিত গৃহ সকল, মাঝখানে মন্দির, শীর্ষে সুবর্ণ কলসের উপরে ক্ষীণ পতাকা, তার পিছনের দৃশ্যপট পর্ব্বত, নীল ধূসর সেই হিমাদ্রিশরীরের আয়তন রেখা মাত্র নয়ন গোচর হয়। সবটা মিলিয়ে সত্যই স্বপনপুরী, যে স্বপনপুরীর কথা ছেলেদের অত্যন্তই লোভের বস্তু। আমাদেরও ঠিক ঐ ছেলেদের অবস্থাই হয়ে যায় চক্ষের সামনে, দূরের ঐ দৃশ্যের দিকে তাকালে।

সবাই এবার নামতে আরম্ভ করলাম কারণ ঐ দৃশ্য চক্ষু গোচর হবার পর বেশীক্ষণ স্থির থাকা অসম্ভব হোলো। এখন দলটির প্রত্যেকেই প্রায় প্রতিযোগিতায় ছুটতে লাগলো। পুণ্য শ্রীধামে পৌঁছে যাবার জন্য সে কি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হুড়াহুড়ি আর অবতরণের দৃশ্য, এই অল্পক্ষণেই এতটা পথের কষ্ট, উঃ—আঃ, বাবা মাকে স্মরণ, সব যেন মন্ত্রশক্তিতে একেবারেই অদৃশ্য, যথার্থই উবে গেল সবার অন্তর থেকে। ঐ সামনের দৃশ্য পটই মন্ত্রের কাজ করলে সবার প্রাণে।

অনেক তপস্যার ফলে মানুষ এই পুণ্যভূমিতে আসতে পারে, উৎকট তপস্যা বললেও কিছু ভুল হয় না। কিন্তু সেই তপস্যার ফল সত্যই পাওয়া যায় এ ধামে এসে উপস্থিত হলেই। মন্দির বা মন্দিরস্থ গর্ভগৃহের মধ্যে দেবতার বিগ্রহের কথা বলছি না আমি বরং ঐ মন্দিরের বাইরের কথাই বলছি,—যার প্রভাব আমাদের সম্মোহিত করে

আমাদের অন্তরের দ্বার খুলে চিন্ময় দেবতার সামনেই পৌঁছে দেয়, সেইখানেই আমরা ইষ্ট দর্শন করে জন্ম ও জীবন ধন্য করি। কথাটা কাকেও বুঝানো যায় না, মনে হয় যে বুঝে মাত্র সেই বুঝে। মনে মনে একটা বিচার আসে, যে তপস্যা করে এত লোক এই অমর ধামে

এসেছে মন্দিরের ভিতরে ঐ বিগ্রহ উদ্দেশ করে, তারা কি ফল পায়? ফল তারা ঠিকই পায়, আর নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভালই পায়, কেউ বঞ্চিত হয় না। কারণ এ ক্ষেত্র, বা পুণ্য ধামেরই এমন গুণ, বঞ্চনার নামগন্ধ বা আভাষ মাত্র এখানে নেই। মহাভারতে

আছে, শ্রীকৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা ছিল, তখন যাদব রাজধানী দ্বারকায় তিনি অধিষ্টিত। সেখানে, যে কেউ, যে কোন কামনা নিয়ে আসুক না কেন, কোন রকমে এসে পৌঁছাতে পারলেই, তিনি তার বাঞ্ছাপূর্ণ করবেন। তার প্রাপ্তির পথে কোন অন্তরায় থাকবে না, কারণ তার আসাটা পাবার জন্যই। এই স্থানও ঠিক সেই কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা নারায়ণের অধিষ্ঠিত ধাম, এখানে এসে কেউ বঞ্চিত হবে না। এ খবর সবাই রাখে না সাধ্য থাকতেও তাই অনেকেই আসেনা। অন্ততঃ আমার একথা শুনে, পরীক্ষার জন্যও যদি কেউ আসে, তাহলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। এসত্যের পরিচয় পেতে কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না। দম্ভ নয়, অহঙ্কারের কথা নয়, এটি আপ্ত বাক্যের মতই গুঢ় এবং সত্য।

এখন এই ধামের একটু বাইরের কথাই বলা যাক। আর সেটা অভাব দিয়েই আরম্ভ করচি। একটা অভাব এখানে বরাবরই থাকে,—সে অভাব জ্বালানী কাঠের। কারণ এ অঞ্চলে গাছ পালা কম, সুতরাং ব্যবসায় উদ্দেশে এখানে পাহাড়ীরা নীচে থেকে হনুমানের চড়াই ভেঙ্গে কাঠকুটা এনে জমা করে। এই দশ হাজার সাড়ে দশ হাজার ফিটের উপরে হিমালয়ের অন্যান্য অংশে পাইন বা দেওদার প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু এ অঞ্চলে, আর কেদারে ও দেখেছি গাছ পালার অভাব; কারণ কেবল বরফ তুষারেরই রাজ্য বোলে। সে হিসাবে বরফের দৌরাত্ম্য কেদারে যতটা বদরীতে ততটা নয়, যদিও উভয়েই হিমালয়ের উচ্চতায় প্রায় একই স্তরে অবস্থিত, কেদার অবশ্য কিছু বেশী। এখানে কাঠের দাম আছে। যে ছয় মাস মন্দির খোলা থাকে, অবিরাম কাঠের যোগান থাকে। পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে অবিরাম দেখা যায় পাহাড়ী বাহক কাঠের বোঝা নিয়ে উঠচে। কিন্তু তাদের জীবনও ঐ কাষ্ঠের মত একথা যেন কেউ মনে না করেন। আমাদের চেয়ে এরা ঢের ভালো, অনেক সুখী, যথার্থ শান্তিময় জীবন যাপন করে! সমতল ভূমির উচ্চ শ্রেণীর মানব আমরা, সেই দম্ভ নিয়ে যখনই ঐ শ্রেণীর পাহাড়ী, বাহক বা কৃষক শ্রেণীর কোন ভদ্রব্যক্তির সঙ্গে কথা কই, তখন অবধারিত ভেবেনি যে আমরাই শ্রেষ্ঠ, আর সেইটাই যেন ভাগবতী ব্যবস্থা। কিন্তু সেটা আমাদের বিষম ভ্রম, সেই ভ্রমের ফলে আরও এক বিভ্রমের সৃষ্টি করে, ফলে আমরা এদের মধ্যেও সেটা সক্রামিত করি। তাতেই তাদের মধ্যেও এই ধারণা হয়ে যায় সত্যই বুঝি তারা নিকৃষ্ট। আমি এদের সঙ্গে ব্যবহার করে, এদের সঙ্গে মিশে এদের সঙ্গে বাস করে দেখেছি যে এরা পবিত্র মনা তো বটেই পরন্তু পরিশ্রমে উন্মুখ আর পরিশ্রম লব্ধ অর্থেই এদের সুখ। মনে এদের যে সততা, সরলতা, আত্ম বিশ্বাস, অল্পে সন্তোষ আর শান্তি, সেটা যদি আমাদের মধ্যে থাকতো আমরা ভাগ্যবান মনে করতাম। ঐ গুণগুলির গুরুত্ব স্বাধীন মন না হলে অর্থাৎ বিষয়ে আবদ্ধ মনে কখনও অনুভূত হবার নয়।

এখন মন্দিরের কথা—

মন্দিরস্থ বিগ্রহের উপরে যে সোনার চন্দ্রাতপ সেটি রাণী অহল্যা বাঈর কীর্ত্তি। শ্যাম কলেবর এই নারায়ণ বিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ মোটেই নয়, আর প্রস্তর বেদীর উপর উপবিষ্ট মূর্ত্তি। রত্নালঙ্কারে শোভিত মনোহর রূপ, কপালে বেশ বড় একখানা উজ্জ্বল বজ্র, সে রকম আকারের ও গড়নের হীরা প্রায় দেখা যায় না। মণিমুক্তা হীরা, জহরতের বৃন্দাবন ঐ বিগ্রহটি কেন্দ্র করে।

তারপর এখানে এই ছয় মাস মানুষের প্রয়োজনীয় যা কিছু দ্রব্য সম্ভার সমতল ভূমি বা নগর থেকে বহু উপায়ে আসে, ভেড়া, ছাগলের পিঠে, গাধা, মোষ ঘোড়া ও বলদের পিঠে। আবার বদরীকাশ্রমের হাটে বহুবিধ দ্রব্য মানুষের পিঠেও আসে। তা ছাড়া আরও তার সঙ্গে পাহাড় উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যাদি, আবার তিব্বতের দ্রব্যজাত সব মিলে এখানে, এই ছয় মাসে প্রকাণ্ড যে মেলা বসে তা দেখলে মনে হয় হায়রে মানুষ,—অন্নের জন্য আজ তুমি অসাধ্য সাধন করতে বসেছ। হিমালয়ের এই অঞ্চলে যেভাবে এই জিনিসের বাজার বা হাট বা মেলা বসে দেখে চমৎকৃত হতে হয়। তীর্থ যাত্রীদের এখানে আসার সুযোগ নিয়ে তাই থেকে উপার্জ্জন। কত লোকের অন্ন সংস্থান হচ্চে, দেখলে অবাক হতে হয়, আর তার সঙ্গে, মানুষের কর্ম্ম ধারা কত পথে চলচে জানতেও পারা যায়। পয়সা যদি থাকে তোমার, এই মহাতীর্থে আসতে সারা পথে কোথাও যেটি পাবার কল্পনাও করনি, এখানে এসে এই মেলার মধ্যে তুমি সব কিছুই পাবে। শীত প্রধান দেশের ব্যবহার্য্য সব কিছুই আছে আবার সভ্য সমতল ভূমির নাগরিক জীবনের অনেক কিছুই পাবে। আরও, আবগারি বিভাগের সব কিছুই। আরও পাবে অমূল্য ভেষজ, জড়ি বুটি, বিচ্ছু, সর্প দংশনের বিষপাথর পর্য্যন্ত। তা ছাড়া আধুনিক সুখ সুবিধার যা কিছু, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ডাক বাংলা, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি পর্য্যাপ্তই আছে এ কথাও আজ সবাই জানে।

এখানে এলে ত্রিরাত্র বাসের নিয়ম, সাধারণে তা মনেও থাকে, তবে যারা দুঃখী আর্থিক দুঃখ পেয়ে এসেছে তারাই তাড়াতাড়ি চলে আসতে চায়, কারণ থাকলেই তো খরচ। শীত বেশী সে জন্যও বটে, অনেকে তিন দিনের বেশী থাকেন না কিন্তু থাকতে পারলে উপকার হয়।

ভারতের প্রাচীন প্রথানুসারে এই মন্দির গ্রামের কেন্দ্র স্থলেই প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকেই গৃহস্থ পরিবার পরিবৃত, নারায়ণ এখানে থাকেন ভাল। কেদারনাথের মন্দির দেখবার পর বদরীনারায়ণের মন্দিরও দেখলাম। এত ভীড় কেদারে নেই, এত ব্যাপারও সেখানে নেই কিন্তু মন্দিরের গাম্ভীর্য্য স্থানের নির্জ্জনতা, জনহীন পরিবেশের মধ্যে কেদারনাথের মন্দিরের বিশালতা, গভীর রহস্যপূর্ণ বন্য মাধুর্য্য এখানে নেই। এখানকার মন্দিরের গায়ে গায়ে বাড়ি ঘর এমনই ঘন যে, নারায়ণের হাঁপ লাগবার কথা। আর

তিনি নারায়ণ বোলেই এই অত্যাচারটি মুখ বুজেই সহ্য করচেন। মন্দির সংলগ্ন যাত্রী-শালার কি ভয়ানক প্রসার এখানে, আর পুরীর প্রবেশ পথ থেকে যে ভাবে পথের ধারে দোকান শ্রেণী, মনে হয় পশ্চিমাঞ্চলের কোন এক সহরেই বা এসে গেলাম। মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রবেশ করতে যে কয়টি খাড়া একফুট করে উঁচু বিশ বাইশটি ধাপ উঠতে হয় তাইতেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে তীর্থ যাত্রীদের।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এখানকার তুলনায় কেদারের মন্দির সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। তার পর এখানকার রাওয়ালের ঐশ্বর্য্য, বায়নাক্কা ভয়ানক, কারবারি ধরণের। আগে এখানে দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরই পূজার অধিকার ছিল,—তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে মালাবারের, নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ ট্রাভাঙ্কোর অথবা কেরল দেশের তথা শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমির ব্রাহ্মণেরাই এই অধিকার একরকম জোর করেই দখল করে নিয়েছে। অবশ্য পূজার্চ্চনার ভার, তার সঙ্গে সঙ্গে এই মন্দিরের ধনৈশ্বর্য্য যাকিছু বিষয় সম্পত্তির অধিকারও বুঝতে হবে। এই পূজারী বা প্রধান মহান্তই রাওয়াল নামে এখানে পরিচিত। এই রাওয়াল এখানে ছয়মাস তারপর কার্ত্তিকের শেষ থেকে অক্ষয় তৃতীয়া পর্য্যন্ত যোশীমঠ নিজ স্থানে বাস করেন;—সেখানে বদরীনারায়ণের এক রজত মূর্ত্তি রাখা আছে—শীতকালে ঐ বিগ্রহই পূজা হয়।

এখানকার ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মকপালে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পন ও পিণ্ডদান, বিধি,—আর পঞ্চতীর্থে স্নান আর নারায়ণ দর্শন ইহল তীর্থের সাধারণ কাজ, যাত্রীরা তাই করে থাকে। পঞ্চ তীর্থের মধ্যে প্রথম গঙ্গা, ২য় কুর্ম্মধারা, ৩য় তপ্তকুণ্ড, ৪র্থ নারদ কুণ্ড ৫ম সূর্য্য কুণ্ড। তার মধ্যে শেষ তিনটি উষ্ণ প্রস্রবণ। এখানেও গৌরীকুণ্ডের মত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে,—তিনটি কুণ্ড অর্থাৎ ঐ জলাধার বড় তিনটি চৌবাচ্ছায় ঐ জল শেষে ঐ অলকনন্দায় গিয়ে পড়ছে এবং সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কেদারেশ্বর মন্দিরে যে শিব আছেন আগে সেই শিব দর্শনের পর তবে শেষে বদরীনারায়ণের মন্দিরে প্রবেশের নিয়ম। তারপর আসল কারবার আরম্ভ হয়।

বদরীকাশ্রমে ভগবানের মূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অতীব প্রাচীন। এই শ্রীবদরীনারায়ণের মন্দির সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে আগে সেই কথা বলে নেওয়াই ভালো। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে ভগবান শঙ্করাচার্য্য গাড়োয়াল রাজ্যে এসে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ ও শ্রীশ্রীকেদারনাথের স্থান এবং বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। ইহাই আদমূর্ত্তি প্রায় বারোশত বৎসর পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালের প্রভাবে ঐ মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, আর বিগ্রহটি অলকনন্দার জলে পড়েছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য উত্তর হিমালয়ে এসে স্থানটি আবিষ্কার করেন আর ঐ জলমগ্ন মূর্ত্তি উদ্ধার করে এই খানেই গড়ুর গুহায় প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপযুক্ত দণ্ডীর হাতে পূজার

ভার দেন। তপ্তকুণ্ডের নিকটেই ঐ গড়ুর গুম্ফাটি। প্রায় দেড় শত বৎসর ঐ স্থানে পূজা চলে আসছিল। শঙ্করের শিষ্যপরম্পরায় বরোদারাজাচার্য্য, তখনকার গাড়োয়াল রাজ্যের অধিশ্বর প্রবীরপাল মহারাজের গুরু ছিলেন। এখন আচার্যের প্ররোচনায় সেই প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরের স্থানে এই নুতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দিলেন, আর আচার্য্য ঐ নারায়ণের বিগ্রহ নুতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠ করেন। তখন থেকেই এখানে অর্থাৎ এই মন্দিরেই ভগবানের পূজা চলচে। রাণী অহল্যাবাঈ বিগ্রহের উপরে স্বর্ণ চন্দ্রাতপ এবং উহা নানাভাবে মনিমুক্তাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। নূতন মন্দির ও বিশবাইশটি খাড়া সোপানের উপর যে সিংহদ্বার, একশত বৎসরের বেশী হবে না বরং আরও কমই। ঐ সব দেখে মনে হয় যেন মোগলরাজত্বের শেষ দিকের কোন মন্দিরের সিংদরজা। তার মধ্যে প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের কোন নিদর্শন নেই।

ঋষি গঙ্গা ও অলকনন্দা এই দুই স্বর্গের প্রবাহ সঙ্গমেই বদরী বিশালের পুরী অবস্থিত। অলকনন্দার উপরেও একটি সেতু আবার ওদিকে ঋষি গঙ্গার উপরেও আরও একটি সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়েই মানার পথে, তথা বসুধারা প্রভৃতি আরও উপরের উত্তরস্থ তীর্থ স্থানে যেতে হয়। পরে আমরাও গিয়েছিলাম।

আগেই বোলেছি এই মহান তীর্থের দেবতার পূজার্চ্চনা পূর্ব্বহতেই শঙ্করাচার্য্য নিজ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সন্ন্যাসীদের হাতেই দিয়ে ছিলেন। সেই ভাবেই চলে আসছিল। তারপর গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মালাবারের নবুদ্রী ব্রাহ্মণ, শঙ্করের নিজ দেশস্থ একদল স্বজাতীয় ধনলুব্ধ হয়ে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হাত থেকে পূজার্চ্চনার ভার গ্রহণ করে। তখন থেকেই তীর্থ যাত্রীদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। কারণ পূজার্চ্চনার ভার প্রাপ্ত রাওয়াল অর্থাৎ প্রধান পূজারীর বিগ্রহের পূজার সংস্থান, বহু ধন ঐশ্বর্য্য, এবং বৈভব সবই আয়ত্ব করাই ছিল তাদের আসল কথা। তারপর যার যত বৈভব তার ততই অপব্যয়। কাজেই আরও চাই আরও চাই। সত্ত্ব ধনদাতা গৃহস্থ যাত্রীদের উপর পীড়ন অধিকমাত্রায় সুরু হয়ে গেল। টিরী দরবার থেকে কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা রইলো না কারণ দরবারেরও গলদ ছিল। এমনই সময়ে বৃটিশ ভারতের সরকার কেদার বদরী অঞ্চল ও দক্ষিণে অলকনন্দার নীচে তরাই অবধি গাড়োয়াল, ভারতের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন রাজনৈতিক কারণে। তখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক, প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কাল। তবে দেব মন্দির তীর্থাঞ্চলের যা কিছু সকল দায়ীত্বই দরবারের অধিকারই রইলো। অবশ্য এই বৃটিশ গাড়োয়াল স্থষ্টির মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল। কিন্তু তাতে দূরাগত তীর্থ যাত্রীদের দুঃখ ঘুচলো না। এই ব্যাভিচারের প্রতিকার হলো ১৯৩৯ সালে ইউ, পি, সরকারী কাউনসিলের আইন সভা থেকে, শ্রীবদরীনারায়ণ টেম্পল এক্ট, পাশ হোলে পর। তাতে ক্ষমতা রাওয়ালের হাত থেকে

বারোজন সভ্য এবং তিনবৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত এক সভাপতি নিয়ে গড়া একটি কমিটির হাতে গেল। রাওয়াল সুধু পূজার অধিকারীই রইলো। বাকী যাত্রীদের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রভৃতি, পথঘাটের ব্যবস্থা টিরী দরবারের হাতে রইল। কোন অন্যায় বা শক্তির অপব্যবহার থেকে প্রতিষ্ঠানটি রক্ষার ভার সরকার নিজের হাতে রেখেছেন। এই ভাবেই চলচে বর্ত্তমান তীর্থ সংরক্ষণের কাজ।

এই তীর্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থাও বেশ ধারাবাহিক কার্য্যক্রমের ভিতর দিয়ে। সেটা আর কিছুই নয়, ভোগের জন্য টাকা দিলে তার রসিদ পাওয়া যায়। সুক্ষ্ম দেরাদুনের বাঁশমতি চালের আতপায় ছুটি প্রসাদ পাওয়া যায়। কোন ভোগের জন্য এক টাকার নিচে গ্রহণ করার নিয়ম নেই। তারপর আটকে বাঁধার একটা প্রথা আছে, যাত্রীদের কেউ পঁচিশ টাকা জমা দিলে তার নামে প্রত্যহ পূজা ও ভোগ দেওয়া হয়, তুমি যাবজ্জীবন তার ফলভাগি হবে। তারপর অতটাকা যদি না দিতে পার তবে পাঁচ টাকা মোট দিলে, তোমার নামে রোজ সচন্দন তুলসী পত্রও চড়ান হবে, তাতে তোমার উপকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিকও আধি দৈব সকল দিক দিয়েই কল্যাণ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। তারপর গদিতে ভেট, চার আনার কম নয়, যতবেশী পারো জমা দিয়ে খাতায় নাম লিখিয়ে এসো। আরও আছে, যদি ভাগ্যবান হও তাহলে ১০১ টাকা জমা দিলেই রসিদ পাবে তৎক্ষণাৎ, সেটা ঠাকুরের অভিষেক, অর্থাৎ দুধ, গোলাপ ও গঙ্গা জলে স্নান, তারপর সিঙ্গার অর্থাৎ গন্ধানুলেপন, রাজবেশে সাজানো, যা লোকচক্ষুর অগোচরে গোপনে, দরজা বন্ধ করেই সম্পন্ন করা হয়, তা কেবল তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে, আর কোন ভাগ্যহীন পায় না যারা বন্ধ দরজার বাইরে থাকে। তারপর, আতরের জন্য পাঁচটি মাত্র টাকা আগাম জমা দিলে তোমার নামে ঠাকুরকে প্রত্যহ আতর গন্ধানুলেপন করা হবে তুমি তার ফল ভোগ করবে। তারপর সহস্র নাম অর্চ্চনার্থে মাত্র দশটাকা, অষ্টোত্তরি নামার্চ্চনায় মাত্র পাঁচ টাকা, কর্পূরারতি মাত্র ১৲ টাকা, বড় আরতি এগারো, আর বালভোগ তাতে, সউপকরন অন্ন, পূরী, ক্ষীর, দধি প্রভৃতি সব কিছুই থাকবে তারজন্য মাত্র পনেরো টাকা দিলেই হবে। এখানে একটা অনুসন্ধানী কার্য্যালয় অর্থাৎ এনকয়েরী অফিসও খোলা হয়েছে। মন্দির প্রাতে সাতটা থেকে চার ঘণ্টা, সন্ধ্যায় ছটা থেকে রাত নটা অবধি খোলা থাকে। ওখানে সন্ধ্যার পরেই ন'টা বেজে যায়।

প্রথমেই কেদারনাথের রাওয়ালকে দেখেছিলাম, সোম্য মূর্ত্তি ভারি ভদ্রলোক। বদরীনারায়ণের রাওয়ালকেও দেখলাম। বাসা থেকে যখন মন্দিরে আসেন তখন সোনা রূপার আশাসোটা উজ্জল ও দণ্ডধারী প্রহরী ছয় জন আগে পিছে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে আসে। মন্দির প্রবেশ করে তখন তাঁকে নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে যুক্ত থাকতে হয়।

স্থূল শরীর, প্রখর চক্ষু দুটি, প্রৌঢ় বয়স, মুখখানি যেন রাঘব বোয়ালের মত। এ ভাবে এই বিশ্লেষণে কেউ যেন আমার প্রতি বিরূপ না হন, বাইরের মূর্ত্তির মত অমন ধোঁকার বস্তু আর নেই। এমন অনেকেরই মুখ দেখে মনে হয় যেন ভয়ঙ্কর ভাবের মানুষ অর্থাৎ তার মুখ দেখেই মনের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাবই জেগে ওঠে। এখন সেই বাহ্য দৃশ্যে তার অন্তরের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যবহারে দেখা যায় আসলে ঠিক তার বিপরীত আর সেই জন্যই এখানে সাবধান করে দিচ্ছি। তা ছাড়া এখানে যে তিনটি দিন ও রাত্র ছিলাম তার মধ্যে রাওয়াল সাহেবের কোন অন্যায় বা অসদ্ভাব দেখিনি; এবং তার সম্বন্ধে কিছু বিরুদ্ধ ভাবের কথাও শুনিনি। মুণ্ডিত মাথার মাঝে এক গোছা চুলের শিখা বাঁধা। যেমন দক্ষিণ দেশে অথবা মালাবারের মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণদের হয়ে থাকে। এখানে তাদের নিয়ম অবশ্য তা নয়, রেশমের একখণ্ড বস্ত্র মাথায় পাগড়ির মতই জড়িয়ে বাঁধা থাকে বেশী সময়, না হলে টুপী। রাওয়াল সাহেবের কথার আওয়াজ মৃদু মোটেই শ্রুতি কটু নয়। সেদিন তার সঙ্গে একটু কথা হয়েছিল। এমন কি আমি বাঙ্গালা থেকে এসেছি শুনে তিনি আমায় একটু সুনজরে দেখেছিলেন। তার ফলে তখনই আমার প্রতি একটু বিশেষ অনুগ্রহও দেখিয়েছিলেন। প্রাতঃকালে নারায়ণের বিগ্রহ অভিষেক এবং সিঙ্গার প্রভৃতি যা দ্বার বন্ধ করেই সম্পন্ন হয়, তা দেখবার অধিকার দিয়েছিলেন, যারজন্য মোটা টাকা জমা দিয়ে অবস্থাপন্ন লোকেরা করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে আমি সে সময় উপস্থিত থাকতে পারব না বলে ক্ষমা চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, কাহে আপ দেখনে উহ মাংতা নেই? আমি তখন তাঁকে যে কথা বললাম তা শুনে তিনি খুসী হয়েছিলেন। ব্রহ্ম কপালের কাছে এক জায়গায় আসন করেছি, ঐ সময় আমি কিছু কাজ করি।

তিনি আর কিছু বললেন না শুধু মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। বোধ হয় ভাবলেন একি অদ্ভুত যাত্রী মূল্যবান সুযোগকে অবহেলা করে।

যা হোক অন্তরের শ্রদ্ধা তাঁর উপর না থাকলেও অশ্রদ্ধাও ছিল না। মন্দিরের পূজারী এবং সহকারী যে কয়জন দেখেছি, তারমধ্যে একজন যুবা আমার মনকে আকর্ষণ করেছিল, নীলকণ্ঠ আইয়ার তার নাম। যেন দেবমূর্ত্তি, তার মধ্যে একটু কিছু ছিল, বাহ্যভাব হলেও আমার মন তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। যখন বদরীনারায়ণের সন্ধ্যারতির পর স্তোত্র পাঠ, ঐক্যতানে চমৎকার সুরে স্তবপাঠ হোত, স্বর্গের সুরে দেব নারায়ণের স্তব, শীতের ভয়ে বা অন্য কারণে যিনি বঞ্চিত হন সত্যই তার জন্য দুঃখ হয়। অবশ্য এখানে রাত্র নয়টায় সব শেষ হয়ে যায়, তখন মন্দির দ্বার বন্ধ হয়ে যায়, যে যার স্থানে চলে যান। রাওয়ালের আশ্রম কাছেই এমনকি পাশেই।

ঠিক জানি এখানে অধিকাংশ যাত্রীই ত্রিরাত্র তীর্থবাস করেন। সহজেই মনে একটা

প্রশ্ন আসে তারা কি নিয়ে থাকেন। কেউ যেন মনে না করেন তীর্থকামীরা যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকে ততক্ষণই ঐ মন্দিরে পূজার্চ্চনায় কাটান। মোটেই তা নয়, দিবারাত্র যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকে,দিনের বেলা বেশীরভাগ যাত্রীর ভীড় হলে সারিবন্দী দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, মন্দির গর্ভগৃহে একসঙ্গে আটজনের বেশী লোক ভিতরে নেওয়ার নিয়ম নেই। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ যাত্রীরা বাজারে অর্থাৎ মেলায় ঘুরে বেড়ান, আর নানা শিল্পজাত দ্রব্য দেখা, দরকার মত কোন কোনটী সস্তা বুঝে খরিদ করা, এই সব কাজেই অতিবাহিত করেন। জিনিষ কেনা, দরকরা, পছন্দ করা, আমাদের বাঙ্গালার মেয়েদের যা আর বিহারী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারহাট্টা দক্ষিণী, মেয়েদেরও তা। সব জাতের ভাই বেরাদারি দেখলাম, কেবল উৎকলবাসী ভাই ভগিনীদের এই হিমালয়ে দেখলাম না। কথাটী আমি সহজেই ঝেড়ে ফেলিনি। এরপর আমার পুরী ভুবনেশ্বরাদি ক্ষেত্রে যাতায়াত এবং ভ্রমণ সূত্রে থাকা, এবং ওদের সমাজে ভালো ভালো লোকদের সঙ্গে মিলন এবং ব্যবহার সম্পর্ক ঘটেছিল, এবং এই কথা আমরা আলোচনাও করেছিলাম। তাদের এক যুক্তির কথাও শুনেছিলাম। তাঁরা বললেন, প্রথমতঃ উড়িষ্যা প্রদেশের লোকেরা প্রায়ই পর্য্যটনে উদ্যমহীন তারপর গরীবদেশ, তারপর এই তীর্থ বহুল উড়িষ্যায় এত প্রসিদ্ধ তীর্থসকল থাকতে সুদূর হিমালয়ের কথা তাদের মনেও হয় না। আমি বললাম, তাহলে দক্ষিণে তামিল দেশও তো তীর্থ বহুল, সেখানকার লোক তো শত শত হিমালয়ে যায়। আসলে তীর্থ বহুল স্থান বা দেশের অধিবাসী বলে নয়, এনটারপ্রাইজেরই অভাব, এনার্জ্জিরও অভাব যার নাম উদ্যমহীনতা।

দেশের মধ্যে বাঙ্গালাই সবার চেয়ে বেশী সমতল ক্ষেত্রের দাবী রাখে, কারণ সমুদ্রের সান্নিধ্য, শুধু তা নয় নূতন দেশ, সবার তুলনায় কাঁচাদেশ' সবচেয়ে ছেলে মানুষ দেশ, বেশীর এর মধ্যে কোন পাহাড় পর্ব্বত নেই, কেবল নদী। কাজেই বাঙ্গালীদের হিমালয়ের প্রীতি খুব বেশী মনে হয়। তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রমের কথায় ভারতের সকল প্রদেশেরই খ্যাতি সমান। এতে কমপিটিশানের ব্যাপার না আনাই ভাল। সর্ব্বপ্রকারে উদ্যমশূন্য কোন জাতী আছে বলে আমি শুনিনি। তবে আরাম বড়ই প্রিয় জিনিস, সেই আরাম, প্রিয়তায় সর্ব্বাগ্রগণ্য যে জাত তার নাম কি বলে দিতে হবে? বর্ত্তমানে ঐ জাতির মধ্যে পর্য্যটন স্পৃহার কথা অনুসন্ধান করতে গেলে পুরাতন পাঁজীর দরকার। যাই হোক এখন দেখি এই ভারত প্রসিদ্ধ তীর্থে বদরীকায় ত্রিরাত্র বাসের ফল অনেক।

এখানকার মত জনসমাগম কেদারে নেই। সেই জন্যই আমার মনে হয় কেদারের মহিমা বদরীর তুলনায় কিছু বেশী। পথের এবং স্থানের যে আকর্ষণ দুই দিক থেকেই বলছি, যে আকর্ষণ বদরীনারায়ণে আছে, কেদারের তা নেই। অর্থাৎ যে আকর্ষণে

যাত্রীদের বদরীতে টেনে আনে, কেদারের পথে সে আকর্ষণ থাকলে নিশ্চয় সে পথেও লোকে যেতো বেশী। তার প্রমাণ যখন কেদারের পথে আমরা যাচ্ছিলাম কচিৎ পাঁচ, সাত জন অথবা দশটি নরনারী তাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আর জয় কেদারনাথজী কি জয় আমরা শুনেছি, পথের মধ্যে কোথাও কোথাও। কিন্তু চামৌলী থেকে যখন আমরা এই বদরীর পথে যাচ্ছি তৎক্ষণ বোধ হয় প্রত্যেক পড়াওতে বিশ পঁচিশ থেকে এমনকি পঞ্চাশ ষাঠ জন পর্য্যন্ত দেখা মিলেছে প্রত্যেক চটিতে ও পথে। জয় বদরী বিশালকি জয় শুনতে শুনতে, আমাদেরও ওটা বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এইভাবেই যেতে ও আসতে দলের মিলন সংঘটিত হয়ে থাকে নানা স্থানে।

বদরীনাথ মন্দিরটি কেন্দ্র বিন্দু করে যদি ভাগিরথী অর্থাৎ গঙ্গোত্তরীর পথে রেডিয়াস ধরে একটি বৃত্ত রেখা টানা যায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম নিয়ে এই স্থানেই বিশাল দেব রাজ্যের অস্তিত্ব এক সময় ছিল শুধু নয় প্রবলই ছিল। তবে উত্তর অংশটি তার রহস্যময় ছিল এবং এখনও আছে। এক সময় সমতল রাজ্যের অধিবাসীরা সেইটি দেব রাজ্য বলেই জানত। ইন্দ্রাদি দশ দিক পালের অস্তিত্বও এই সংস্পর্শে। অবশ্য দক্ষ প্রজাপতির রাজ্য নিম্নভাগে রাজধানী ছিল কনখলে। দেবাসুর সংগ্রাম এই সব ক্ষেত্রে বহুবার হয়ে গিয়েছে। সমতল ভূমির কোন কোন লুব্ধ রাজা, স্বর্গভূমি আক্রমণ করে,—সেই হেতু যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলেছিল। মান্ধাতা রাজা এই স্বর্গেরই একজন রাজা। অতি প্রাচীনকালের, ঘটনা, এখন ওসব পুরাণের কাহিনী হয়ে গিয়েছে। এখানকার যে তীর্থ-গুলি, তখনকার দিনে সেগুলি কোন না কোন জনপদস্থ নগর। যে সকল মুনী-ঋষী এ অঞ্চলে বাস করতেন প্রায় তাঁরাই যোগ শাস্ত্র, দর্শন এবং পুরাণের সৃষ্টি কর্ত্তা। সেই মহাভারতের সময় এই দেব রাজ্যের পরিবর্ত্তন হয়েছিল, তখন জনপদগুলি বেশীরভাগ পতনোম্মুখ। শেষে মহাভারতের পর বুদ্ধের সময় থেকেই সমতল ভূমির নরপতিগণ ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রবল দুদ্ধর্ষ প্রতিবেশী নরপতিগণের আক্রমণে পরাজিত হয়ে, হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে আশ্রয় ও রাজ্য স্থাপন করেন। নেপাল, গাড়োয়াল, আসকোট, শোর প্রভৃতি পর্ব্বত আশ্রয় করে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আরও উত্তর দিকে সরতে থাকেন।

প্রথম দিনই এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এক বাউল,—তার কথাটাও বলা ভালো। সে আমাদের মাতিয়ে রেখেছিল। এক বাঙ্গালী বাউল, হাতে তার একতারা, এই শীতের রাজ্যে মোটা এক কম্বলের ঝোলা আলখাল্লা মাত্র গায়ে, মাথায় পাগড়িতে কান পর্য্যন্ত ঢাকা, গান গেয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছে দেখলাম। শুধু তার মূর্ত্তি নয়, তার স্ফূর্ত্তি ও এক পরম আকর্ষণের বস্তু। লোকটা কবি, কি চমৎকার কণ্ঠ; আর তাল লয় মিলিত গানের শুদ্ধ রচনা, কথা ও সুর সব কিছুই যেন তার আকর্ষণের পরিচয়। সকলে না হোক যারা তার গান শুনছে, উপেক্ষা

করতে পারেনি। তার সেই অসাধারণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা, এখানে অনেকেরই মনোহরণ করে ছিল। যে কেউ তাকে দেখেছে, আর তার গান শুনেছে ভাষা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারেনি সুধু তার হাবভাব, কণ্ঠের স্বর প্রবাহ নিঃসরণ সবাইকে টেনেছে। আমার মনে হয় এমন চমৎকার বাউল গান এর আগে শুনিনি। যারা তার ভাষা বুঝতে পেরেছিল তারা কেউ তাকে ছাড়তে পারেনি। বাস্তবিক তার অনেক গানের মধ্যে যেটি এখানে সকলকে নাহোক অন্ততঃ অধিকাংশ যাত্রীদের মুগ্ধ করেছিল, সেটা এই,—

ওগো রসের অবিকারী,
ও গো রূপের অধিকারী, ও গো রসের অধিকারী,
তুমি কোথায় থাক. কোথায় নাই,
খুঁজতে আমি যেথায় যাই,
তোমার পায়ের শত চিহ্ন, ঐ যে অবিকারী,
ও গো রূপের অধিকারী ও গো রসের অধিকারী।
ওখানে ঐ মরু ভুঁয়ে, বালি পাথর ধুয়ে ধুয়ে,
চালিয়েছ এক নির্ঝরিনী পথিকের মুখ চেয়ে,
(আবার) বিকট পাষাণ ভেদ করে ঐ অগ্নি শিখা ভারি ;
একমাত্র তুমি ওগো তারই সৃষ্টিকারী।
অন্য দিকে দেখি, ওগো জুড়িয়ে গেল আঁখি,
সবুজ নীলে ভাসচে গিরি, কঠিন স্তরের বক্ষ চীরি
বইছে স্বচ্ছ ঝরণা ধারা তার কি তুলনা আছে
যেথা আমি কেন যাই না তুমি আছ কাছে ;—
ওগো অধিকারী,—আছো হাতে হাতে ধরি।
এই যে হেথা ধরার ছাদে, তুষারের খেলা,
শীতে সবাই জমে আছে জড় ভরতের মেলা,
হেথায় তোমার পরশ ঐ তুষার ধারার পাশে
ঐ যে তপ্তকুণ্ড ভ'রি
স্নান সমাপন করতে হেথা যাত্রী সারি সারি,
আমার সুখের লেগে তুমি ব্যস্ত থাকো ভারি
ওগো অধিকারী, রূপের অধিকারী, রসের অধিকারী॥

তার এমন আকর্ষণ, এই শীতস্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সামনের যাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এলো লোকে ঐ গান শুনতে। ঐখানেই খানিক ফাঁকা জায়গা, চার দিকে ঘর আর

দোকান সেইখানেই বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে সে গান করতো। মাড়োয়ারীরা তার পিছনে লেগেছিল, অবশ্য ভাল উদ্দেশ্যেই। তাকে খিচড়ি খাওয়ানো, তার পয়সা চাই কিনা, যাবার রেলভাড়া বাবদ কিছু টাকা চাই কিনা, আর কম্বল দরকার আছে কিনা, সব
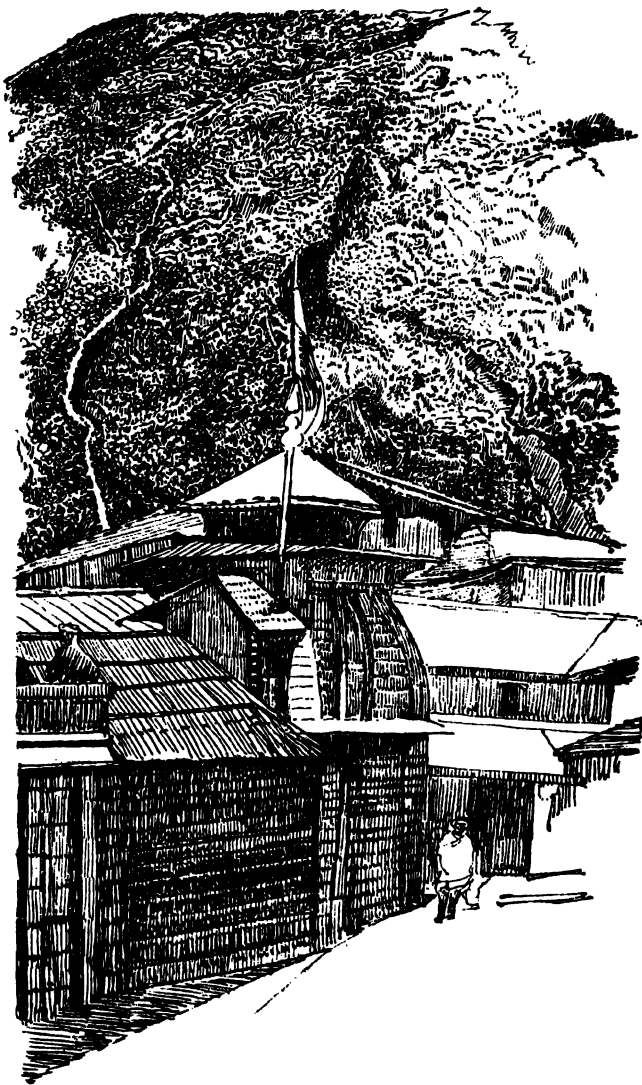
খোঁজ খবর নেওয়া ;—মোট কথা তার ভাগবতভাবে তন্ময়তা দেখে তারা সেই ভগবানের দরবারে তাদের তরফ থেকে মোক্তার নিযুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই পাকড়াও করেছিল, —কিন্তু সে ব্যক্তি কোন কথাই বলেনি। তার ঘুঙুর পায়ে, চলতে চলতে গান,

আর যখন একটু ফাঁকায় আসে তখন সেখানে একটু দাঁড়িয়ে পাঁচ জনকে শুনবার সুযোগ দেওয়া, বদরীনারায়ণের মন্দির প্রদক্ষিণ করা তার নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। আমরা তিন দিনই তাকে দেখে আর তার গান শুনেছিলাম। জেঠামশাই তার ভক্ত হয়ে গেল। সে আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো, কউন বোলি ইনকা? আমি বললাম,—ইয়ে হামারী আপনা বোলী, বাঙ্গালা। শুনে সে দুই একবার, বাঙ্গালী, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা, উচ্চারণ করে তখন বোলে ফেললে, ইয়ে বোলিতো মিঠা মালুম হোতা। বহুত আচ্ছা ভজন হোয়েগা। যাইহোক আমাদের এই বাউল সেই একতারা বেশ আনন্দে মাতিয়ে রেখেছিল হিমালয়ের মহাতীর্থে।

তার সঙ্গে বাসায় দেখা হোলো, সেখানেও সে জাঁকিয়ে বসেছে। স্বর্গরাজ্যের কথাই সে বলে চলেছে;—সেকি আজকের কথা, এখানে দেবাসুর সংগ্রাম কি কম হয়ে গিয়েছে। সমতল ভূমিতে যারা দেবতাদের বিপক্ষ, তারাই হোলো অসুর অর্থাৎ কিনা দেবতাদের চির শত্রু। তারা এসে স্বর্গরাজ্যের শান্তি নষ্ট করচে, তারা স্বর্গের সব কিছুই যা সুন্দর লোভনীয়, অধিকার করতে চায় জোর জবরদস্তিতে। কেড়ে নেবার ধর্ম্মই ভাল বোঝে। লাগ্ স্বর্গের পিছনে, নে কেড়ে যা কিছু ভাল আছে, অধিকার কর যাকিছু উৎকৃষ্ট বস্তু তাদের। তখন মান্ধাতা, মুচুকুন্দ প্রভৃতি প্রতাপশালী রাজারা দেবতাদের হয়ে অসুরদের বিপক্ষে যুঝেছিলো। কিঘোরতর যুদ্ধই হোলো, শেষে অসুরদের পরাজয়। স্বর্গরাজ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হোলো। সে লড়াই কি কখনও বন্ধ হয়েছে? ও যে চিরকালেরই লড়াই। এ কালের ঐ হিন্দু মুসলমানের লড়াই আর কি। ইতিহাসে পুরাণে কতো কতো ঐ সব দেবাসুরের যুদ্ধের কাহিনীতে ভরা আছে।

বাবাজী স্বর্গে বসে বেশ যাত্রীদের নিয়ে আনন্দে মেতে আছেন। দেখে আনন্দ হয় যে, এই ঠাণ্ডা তীর্থে যেখানে যাত্রীদের জড়ভরত করে রাখে, এই শ্রেণীর যাত্রী সেখানে নানা ভাবে তাদের মধ্যে একটু তাপ জাগায়। খানিকটা তাদের স্বস্তি দিতেই আসে,—আর জয় বদরী বিশাল, কথাটি মাঝে মাঝে সবাইকে শোনায়।

১৯

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণে—বাকী দু'দিন

বদরীনাথের মন্দিরে যে পরিমাণে যাত্রী সমাগম হয় তার এক চতুর্থাংশ কেদারনাথে হয় না। কেন? এরা বলে কেদারের পথের কষ্ট আর ওখানকার শীতেই যেতে দেয় না। বাস্তবিক রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকে কেদারের পথে, গুপ্ত কাশীর পর থেকে যে কঠিন চড়াই, একটার পর একটা, তারপর ত্রিযুগীনারায়ণ পর্ব্বতারোহণের কথা

মনে হোলে সত্যই উৎসাহ থাকে না, তারপর গৌরীকুণ্ডের চড়াই, শেষ রামবরহা থেকে কেদারনাথ পর্ব্বতের আরোহণের কথা মনে হলে জ্ঞান বুদ্ধি একেবারেই যেন লোপ পায়। সে হিসাবে বদরীনারায়ণের পথ অনেক সহজ। চড়াইও এপথে আছে সত্য, হনুমানের চড়াই একমাত্র কঠিন চড়াই যা যথার্থই কঠিন বোলে গণ্য। তারপর কেদার পথের সৌন্দর্য্য আছে সত্য কিন্তু এই বদরীর তুলনায় তা বন্য বোলেই গণ্য। কেদারের মহিমা অসাধারণ, সাধারণ ভাবে ধরাই যাবে না যে কি বিরাট রহস্যময় সত্তা এর সঙ্গে জড়িত আছে। কিন্তু বদরীকাশ্রমের পরিস্থিতির মধ্যে যদি তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা সরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাকে,—কলকাতার বড়বাজার অথবা পশ্চিমের কোন সহরের মন্দির সংলগ্ন বাজার ছাড়া তার বেশী কিছু মনেই হবে না। অধ্যাত্ম পরিস্থিতির সঙ্গে আধুনিকতা মিশিয়ে, শুধু স্থাপত্যের ব্যবহারে নয়, সর্ব্ববিধ ব্যবহারেই বদরীকাশ্রমের ক্ষেত্রটি যতই আধুনিকভাবে প্রাণ পূর্ণ মনে হোক না কেন ধর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে তার প্রাণের পরিচয় পেতে হলে ঐ পরিবর্ত্তনীর বাইরে আসতে হবে।

আরও একটি বিষয়ে আমি লক্ষ্য করেছি,—সহজে যাওয়া যায় যেহেতু কেদারের তুলনায় বদরী দুই আড়াই হাজার ফুট নীচে বোলে, আর সহজ পথের জন্যও বটে, গৃহীরা কেদারে কমই যায় কাজেই বদরী বেশী জনপ্রিয়। তারপর তিব্বতে যাবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশাল পথের সঙ্গে যুক্ত এই তীর্থরাজ;—যোশীমঠ থেকে নিতির পথে, আর বদরীনাথ তীর্থ পেরিয়ে মানার পথে, মানাপাস অতিক্রম করে তিব্বতে তীর্থপুরী, ভস্মাসুর হয়ে কৈলাস ও মানস সরোবর প্রভৃতি তীর্থের যোগ;—এসকল কারণেও বদরীর এতটা গুরুত্ব। তারপর আরও একটু আছে,—মানাগ্রাম দিয়েই প্রথমে ব্যাসগুহা, পরে বসুধারা, বিখ্যাত ঐ ধারা অতীব প্রাচীন তীর্থ। অলকাপুরী, স্বর্গারোহণ পর্ব্বত, এ সকল এই বদরীকাশ্রম থেকেই যাবার তীর্থ। তার পর লক্ষীবান,—চক্রতীর্থ হয়ে শতোপন্থ হ্রদ এই সকল প্রাচীন তীর্থের সঙ্গে বদরীকাশ্রমেরই যোগ। কাজেই এই বদরীর পথে বেশী লোকের যাতায়াত থাকবে বিচিত্র কি।

যদিও নেলাংপাস দিয়ে তিব্বতে যাওয়া যায়, যদিও কেদারের পথে এবং উত্তর পশ্চিমে গঙ্গোত্তরীর পথেও যাওয়া যায় কিন্তু সে পথেও বেশী লোক যায় না যতটা মানা ও নিতির পথে যাত্রীদের যাতায়াত। আসলে এ সবগুলিই ট্রেডরুট, যদিও আমাদের বেলায় ব্যবহারে পিলগ্রীম রুট হয়েচে। তীর্থস্থান পর্য্যন্তই তীর্থ পথ। আগে, বহু কাল আগে থেকে ট্রেড আর পিলগ্রীম রুট একই ছিল। আর ঐ তিব্বতের সঙ্গে কারবারের সূত্রেই তীর্থ সংযুক্ত পথের কদর হিমালয়ের উচ্চ স্তরের মধ্যে। কাশ্মীরের অমরনাথ, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদার, বদরী, নন্দাদেবী কৈলাস, মানস, পশুপতিনাথ প্রভৃতি হিমালয়ের প্রধান প্রধান তীর্থগুলি, সবারতুলনায় বদরীতে যত বেশী লোক যায় তত আর

কোন তীর্থেই নয় যদিও বদরীর কাছে পশুপতিনাথ বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর খুবই নিকট কারণ সবাই জানে যে বদরীর তুলনায় কাটমাণ্ডু নিকট কিন্তু তবুও বাঙ্গালী বদরীতে যায় না বোলে ধায় বললেই ঠিক হয় কারণ, সকল প্রদেশের বাঙ্গালী যাত্রী বদরীনারায়ণের পানেই গতিশীল।

শঙ্কর আচার্য্য যখন এই তীর্থগুলি পুনরুদ্ধার করেন তখনও এখান থেকে তিব্বতে অতীব প্রাচীন, কৈলাস ও মানস সরোবর যাবার ঐ নিতির পথটি প্রসিদ্ধ ছিল। অবশ্য মানার পথও কম ছিল না। আবার কর্ণ প্রয়াগ থেকে আলমৌড়ার বাগেশ্বরাদি তীর্থ হয়ে যে পথটি সেটিও কম প্রাচীন নয়। সবাই যাঁরা তীর্থের ইতিহাস জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন বাগেশ্বর অতিব প্রাচীন তীর্থ। ঐ পথটা বহু তীর্থে পূর্ণ। পিণ্ডার গঙ্গার গতি ধরে এক দিনের পথ পিণ্ডার তুষার ভূমি। ঐ পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার দেখতে অনেক ইউরোপীয় পর্য্যটক হিমালয়ে ভ্রমণ করেছেন। শুনেছি বাগেশ্বরে এত শিবমন্দির আছে এত মন্দির হিমালয়ের আর কোথাও নাই।

আর একটা সুখের কথা আছে এখানে যে স্থান পেয়েছিলাম তা সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। কমলীবালার ধর্ম্মশালায় একখানা করে। স্পেশাল ঘর, চাবি দেওয়া থাকে কর্ত্তাদের কেউ এলে সেই ঘরে থাকে,—অন্য সময় কারো অধিকার নেই সে ঘরে প্রবেশ নিষেধ। কি সুন্দর আসবাবে ভরা ঘর খানা। দুখানা খাটিয়ায় সুকোমল শয্যা, দুখানা রাগ তার উপর। চেয়ার, টেবিল, ইজিচেয়ার ইত্যাদি সবই সুন্দর কালি কলম লিখবার কাগজ সবই মজুত আছে।

গতকাল সকালের কথা, হেডকোয়ার্টার হৃষীকেশ থেকে ঘোড়াতে এসেছেন এক যুবা পুরুষ তার নাম পুরুষোত্তম দাস। প্রথমে এসেই পাউড়ির ম্যাজিস্ট্রেটের একখানা চিঠি নিয়ে বিপদে পড়লেন কারণ তিনি সে পত্রের পাঠোদ্ধার করতে না পেরে প্রমাদ গণলেন। ধর্ম্মশালায় যে ঘরে তিনি ছিলেন তাঁর ঠিক কাছেই আমাদের প্রকাণ্ড ঘর যাত্রী ভরা, আর গোলমালও কম হচ্ছিল না। আমি বাইরে গেলাম খানিক ঘুরে আসতে। বেরিয়ে নীচের দিকে নেমে খানিক এসেছি এমন সময় দেখি সস্ত্রীক ইউরোপীয় একজন দেখছিলেন চারদিকে ঘুরে ঘুরে, আর হাতে ছোট্ট একটি স্ন্যাপশট্ মহামূল্যবান ক্যামেরা। আমি চিনতাম ঐ জিনিসটি, জাইস আইকন লেন্স। দাঁড়িয়ে গেলাম কতকটা তাদের পিছনে। দেখেই তিনি তার নিজ কাজ করতে মন দিলেন আমিও আমার স্কেচ বুকটি নিয়ে খস্ খস্ করে পথের লোকের সঙ্গে ঐ দুই মূর্ত্তি স্কেচ সুরু করে দিলাম। তাঁর কাজ এক মুহূর্ত্তেই হয়ে গেল আমার কাজ তখনও চলছে। তাঁরা দুটিতে এসে দাঁড়ালেন, এবং খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি এমেচার না প্রোফেশাণ্যাল। এই সূত্রেই যখন আমরা আলাপ করছিলাম, পুরুষোত্তম দাস

দেখছিলেন। যখন সায়েব চলে গেল তখনই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা হোলো,—হেথা কোথায় থাকি। তাদের ধর্ম্মশালায় থাকি শুনে খুব খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিরকম জায়গা,—আমার কষ্ট হচ্ছে কিনা। ভীড়ের কথা, অসম্ভব গোলমালের কথাই বললাম। তখনি সে আমায় বললে, মালপত্র নিয়ে চলে আসুন না আমার ঘরে; বোলে নিজে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরের দুখানা খাটিয়ার একখানা আমায় ছেড়ে দিলে, আর কি অসুবিধা সব জানাতে অনুরোধ করলে, এমন কি আহারাদিও দুজনে এক সঙ্গেই চললো। জেঠামশাই যেখানে ছিলেন সেইখানেই থাকলেন। খুব যখন ভাব হয়ে গেল তখন, পাউড়ির ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র বার করে, তার মর্ম্মার্থ শুনে নিয়ে একটা উত্তর লিখে দিতে অনুরোধ করলে। আসলে ব্যাপার কিছুই গুরুতর নয়,—পাউড়ি থেকে তিনি আসচেন, যতদিন না এসে পৌছাচ্চেন ততদিন,—এখানকার তীর্থযাত্রীদের এমনভাবে সেখানে ধর্ম্মশালা বা চটিতে স্থান দিতে হবে যাতে তাদেরও অসুবিধা না হয় আর বেশী ভীড় এবং নানা ভাবের উশৃঙ্খল স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধভাবের ব্যবহারের ফলে রোগাদি না জন্মাতে পারে। এ বিষয়ে সরকারী যে ব্যবস্থা আছে তার উপরে তাদের নিজেদের দায়ীত্বেই এই সকল লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ সরকারী ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়। ইত্যাদি। আমি তার উপদেশ মত পত্রের একটা উত্তর লিখে দিলাম, তিনি সেটা হৃষীকেশে পাঠিয়ে দিলেন ডাকে। এই সম্বন্ধটা ঘনীভূত হয়ে গেল যে তিন দিন ছিলাম, তারপর, যখন ওখান থেকে আমরা বসুধারা,—শতোপন্থ হ্রদ দেখতে গেলাম ফিরে এসে আরও এক রাত্র ও একদিন বিশ্রাম করে ছিলাম প্রায় ছয় দিন বাদে তবে আমরা বদরীনারায়ণ ত্যাগ করি।

এখন এখানে যে দেব দর্শনের উৎসব তার সঙ্গে সাধুদর্শনও কম নয়, নিত্যই চলতে লাগলো তা আমাদের পক্ষে মহা-আনন্দের। সেই সায়েব ডাক বাংলায় থাকতেন। ওখানে সরকারী ডাকবাংলা যেখানে, সেখানে থেকে দৃশ্য সর্ব্বোত্তম।—ঐখানে বসে বসে অনেক কিছুই দেখা এবং উপভোগও করা যায়। সায়েবটি ইউরোপীয়, কিন্তু বৃটিশ নয়। তিনি খুব সম্ভব পোল,—না হয় জেক্। কারণ তার ইংরাজী ভাষা খুব স্বচ্ছন্দ গতিশীল নয়, তবে আমাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানে কষ্ট হয়নি। তাঁরা আমাদের আগেই চলে গিয়েছিলেন মানার পথে। তাঁদের সঙ্গে প্রায় ছয় সাতটি বাহক ও অনেক মাল পত্র ছিল। আমার সঙ্গে বেশ জমে গিয়েছিল, বলেছিলেন আসচে অক্টোবরে কলকাতায় থাকবেন। তাঁর প্রোগ্রাম আমায় দেখালেন, এই মানা পথ দিয়েই সামনের সপ্তাহে টিবেটে যাবেন আর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ঘুরবেন। তার সঙ্গে দফায় দফায় আমি প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে ছিলাম। চমৎকার সহজ সরল ব্যবহার, এমনটা যে এখানে ঘটবে তা কল্পনাও ছিল না। অবশ্য কল্পনা ছিলনা এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার দুই একটি এখানে ঘটে গিয়েছিল, এখন সেই কথাই বলছি।

প্রথমটির কথা,—যেমন অলকানন্দার গলিত তুষার এবং শীত জর্জ্জরিত প্রবাহ আছে, এখানে তপ্ত কুণ্ডও আছে আর সেই স্থানটি অলকনন্দার কাছেই, কাছাকাছি দুই রকম জলই আছে, এও এক কম বৈচিত্র্য নয়। দুইই পবিত্র যার যেটা ইচ্ছা সেই জলে স্নান করবে। স্বভাবতঃ গরম জলের কাছেই ভীড় বেশী। আর অত সকালে ঠাণ্ডাজলে স্নান করে দেব দর্শনে বা পূজায় যাওয়ার দায় তারই যাদের শক্তি আছে, তিতিক্ষা আছে। সাধারণের তো তা নেই কাজেই যত ভীড় ঐ তপ্ত কুণ্ডের ধারেই। আজ দেখি একজন গৈরীক ধারী, যুবা পুরুষ হিন্দুস্থানী সাধু, জয় বদরী বিশাল কী, বোলে খড়ম পায়ে খট্‌খট্ করে নেমে গিয়ে উঁচু নীচু পাথরের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে গিয়ে নদীর স্রোতের উপরে দাঁড়ালো, একেবারে ঠিক স্রোতের মাঝখানে, এক হাটুর কতক উপরে সেখানে জল, আর সঙ্গমের বেগ, সে বেগের কথা বেশী বলাই বেশী কথা। সে একেবারেই লোহার মত অটল অচল দাঁড়িয়ে রইলো। কোন কথা নেই হাত দুটি বুকের উপর; আমরা অনেকটাই উপর থেকে দেখছি। দেখতে দেখতে একটি প্রৌঢ়ী, কাঁচাপাকা চুল তার, রোগা শরীর, শুষ্ক মুখ, মাথা যেন ঝুপী জঙ্গল হয়েছে, আমাদের ঠেলেঠুলে নামলো জলের কাছে তারপর, হাত বাড়িয়ে যুবার দিকে, আ যা, মেরে লাল, মেরে গোপাল, বোলে সেই জলে নামতে যায়। সেই স্রোতের মধ্যে পড়লে আর দেখতে হবে না কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার প্রাণ বাঁচানো কঠিন হবে, সবাই বুঝলে। দুই একজন পাগলিনীর কাছে পৌছাবার জন্য ছুটলো কিন্তু সেই যুবা তাড়াতাড়ি চলে এলো স্বস্থান থেকে, তার আর গাম্ভীর্য্য রইলো না, এসে একেবারে জননীকে দুই হাতেতে পাঁজাকোলা করে একটি শিশুর মতই তুলে নিয়ে উপরে এলো এনে শুইয়ে দিলে জমির উপর। যুবা সবার দিকে চেয়ে বললে, থোড়া নজর রাখনা ম্যায় অবি স্নান করকে আতাহুঁ। বোলে যেই যেতে উদ্যত হোলো, অমনি সেই বুড়ি উঠে বসলো, ছেলের কাপড় ধরে বললে, না যাও বাচ্ছা, তুম স্নান পে না যাও, আচ্ছা হোগা নহি, তুমহারা খুন পে কসর হৈ, নাহাও তো গরম জলমে, বো তপ্ত ধারেমে নাহা করো, মেরে বাত তো মানো। ছেলে এবারও মানলে না মায়ের কথা। তখন একজনকে উদ্দেশ করে বুড়ি বললে, মেরে বাচ্চা তো বিমার, কাল মর গয়েথে, এতনি ওয়াখ্‌ত তো হোস্ নহি থা, পরশু তক্ চার দিন বুখার চঢ়ি গইথি। এক সাধু মহাত্মানে বাচায়,—উনিকা কৃপাসে কাল সুব কো সব ছুটগয়ি। বুখার টুটগই, সরদি উতার গই,—দুপহর কো আচ্ছা ভঁই, উঠ বৈঠা। ঔর রাতকো থোড়া কুছ খানাপিনা কিয়া, ফির রাত কো সো গয়া। অব বিছোনা ছোড়কে গঙ্গে মে আয়া, ঠাণ্ডা জলমে অরোগ স্নানকো বাস্তে। মিনতির সুরে, করুণ নয়নে সবার দিকে চেয়ে বুড়ী বললে,—দেখো তো!

বুড়ি বলে তপ্তধারায় স্নান, ছেলে চায় গঙ্গার তুষার প্রবাহে আরোগ্য স্নান করবে ত। এখন মায়ে পোয়ে যখন এই বিষয় নিয়ে চলচে তখন দেখি আর এক সাধুর আবির্ভাব হোলো সেখানে। তিনি অতীব বৃদ্ধ, গৈরীক ধারী তার উপরে এক ছেঁড়া কম্বল। এসেই যেমনি বুড়ির কাছে দাঁড়ালো, ছেলেও দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সেই স্থবীর সন্ন্যাসী তখন ছে াকে বললেন, অব তুহার বিমার ছুট গই তো, ঠাণ্ডে ওর গরম ষহাঁই স্নান করো, তুমহারা তো কুছ হরজা নাই হো সকতি। অব যব আপনী জননী, দেবী, তুমকো তপ্তকুণ্ডমে স্নান করনেকো বোলা, তব বোই তপ্ত ধারেমে স্নান করণেমে তুমারা ক্যাহরজ তপ্ত ধারেমে স্নান করলো বাচ্ছা? যুবাও তৎক্ষণাৎ বোললে, অব বো ই করুঙ্গা মহারাজ। বোলে তৎক্ষণাৎ তপ্ত ধারার দিকেই চললো। ছেলেও গেল দেখেই জননীও সেইখানেই বসে গেল। তারপর, ছেলের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ঢলে পড়লো পাশ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে তখনই তার প্রাণান্ত হয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ঐ স্থবীর সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েই প্রণাম করলাম, তিনি মাথায় আমার ডানহাত খানি রাখলেন। তখন আমি কৌতুহল বশেই সুধালাম যে এই নাটকীয় ব্যাপার কি? যা দেখেছিলাম সবই বললাম। তিনি যা বললেন, তার ভাবটা এই, এটা প্রারব্ধেরই খেলা। ঐ যোয়ান ছেলেটার মৃত্যু যোগ ছিল, ওর মা তা জানতো, আমিই তাকে বলেছিলাম। কিছুকাল আগে সন্ন্যাস নেবে বোলে যখন আমার কাছে আসে তখনই, আমি ওটা দেখেছিলাম ওর কোষ্টিতে। ওকে সব বলতে চাইনি, সুধু বললাম, তোমার মায়ের অনুমতি হলে সন্ন্যাস হবে। জানি ওর মা কখনই অনুমতি দেবে না। পাণ্ডুকেশ্বর থেকেই ওরা আসচে। নিয়তিই ওদের এইখানেই এনেছে আরও দেখ এখানে আমিও আছি, এমনই সময় ওরা এলো, কোথায় উঠলো জানিনা। এসেই ছেলেটির জ্বর বিকার হোলো, এই রোগেই দেহ ত্যাগের কথা। কিন্তু মা কিছুতেই ওকে প্রাণ থাকতে ছাড়বে না। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে কাল ভোরে দেখা, আমায় ধরলে ওর ছেলেকে রোগ মুক্ত করবার জন্য। কান্না আরম্ভ করলে। আমি তো অবস্থাটি আগেই বুঝেছিলাম মাকে খুলেই বললাম সব, যে ও এই ক্ষেত্রে মুক্ত হবে আর অনিবার্য্য মৃত্যু যোগ। ওর মা ওকে ছাড়বেনা, বললে আমার আয়ু দিচ্ছি, ওকে বাঁচাও। আমি বললাম, নারায়ণকে জানাও, বদরীনারায়ণের ইচ্ছা। এখন দেখচি বুড়ি ঠিক ঠিক নারায়ণের কাছে জানিয়েছে, আপনার অবশিষ্ট পরমায়ু দিয়ে ছেলেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছে। এটা কাল ঘটেছিল, আজই ভোরে থেকে আমি ঐ মায়ের কি হোলো, জানতেই এসেছিলাম এখানে। আমি জানতাম যা কিছু ঘটবার আজ এইখানেই ঘটবে। এখন তো দেখছি নারায়ণ মাকে মুক্ত করেছেন। এই ক্ষেত্রে

দেহত্যাগ করে ওর মায়েরও উচ্চগতি হোলো, আর ওর সন্ন্যাস নেবার সুযোগ হয়ে গেল। এই ব্রহ্ম কপালে এখনই ওর মায়ের শেষ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে ও প্রবর্জ্যা গ্রহণ করবে, আমি এই খান থেকেই সব ব্যবস্থা করবো।

এই যে ব্যাপার এখানে দেখলাম এমনটা কখন কল্পনাও করিনি যে, স্বচক্ষে এই সব দেখবো। সুধু আমি নয়, অনেকেই দেখেছেন। এখানে যারা যারা আসেন তাদের মধ্যে অনেকের এই তীর্থে স্নান শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদানে এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শনেই পুণ্য সঞ্চয় করার ইচ্ছাই বেশীর ভাগ। কিন্তু মহাসুকৃতি, শুভ সংস্কার প্রভাবে এমনই কেউ যাত্রীদের মধ্যে থাকেন যাঁরা এই নশ্বর জীবন এইখানে শেষ হোক এই কামনা করে আসেন। অবশ্য সেই সকল মহাপ্রাণ নর নারী নিতান্তই কম সংখ্যক সে কথা বলাই বেশীর ভাগ, তাই না বলাই ভালো। প্রাণের মেয়াদ বা আয়ুবৃদ্ধি চায় সবাই। জীবন বা আয়ু ভোগই কাম্য, প্রায় সবারই তাই। কিন্তু এমনও মানুষ দেখেছি। পবিত্র তীর্থ স্থানে দেহত্যাগ আর সে সময়ে কাছে কোন আত্মীয় স্বজন থাকবে না, মায়া মমতার কোন বন্ধন সে সময়ে কোন বাধা সৃষ্টি না করে, ইষ্টের কাছে এই কামনা করে তীর্থে ঠিক ঐ ভাবেই দেহত্যাগ করতে একজনকে দেখেছি।

কেদারনাথের কথায় যে বিশিষ্ট ধর্ম্মশালার প্রসঙ্গে ৺হরিদাস গুপ্ত নামে এক ত্যাগী পুরুষের দেরাদুনে অকালে জীবনান্ত হয়েছিল তাঁরও ঠিক ঠিক ঐ ভাবে আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না কাছে, কেবল ইষ্ট আর তিনি, এ কথাও তখন বোলেছিলাম। ঐ ভাবে দেহত্যাগে আমাদের কাছে কি পরিচয় দিয়ে গেলেন? এই প্রশ্ন একটি আছে।

পাঠকের মনে থাকতে পারে প্রথমে হরিদ্বার থেকে যে পাণ্ডা বালকিশন, একদল যাত্রী নিয়ে যাত্রা করেছিল, যার সঙ্গে আমি হৃষীকেশ পর্য্যন্ত এসেছিলাম, সঙ্গে তখন রামপ্রসাদ ছিল, তারপর থেকেই ছাড়াছাড়ি। এখানে তার সঙ্গে প্রথম দিনেই দেখা হয়ে গেল, এ দেখার একটু বিশেষত্ব আছে,—সে কথাটা এখনও বলা হয়নি। আমি ঠিক কোরেছিলাম, অন্ততঃ সারা পথটাই এই ভেবেই এসেছিলাম যে আমি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, সে আর আমার কাছে কিছু পাওনা দাবী করতে পারবে না যেহেতু আমি তার সঙ্গে আসিনি। কিন্তু যখন দেখা হোলো তখন তার কথা এবং আলাপ এবং ব্যবহার দেখেই, বিসনেসম্যান্ ইন্ দি স্ট্রিকটেস্ট সেন্স্ বোলে মাড়োয়ারীদের উপর যে শ্রদ্ধা আমার ছিল সেটা সে ছিনিয়ে নিলে, আর তা নিলে নিজের অধিকারের জোরে। যেখানে এখন আছি সেই কমলীবালার ধর্ম্মশালার পাশের বাড়ি থেকেই বেরিয়ে আসচে এমনই সময়েই দেখা। সে প্রথমেই জানালে দলবল নিয়ে আজই বিকালে সে চলে যাচ্ছে কারণ এখানকার সব কাজই হয়ে গিয়েছে, ত্রিরাত্র বাসও কাল শেষ হয়েছে।

আজ এই যাত্রা শেষে মহাতীর্থে এসে, ফিরে যাবার আগে, আমার সঙ্গে দৈবযোগে

দেখা হতে সে যে সব কথা বললে তা সব দিতে গেলে আর একখানি গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই যে আগাগোড়া অপরিচয়, তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় যা কিছু বাদ গিয়েছে, চক্রবৃদ্ধির হারে তার সুদ সুদ্ধ আদায় করে নিলে। আমায় যত কথা বললে তার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ আর ব্রহ্ম কপাল কথাটা আট থেকে বোধ হয় দশবার ব্যবহার করলে। তার যাত্রীদের সুখে শান্তিতে সে সবই হয়ে গিয়েছে, এখন এখান থেকে একেবারে পাণ্ডুকেশ্বরে চলে যাবে আজ সে কথাও দুবার শুনিয়ে দিলে। তার সব কথা ফুরোয় না দেখেই আমি, রাম রাম বোলে সরে পড়বার চেষ্টা করচি,— তখন সেই ঝানু লোকটা বলে কি ?—আমরা তো চলেই যাচ্ছি তুমি তো রইলে, তোমায় সব কথা বোলে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে না ?

ধন্য তার পুরুষার্থ, দেখলাম সে আমায় তার একজন সহকর্ম্মীর হাতে গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে চায়। আমি তা না চাইলেও, শেষ অবধি সে সেইখানেই একজন ছোকরাকে ডেকে তখনই সে কাজটা সিদ্ধ করে নিলে। ছোকরা দাঁড়িয়ে রইলো দেখে সে খলিফা লোকটা অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবেই আমায় একটু তফাতে তার আড়ালে নিয়ে, বাবুজি ! তোমরা দুজনে আমরাই সঙ্গে যাত্রা করলে তারপর পথে আলাদা হয়ে গেলে। বুঝলাম রামপ্রসাদের কথা বলছে। তাই দুজন ধরেছে অথচ সে ওর সঙ্গে কোন কথা কয়নি, কথা দুচারটা অপরাধের ভিতর আমিই কয়েছিলাম। যাই হোক তাকে আমি ঐ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সব কথাই বললাম যে সে শ্রীনগরেই পৃথক হয়ে গিয়েছে। তখন থেকে আমিতো একলাই। কিন্তু আমার কথা সে গ্রাহ্য না করেই বলে চললো,

বাবুজী,—আমরা তীর্থ গুরু, আমার আশ্রিত একজনকে ভাঙিয়ে নেওয়া তোমার কি ভাল কাজ হয়েছে, নিশ্চয়ই পাপ লেগেছে। তা সে যাই হোক এখন আমায় সন্তোষ করাই তোমার কর্ত্তব্য। সে তুমি করো বা না করো আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিক করে যাবো, তোমার কর্ত্তব্য এখানে যা যা করতে হবে, তীর্থ সফল হবে যাতে, তা আমাকেই করতে এবং বোলে দিতেই হবে। তাইই এতো করেই বলে যাচ্ছি।

কোন রকমে এ বেলাটা যদি এর সঙ্গে দেখা না হোতো, তা হলে বাঁচা যেতো। আমি তাকে প্রথমেই বললাম, যে আমি তীর্থ ধর্ম্ম করতে আসিনি, বেড়াতেই এসেছি। কিন্তু কে শোনে সে কথা ;—সে বলে ; এত কষ্ট করে এসে, কেবল পাহাড় পর্ব্বত আর বরফান দেশ দেখে চলে গেলে চোখের সুখ হতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম হবে না।—আমরা তীর্থগুরু, শাস্ত্রে একথা লেখা আছে, এসব দেখো,—আমাদের ফাঁকি দেওয়া মহা পাপ। আমরা কখনও অধর্ম্মকারী নয়, ইত্যাদি কোথায় দিল্লী কোথায় মেরট, কোথা কাশী পাটনা, কোথা এলাহাবাদ, কোথা গয়া কোথা কলকত্তা,—এই সব ঘুরে ঘুরে, কারা তীর্থে যাবার জন্যে বসে আছে তাদের পথ দেখিয়ে কেদার বদরীর চড়াই ভেঙে কত

দুঃখ করে এই স্বরগ ধামে নিয়ে আসি, সেই জন্য তো তীর্থগুরুর দায়ীত্ব এত বেশী, কুলগুরুর চেয়ে তীর্থগুরু বড়, শাস্ত্রে লেখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালো লোকে, ধার্ম্মিক লোক যারা এসব তারা মানে। দরকার হলে, তাদের বিশ্বাস করে আমরা পয়সা টাকা পর্য্যন্ত যা দরকার তা দিয়ে দেশে ঘরে পাঠাই। এসব আমরা যে করি কেন না, আমাদেরও এতে পুণ্য আছে। তোমাদের পুণ্যে আমাদের পুণ্য। আমরা তীর্থগুরু হয়ে, এসব যদি এখন না করি তোমাদের তীর্থ ধর্ম্ম তাহলে হবে কেমন করে ?

এমন ফ্যাসাদেও মানুষ পড়ে, কতক্ষণে উদ্ধার পাবো তাই ভাবচি। আমার ইচ্ছা না থাকলেও জোর করে দলভুক্ত করবে আবার লাভের টাকা আদায় করতে চায়। তাকে থামাতে না পেরে বললাম, ভারি সুন্দর বাংলা বোলতে পার তো পাণ্ডাজী। আমার কথায় সে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো—পারবো না, আমার যজমান সবই যে বাঙ্গালীই ; কলকত্তা, শিরামপুর চৌবিশ পরগণার যত বড় বড় লোক যে আমার যজমান, সব, আমি তাদেরই তীর্থগুরু। মেহনতও আমরা কম করিনা বাবুজী,—শাস্তোর মাফিক নিখুঁৎ সব কাজ করিয়ে দি। হাজারও লোকের ভীড় ঠেলে দর্শন ভি করিয়ে দি। আবার ঘরে পৌছাই। আমি বাঙ্গালা শিখবো না ?

দেখলাম চুপ করে সব কথা শুনে যাওয়ার বিপদ আছে, লোকটা থামবার নামও করে না আমি তখন দড়ি ছেড়া হয়েই, আচ্ছা তাহলে, বোলে যখন নিশ্চিত পিছনে ফিরে চললাম, দেখে সে তার ক্রুর প্যাঁচটা আরও একপাক এঁটে দিয়ে গেল, এই বোলে, তা গুরুকে শিষ্য না দিলে গুরু খাবে কি, বাঁচবে কি করে। তার সেই ছোকরা পাণ্ডা আমায় চিনে রাখলে। রাধা কিষণ যখন দেখলে আমি এখন একান্তই পিছন ফিরলাম তখন সেও চলতে চলতে বলতে লাগলো, তুমি, আপনি এখানে ত্রিরাত্র থাকবেন তখন ব্রহ্মকপাল,— আমি আর শুনলাম না।

তীর্থে এসে, তীর্থের করণীয় অনেক ব্যাপার আছে, যেমন পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ। এখানে ব্রহ্ম কপাল বলে একটি বিশেষ স্থান আছে গঙ্গার উপরেই পাথর বাঁধানো বিরাট এক চত্তর সেই খানেই যাত্রীদের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের ব্যবস্থা পাণ্ডা পুরোহিতেরাই করে থাকেন, যাত্রীদের কেবল অর্থ যোগান থাকলেই হোলো। পরদিনই আমাকে বালকিষণ নিযুক্ত সেই নবীন পাণ্ডাটি, এখানেই ধরে বসলো,—বললে, কৈ এখনও তুমি তো মুণ্ডন বা শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করলে না ? উত্তরে বললাম, আমার বাবা, মা এমনকি ঠাকুরমা দিদিমা পর্য্যন্ত বেঁচে আছেন। তাতে সে বললে, আরও সেইজন্য তোমার করা উচিত। কেন ? যেহেতু তুমি এসে পড়েছ এখন এই মহাতীর্থে তখন তাঁরা বেঁচে থাকলেও করা উচিত কারণ এতে নিশ্চয়ই তাঁদের পরলোকে কল্যান হবে। আর ধরো তুমি এসেছ কতই পুণ্য ছিল তোমার পিতৃপুরুষের, তাই না তুমি আসতে পেরেছ ?

ধরো তোমার পর আর কেউ আসতে পারলেনা। তাহলে তাদের পরলোকের কি গতি হবে? আর তোমারই বা কি গতি হবে যদি তোমার সন্তানাদি এখানে এসে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ না করতে পারে? আমি একটু চিন্তিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে এখন আমার কি করা উচিত বলে দাও। আমি না হয় তাই করবো, পরলোকের কথা যখন,—এখনই তো ভাববার কথা!

সে উৎসাহিত হয়ে তখনই বললে, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি এখানেই থাকো, আমার বড়ো পুরোহিতকে ডেকে আনি। সে যায় আর কি;—দেখে বললাম, ক্রিয়াকর্ম্ম পরেই হবে, এখন শুনতে চাইচি কি করতে হবে। সে বলে কি,—সবার আগে তোমার পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধোতন তিনপুরুষের শ্রাদ্ধ, পিণ্ড ও জলদান করতে হবে, পিতৃকুল হলে, মাতৃকুলেরও এখন ঐভাবে স্বর্গতঃ তিনপুরুষের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড ও জলদান হয়ে গেলে তখন জীবিত যারা, বাপ মা ঠাকুরমা দিদিমা এদেরও পরলোকের কল্যাণের জন্য ঐভাবে শ্রাদ্ধাদি, পিণ্ডদান করে সবশেষে তোমার—

সর্ব্বনাশ, আমারও জীবন্তে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান? হাঁ, হাঁ,—এর ফল আছে, এতো আর যে সে যায়গা নয়, ব্রহ্ম কপাল যে,—ধর, যদি ভবিষ্যতে বংশের মালিক কেউ এ পথে আর না আসতে পারে তখন তোমার কি গতি হবে?—তাই এখনই এই ব্রহ্ম কপালে তোমার শ্রাদ্ধ করা থাকলে, এই শ্রাদ্ধ তখন ফল দেবে। তুমি একটু দাঁড়াওনা আমার বড়ো পাণ্ডাকে ডেকে আনচি, সে তোমার সব বুঝিয়ে দেবে। আমি বললাম, বুঝিয়ে দিতে কি তুমি কিছু বাকী রাখলে যে আরও বুঝতে হবে তার কাছে। সে নাছোড়বান্দা হয়ে বললে অনেক বাকী আছে,—ধরো তোমার ভবিষ্যৎ বংশেরও একটা শ্রাদ্ধ প্রথা আছে, ধরো, তোমার ছেলে,—আমি বললাম, ছেলে আমার নেই, শুনে সে বললে, হবে তো পরে, আর ছেলে হোক মেয়ে হোক ভবিষ্যতে তোমার বংশে যে কেউ আসবে তাদেরও সদগতি হয়ে থাকবে তখন আবার এসব করতেই হবে না।

যখন কৃশ্চান মিশানারীরা প্রথমে এদেশে এসে হিন্দুদের মধ্যে তাদের আলো বিকীরণের চেষ্টা করেছিল তখন তারা এসব জানতোনা, এই তীর্থের ভগবানের নামে হিন্দুরাই হিন্দুদের একসল্লইট করচে। তাই প্রথমেই তারা মূর্ত্তিপূজার পিছনেই শুধু লেগেছিল। তারপর যখন তারা জানতে পারলে তখন তারা তীর্থস্থানের ভগবানের নামে ঐ সকল ধর্ম্মের নামে পাপাচার বলে প্রচার আরম্ভ করলে হিন্দুদের কাছে,—তখন হিন্দুর মধ্যে ইউরোপীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ইতিহাসের এবং দার্শনিক জ্ঞানাধিকার এসে গিয়েছে সেই সময়েই মিশনারীর সঙ্গে হিন্দুর তর্ক বেধে গেল, বহুদিন চলেছিল এর জের। মিশনারিরা বলতো তীর্থের মধ্যে ভগবানের নামে এসব তোমাদের পুরোহিতদের কি অদ্ভুত পাপাচার?

আমার সামনেই গোল দিঘিতে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল বোলেই বেশ মনে আছে। জ্যোতিশ বোলে আর্য্যমিশনের ফাইইয়ারের একটি ছেলে,—সেইই বলে উঠলো, হে ধর্ম্ম প্রচারক! তুমি থামো, তোমাদের রোম্যান ক্যাথলিকেরাও এরচেয়ে সরল ধর্ম্মপ্রাণ এবং তীর্থ যাত্রীদের এক্সপ্লইট্ কম করেনি, যারজন্য মার্টিন লুথারের মত একজন প্রোটেষ্টাণ্টের আবির্ভাব হয়ে ছিল। অবশ্য তারপর দুইদলের ইতিহাসই আলাদা। ও দেশের ধর্ম্ম নিয়ে নৃশংস বর্ব্বরতা অনেকদিনই চলেছিল নানারাজ্যে,—আমাদের দেশে কিন্তু ঐ তীর্থস্থানে একশ্রেণীর নিরুপায় পূজারী বা পাণ্ডার মধ্যেই রয়ে গেল। যাই হোক এখন এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্ম ধর্মের জন্ম, জীবন ও বৃদ্ধির মধ্যে দেশের মুষ্টিমেয় এক সম্প্রদায়ের যতই উন্নতি হোকনা কেন আসলে হিন্দুর জাতিগত তীর্থধর্ম্ম এবং পূজা উৎসব, দশবিধ সংস্কারের সর্ব্বক্ষেত্রেই হিন্দুজাতিবৃক্ষের শিকড় এতটা গভীর ভাবে প্রবেশ করে আছে তার মূলোচ্ছেদ করতেই পারেনি। আমি যদিও ব্রহ্ম কপালের ঐ পাষাণ নির্ম্মিত চত্তরের মধ্যে কোন কর্ম্মই করেনি কিন্তু বাকী শতকরা সাড়ে নিরানব্বইজনকে করতে দেখেছি আর সাক্ষী হয়ে আছি তাতে আমার কিছু করা না করার কোন অর্থই হয় না। ঐ ব্রহ্মকপালেই সেই নবীন সাধুর মাতৃদায় উদ্ধার দেখলাম আবার মুণ্ডনের পর তাকে এখানেই বিরজা হোমাগ্নিতে শিখাসূত্র ত্যাগ করে সকল সংস্কারমুক্ত হয়ে প্রবর্জ্যাগ্রহণ করতেও দেখলাম। তাঁর লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে যে বৈরাগ্যের জ্যোতি দেখলাম, আমার মাথা আপনি তার চরণের উপর নতি স্বীকার করলে। জীবন্ত বৈরাগ্যের ইতিহাসের অংশ আমারই সামনে অনুষ্ঠিত হতে দেখলাম যা এর আগে কোথাও দেখিনি। কাশীতে কতো ঘুরেছি কিন্তু এমন সন্ন্যাস দেখিনি,—মনে হলো যেন আমারও মানসের মধ্যে সন্ন্যাস হয়ে গেল। বদরীনারায়ণে এসে প্রথম দু দিনেই এমন সব বিষয় অথবা ব্যাপার দেখলাম, যা বহু যাত্রীর ভাগ্যে ঘটে না। অবশ্য এর সঙ্গে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের কোন যোগ নেই বটে, বাইরে থেকে দেখতে এমনই মনে হয়,—কিন্তু নেই বলবই বা কেমন করে? যথার্থ তীর্থ যাত্রীদের এর সঙ্গেইতো যোগ। ব্রহ্মকপালের মধ্যে এই অনুষ্ঠানই চূড়ান্ত অনুষ্ঠান বোলে ধরে নিলাম। অবশ্য এরপর শুনেছিলাম অনেক সম্প্রদানের প্রবর্ত্তকেরা এই ব্রহ্মকপালেই বিরজা হোম সম্পন্ন করেই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেছেন, কাজেই ঐ ব্রহ্মচারীই এখানে চতুর্থাশ্রম গ্রহণের দৃষ্টান্ত নূতন নয়।

এমন সময়ে আমার এখানে আসা হয়েছিল, বোধ হয় যাত্রী সমাগম এই সময়টাতেই খুব বেশী, নিত্যই নব নব যাত্রীর আসা, আর প্রত্যেক দিনই নানা রকমেরই যাত্রীদল দেখেই আনন্দ। ঠাকুর দেখা, মন্দিরের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, নারায়ণের অপরূপ ভাস্কর্য্য শিল্পের অপরূপ নিদর্শন, শুধু ঐটি নয় আসে পাশে লক্ষ্মী গণেশাদি পঞ্চদেবতার অবস্থিতি স্থানের,

কালের, এবং অন্তরের একাগ্রতা বাড়িয়েছিল বললে ভুল হয় না। কেদার আর বদরীর তুলনা স্বতঃই মনে আসে, যারা এক যাত্রায় দুটিই দেখেছে তাদের। আমার বদরী নারায়ণ গ্রামখানিতে এসে অবধি কেন জানিনা ঐ কেদারের কথাই মনে যেন সর্ব্বক্ষণই ছিল আর সুধু তাই নয়, এখানে যা যা দেখেছি অবশ্য সহজ ক্রিয়া কর্ম্ম যা দুই স্থানে একই রকম যেমন পূজার্চ্চনার বিষয়, মন্দিরের খবরদারি এ সব ছাড়া কেদার যেন ঢের বেশী গম্ভীর আর মহিমা মণ্ডিত এতটা শীতের প্রকোপ সত্ত্বেও দেশের বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভারতের লোক যারা শীতকে গভীর ভাবে পায় না তাদের মধ্যেই শীতের প্রখর ভাবটা সংক্রামিত হয় বেশী। একজন দিল্লী থেকে এসেছিল তার সঙ্গে এক পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই শীত নিয়ে কথা বার্ত্তা শুনেছি তাইতেই ঐ ধারণা আমার জন্মেছে। দিল্লী-ওয়ালাকে এখানে, অবশ্য প্রচুর শীত-বস্ত্রে সেজে, স্বচ্ছন্দে ঘোরাঘুরী করতে দেখে বঙ্গবাসী জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এই প্রবল শীতে তুমি এমন স্বচ্ছন্দে বেড়াচ্চ কি করে, আমার তো নড়তে চড়তে শীত লাগচে। দিল্লীওয়ালা তাকে বললে, বাঙ্গালী কলকাতাবাসী, তোমাদের ওখানেও শীতকা প্রবল শীতকে জানতেই পারো না, তাই তুমি এখানকার এই সময়ের শীতে এমন হিহি করচ, জড়ভরত হয়ে রয়েচ, নড়তে চড়তে শীতে কাঁপচো,—আমরা থাকি দিল্লীতে, সেখানে শীতের চেহারা জবর। সময় সময় এখন এখানে যে শীত তার চেয়ে ঢের বেশী শীত ভোগ করি, তাতে আমাদের স্বাস্থ্যও থাকে ভালো, আমরা ঐ রকম শীতেই মানুষ। তা ছাড়া নড়া চড়া বেশী করলে শীত কম লাগে, তুমি শীতের ভয়ে নড়তে চাওনা তাই শীত তোমায় এতটা জড়ীভূত করতে পেরেচে।

আমাদের বন্ধুটি সত্য সত্যই কথাটা বুঝলেন। এমন সত্য কথা, আর এমনই স্বাভাবিক এই ব্যাপার যা বুঝতে কষ্ট হয় না। শীতকে ভয় করে জড়ীভূত হয়ে থাকলেই শীতের প্রভাব বাড়ে। যারা একটু বেশী ঘোরা ফেরা করে তাদের তত শীত লাগে না, অন্ততঃ সহ্য হয়ে যায়, এটা করে দেখলেই একজন বুঝবেন। আমি নিজেই দেখেছি, প্রথম দিনে শীতের প্রভাব জানতেই পারিনি, বৈকালে তুষার পাতের পর তবে শীত পেলাম। এখানে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেই যে পথ, পাথর দিয়েই পথটা তৈরী, ঐ পথটি এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে বরাবর মন্দির হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তারই দুধারে দোকান। পথ চওড়া নয় সরুই বলতে হবে, কাজেই সর্ব্বক্ষণই ভীড়। ঐ এক রাজ পথে লোক সমাগম সকাল থেকে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত যতক্ষণ না মন্দির বন্ধ হয়। অবশ্য সন্ধ্যার পর কমে যায় ভীড় বেশী থাকে না।

এখানকার কথা এই, তোমায় মন্দিরে যেতে হবে ঐ পথে, তোমার বাসায়ও যেতে হবে ঐ পথে, বাজার বা জিনিষ পত্র খরিদ করতে, স্নান করতে যে কোন কাজেই হোক না

কেন ঐ পথ ছাড়া পা বাড়াবার জায়গাই নেই, কাজেই ভীড় হতে বাধ্য। বিশেষ এই সময়টাই এখানে লোক সমাগম বেশী, আগেই বলেছি। এত লোকের গতাগতিতেও অনেকটা শীতের প্রকোপ কম লাগে। আরও একটা অদ্ভুত সত্য, আমি আমাদের বাঙ্গালীর কথাই বলব অন্য প্রদেশের কথা না বলাই ভালো, এই বাঙ্গালী মরদেরাই শীতের প্রকোপ ভোগ আর হিহি করতে বেশী তৎপর কিন্তু তাদেরই সাথী মেয়েরা অনায়াসে ঘোরা ফেরা করচে, বাজার, দোকান, মন্দির সর্বত্রই যাতায়াত করচে অম্লান মুখে, তার মধ্যে প্রৌঢ়া আছে বুড়ীও আছে, যারা কাণ্ডি বা ঝাপানে এসেছে, নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে। বুড়ীদের খাওয়া তখুবই কম, বাঙ্গালার বৃদ্ধা উপবাসেই দক্ষ, এখানে একাদশী পড়লে নিরম্বু উপবাসও করচে, অন্ততঃ তাদের দেখলে, আমাদের মনে শ্রদ্ধাই আনে, হিন্দু বিধবা তার উপর বুড়ী যারা,তাদের তিতিক্ষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে। ষাট বছর বয়সে আমার পিসিমা এসেছিলেন বদরী,কেদার। সত্য বলতে কি তাঁরই কাছে শুনেই আমি বদরীকাশ্রমে আসতে প্রেরণা পেয়েছিলাম। বুড়ী ঠিক তিনি ছিলেন না, কিন্তু আহারাদি বিষয়ে এমন নির্লোভ মানুষ দেখিনি, আর এত কম আহারেও তিনি তিরাশী বৎসর বেঁচেছিলেন। তিনি কেদারেও ত্রিরাত্র বদরীতেও ত্রিরাত্র বাস করেছিলেন, খেয়েছিলেন প্রসাদের এক মুষ্টি অন্ন একবেলা তিনি রাত্রে একটু ছাতু একটু গুড়। পথটি মুখস্থ করে ছিলেন, বাঁদিকে পোষ্ট অফিস ডানদিকে প্রথমেই এক বেনের তারপর মনিহারীর দোকান তারপর ছবির তারপর বাঁদিকে যা কিছু সব সবই, ঠাকুরের সিং দরজা, তারপর নাটমন্দিরের যেথায় ঘণ্টা। মন্দিরের, অহল্যা বাঈয়ের মণিমুক্তার ঝালরওয়ালা চাঁদোয়া, নীল পাথরের চতুর্ভুজ মূর্তির কিচোখ, একেবারে চেয়ে রয়েছেন আমার দিকে। তারপর লক্ষ্মীর গহনা এ সব এমন দেখেছিলেন তাঁর তখনকার বর্ণনা যে নিখুঁৎ তা এখানে এসে প্রত্যেকটি মিলিয়ে দেখেছি, সত্যই নির্ভুল। মেয়েদের লক্ষ্য বা দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অবসারভেসান যাকে বলে পর্য্যবেক্ষণ, শক্তি তা কম নয় পুরুষের তুলনায়।

যাই হোক জয় বদরী বিশালকী বোলে আমরা অর্থাৎ আমি নিজে ও জেঠারাম আমার টাইমটেবল এণ্ড গাইড কম্বাইণ্ড, দুজনেই এই নারায়ণ গ্রামখানির বিশালতা সম্পূর্ণ অর্থাৎ আমাদের যথাশক্তি গ্রহণ এবং উপভোগ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন পুরঃসর আমাদের জন্ম ও জীবন সার্থক করেছিলাম মাত্র তিনটি দিন আর তিনটি রাত্র এই বদরীকায় বাস করে একথা কিছু মাত্র রঞ্জিত নয়।

আমার গোপন মনে একটা কৌতূহল প্রবল ভাবেই জেগে উঠেছিল, এইবার সেইটুকুই বলে নিচ্চি। এই তীর্থে সারা ভারতের লোক আসে, খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু আমার প্রাণের কথা হোলো আমাদের বাঙ্গালার কতগুলি মানুষ আসে, মোটামুটি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়? -সংখ্যায় কতটা, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সমান সমান,

অথবা বেশী বেশী। আমি তিনটি দিন ছিলাম, সেই তিনদিনের পরও শতোপন্থ হ্রদ, বসুধারা প্রভৃতি দেখে এসে আরও এক দিবারাত্রি ছিলাম তার পরই প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। প্রথম যেদিন আমরা এলাম, সেই সঙ্গে অন্ততঃ আটজন নরনারী হনুমান থেকে আমাদের সঙ্গেই ছিল, একেবারেই ঠিক সঙ্গে ছিল বললে ঠিক হবেনা কাছাকাছি ছিল, অর্থাৎ আমার লক্ষ্যের মধ্যেই ছিল ;—কিন্তু আমাদের অগ্রগামী দল থেকে দূরে আরও একদল ছিল তারা আমাদের পরে এক্ষেত্রে পদার্পন করেছে। এটা গেল প্রথমদল তারপর বৈকালে সন্ধ্যার আগেই আর একদল এইভাবে ছুটিদল প্রত্যহই আসে, আসচে আবার আসতে থাকবে। আমরা ঐদিন এসেই মোটামুটি দশ থেকে বারোটি বাঙ্গালী নরনারী দেখেছি। সেদিন তাহলে আমাদের হিসাবে এবেলা ওবেলায় চলেও গিয়েছিল প্রায় ততজন, যতগুলি এসেছে, সোজা হিসাবের জন্যই বলচি। মোটামুটি বারো থেকে চৌদ্দজন বাঙ্গালী নরনারী বদরীকাশ্রমে ছিল। তারপর বিকালের দল যেমন এসেছে, সেই দিনই নেমে গিয়েছে অথবা কেউ কেউ বসুধারার পথে গিয়েছে এঅঞ্চলের উত্তর দিকের অন্যান্য তীর্থগুলি করতে।

তারপর দ্বিতীয় দিনে, মনে হলো কিছু কম এসেছে সকালের দিকে, আমি নটা নাগাদ প্রবেশ পথের দিকেই ছিলাম ঘটনাচক্রে, কিন্তু নিশ্চয়ই ঐটা দেখবো বোলে নয়। তবুও দেখে ফেলেছিলাম। বাঙ্গালী ভদ্র পরিবার, প্রৌঢ়া, যুবতী মিলিয়ে নারী চার-পাঁচজন আর আট থেকে দশজন পুরুষ। তেমনি কয়েকজন বিদায়ও নিয়েছে জানি। দ্বিতীয় দিনে, বৈকালের দিকে বেশ বড় সাধারণ যাত্রী একদল এসে ঢুকেচে, বাঙ্গালা দেশীয় জোয়ান প্রৌঢ় তারমধ্যে পুরুষ ছয় সাত জন, নারী দুজনের বেশী নয়। আমরা লক্ষ্য করতাম এবেলা ওবেলা করে দু'দল যায় আর দু'দল আসে রোজই। তৃতীয় দিনে রেকর্ড ব্রেক করল,—সকালে বিকালে মিলিয়ে ষোলোটি বাঙ্গালী তারমধ্যে চার পাঁচজন নারী ছিল। অবশ্য প্রত্যাবর্ত্তনও করেছে সেই অনুপাতে। তবে ব্যাসগুহা অথবা বসুধারার পথে আমার পাঁচ দিনের অভিজ্ঞতায়, এটা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছি যে কোন প্রদেশের কোন নারী যাত্রী যায়নি, যেতে দেখিনি বা শুনিনি। তাহলে মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া গেল। আমাদের যাত্রীর একটা সরকারী রেজেষ্টি আছে এখানে, সেই খাতার বিবরণ যদি আমি আইটেম বাই আইটেম তুলে দিই তাহলে এর চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে, মনে হয় কতকটা অন্যায় হোতো সাধারণের মতে ;—তাই ঐপথে না গিয়ে আমাদের কথায়, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতেই চেষ্টা করলাম ;—সেটা বিশেষ মিষ্ট যদি নাও হয় তিক্ত হবে না এটা সত্য। তারপর,—সব মিলিয়ে আমার ধারণা এই হয়েছে,—কেদার বদরীতে ভারতের সকল প্রদেশের লোক হিসাব করলে দক্ষিণ দেশের অর্থাৎ ম্যাড্রাস বিভাগের নর, আর বাঙ্গালার নরনারী

অন্যান্য সকল প্রদেশের তুলনায় বেশী যায়। বাঙ্গালা ছাড়া আরও অন্যান্য প্রদেশের বাঙ্গালীও বড় কম যায় না যেমন বিহার, উত্তর পশ্চিম, এই দুই প্রদেশ থেকেও নরনারী মিলিত যাত্রী বাঙ্গালী অনেক যায়।

বেশী আর না বলাই ভালো, বিশেষ করে আমাদের কথা বেশী বললে অশোভন হবার সম্ভাবনা। কারণ অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিকতা যত ঘন হয়ে উঠছে ততই সকল প্রদেশের লোকে জোরগলায় বাঙ্গালীরা প্রভিনশিয়্যাল, এই কথাই প্রচার করচে। সারা ভারতের সকল প্রদেশের লোকের সঙ্গে কয়েক বৎসর পর্য্যুপরি ব্যবহার সম্পর্কে এসে আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে যেন,—বাঙ্গালীরা যা কিছু করে বা করচে তা তাদের অপরাধ, কারণ অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা তা করচে না।

জেঠামশাইকে নিয়ে আমার একটু মুসকিল হয়েছিল। সেই দিন তাঁকে বসু ধারায় যাবার কথা বললাম, তিনি বলেন, ওতো ইসিসেভি জবর বরফান মুলুক, উধার কৌন যাবে গা। উধার যানেসে কোই লৌটতা নেহি। কেউ ফিরে আসে না। কত মতে বুঝান হল, কিছুতেই রাজী করান গেল না। শেষে এইখানকার এক কাণ্ডীবালা ব্রাহ্মণ বালেশ্বর মিশ্র কয়েক দিন ছুটি ছিল তার, তাকে নিয়েই গেলাম গাইড করে বসু-ধারায়। জেঠার সঙ্গে এই কণ্ডিসান হল, ফিরে এসে অবিলম্বে চলে যাবো। সে রুদ্র প্রয়াগের লোক, এতটা এসেছে এইটাই আমার সৌভাগ্য। যাইহোক বদরীনাথের কাছে বিদায় নিয়ে চতুর্থ দিন প্রাতে আমরা তিনজন বসুধারায় যাত্রা করলাম। এ যাত্রার আগে বদরীর কথা আরো একটু বলে নিতে চাই।

কথাটা সত্য আমার এখানে তিন দিন, তিন রাত সুখেই কেটেছিল নারায়ণের কৃপায়। সহজেই আমার নারায়ণে মতি বাল্যকাল থেকেই। সকল দেবতাই আমার প্রিয় কিন্তু নারায়ণই আমার প্রাণের দেবতা। বাল্যকালে বাবার কাছে যখন অনন্তশায়ী নারায়ণের কথা শুনতাম তখনই অন্তরে এমন একটা তন্ময়তা আসতো যাতে বাইরের কিছুই হুঁস থাকতোনা। এখন বদরীনারায়ণে এসে মনে হোলো যেন আপন স্থানেই এসেছি। কিন্তু পাণ্ডার হাত এড়ালেও মন্দির প্রবেশের সময় একটি সহায়তো চাইই, আমার তা জুটেছিল। দেবদর্শনে টাকার ব্যবহার, আসলে একে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না তাই আর যাইনি। তারপর জেঠামশাই নিত্য নিত্যই অনুযোগ করচেন এখানে এত শীতে আমাদের শরীর খারাপ হবে। আমি যখন তাকে বললাম, তোমরা তো হিমালয়েরই অধিবাসী, সে বলে আমরা শিবালিকের অধিবাসী। মানুষ তারা নিম্নস্তরের, উচ্চ স্তরের তুষার ভূমির অধিবাসী নয়। যারা শিবালিকে থাকে তারা কখনও কেদারের পথে গুপ্তকাশী আর বদরীর পথে চামোলী বা লালসাংগার উপরে যায় না; অতিরিক্ত শীতে বিমারে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। আর সেই বিমারের প্রকৃতিটা হয় কলেরা না হয় নিউমোনিয়া। এটাও দেখেছি ঐ দুটি

বিমারের যেটাই হোক না কেন এদের একবার আক্রমণের ফলেই সাংঘাতিক হয়ে যায়। এ যে কতটা কঠিন তা এরাই জানে। রোগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের আশা ছেড়ে দেয়। এখানে হাসপাতাল আছে, ডাক্তারও আছে, চিকিৎসাও হয় কিন্তু ঐ দুটি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ঢুকলে প্রায়ই আর প্রাণ নিয়ে বাইরে আসতে হয়না। জেঠার এতটা ভয় সত্বেও কেন যে সে এসেছিল তাও সে আমায় বোলেছিল। প্রথম কারণ, তারও তীর্থ দর্শনের প্রবৃত্তি প্রবল হয়েছিল। সারা ভারতের লোক যেখানে আসচে আর তারা কাছে থেকেও ঐ সকল তীর্থে বঞ্চিত থাকবে? এ কেমন কথা, তারপর দ্বিতীয় সুযোগ হোলো একজনের বোঝা নিয়ে আসা, আর যখন সে বোঝাটা বিশেষ ভারি নয়। শেষে বললে, তোমার সঙ্গ আমার ভালই লেগেছে, তা বোলে বসুধারায় যাবো না,—বদরীকাশ্রমের চেয়ে বরফ ঐখানে বেশীই। তাই সে কিছুতেই গেল না যখন আমরা গেলাম ওপথে।

এদিকে যতই বেলা পড়ে আসে ততই ঠাণ্ডা পড়ে। দ্বিতীয় দিনে এমন বৃষ্টি ঝড় তুষারপাত হয়েছিল যে সারা বিকালটা পথ, বাড়ির ছাদ সব সাদা হয়েই রইলো। পরদিন প্রভাতে সব পরিষ্কার ঝরঝরে। যে ঘরে আমরা ছিলাম,—সেখান থেকে মন্দির কাছেই। আর দুপা পথে নামলেই বড় বাজারেও পড়া যায়। অনেক তিব্বতের লোকও এই সময়ে সওদাগরী ব্যাপার নিয়ে আসে। নেপালী, ভোটিয়া এরাও আসে, কিন্তু তীর্থ কর্ম্মের জন্য শুধু নয়, ব্যাপারই তাদের আসল কথা। আহার ও ঔষধ দুইই স্বার্থ না হলে এরা কোথাও নড়াচড়া করে না। ভোটিয়া বোলতে ভূটানের লোক নয়, এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ অধিবাসী যারা, তারা হিন্দু সভ্যতার সঙ্গেই ঘনিষ্ট যোগ রাখে সত্য কিন্তু তাদের মূল জাতিগত সত্বা ঐতিহাসিক শক বা হুন, সৈনিক বৃত্তি এদের। এরা বহুকাল থেকেই এই পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশগুলি আশ্রয় করেছে। এই তীর্থগুলি উপলক্ষ করে যে সকল গ্রাম, যেমন চামোলী, বিষ্ণুপ্রয়াগ, যোশীমঠ গ্রাম, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমান, বদরীকাশ্রম এই সকল গ্রাম পর্য্যন্ত হিন্দু অধিবাসীদের বসবাস, তারপর আর হিন্দুজাতির বাস নেই বরাবর এই সকল জাতি বাস করে, হিন্দুরা এদের ভোটিয়া বোলেই নির্দ্দেশ করে থাকে। এরা অতীব ভদ্র, সরল প্রকৃতির মানুষ, কোন অন্যায় অসহ্য দেখলে, সহসা হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাদের সহজ সরল জীবন, ধর্ম্মের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম এরা গ্রাহ্য করে না পরবর্ত্তীকালে কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রা পথে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হয়েছিল।

আমরা কতটা দুর্ব্বল শরীর, শীতের প্রভাব অসহিষ্ণু এখানকার এই শীতে ঘরে আগুণ জ্বালিয়ে তার উপর লেপ, কম্বল চাপিয়ে তবে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করি কিন্তু এইখানেই ব্রহ্ম কপালের কাছে, তিন দিক খোলা কেবল এক-দিকে দেয়াল, অবশ্য ছাদে আচ্ছাদন আছে, একদল, প্রায় পাঁচ ছয়জন পুরুষ সন্ন্যাসী

শুধু কম্বল গায়ে দিয়ে রাত কাটাতে দেখেছি। অবশ্য মোটা গাছের ডালপালা জ্বালিয়ে তার খানিক আগুন একপাশে থাকে স্বচ্ছন্দে দিন রাত কাটাচে। এখানে শীতের সময়ে এরা কেউ থাকে না কারণ তুষারে সবই ঢাকা থাকে, কিন্তু এখান থেকে দুমাইল তফাত মানা গ্রামে লোক থাকে। ঐ শীতে যখন সব তুষারে শুভ্রমূর্ত্তি,—সে ধবল দৃশ্য নিরন্তর দৃষ্টিতেও অসহ্য।

আনন্দেই ছিলাম, কেবলমাত্র একটি বিষয়ে যদি মনকে মাঝে শরীর মুখী করে না দিতো। ঐ শীত, ঠাণ্ডাটাই বাঙ্গালী শরীরে সহজে হজম করা যাচ্ছিল না, মাঝে মাঝে মনকে একটু তন্ময়তা ভ্রষ্ট করে, এই পরীক্ষায় এনে ফেলেছিল যেন সত্যই তিতিক্ষায় কতটা অধিকার। সুমুখে উৎকট তিতিক্ষায় দৃষ্টান্ত বড় কম ছিলনা, তিনটি দিনই দেখেছি দুজন নাগা সন্ন্যাসী, ধূনী জ্বেলে অবশ্য, ব্রহ্ম কপালের কাছে একদিন আর মন্দিরের পিছনে যে যাত্রীশালা বা পাণ্ডাদের বাড়ি আছে তারই পাশেই চত্তারের মত একটু আছে তারই উপর দুদিন রাত্র যাপন করতে দেখেছিলাম।

মৌনী ছিলেন এঁরা দুজনেই, কোন শব্দ নাই মুখে, কোন চাঞ্চল্যই নেই, বসে আছেন হাতটি আছে, একটি ব্যাসাসনের উপরে। ব্যাস-আসনটি এঁরা, বড়ই সুবিধাজনক মনে করেন, দীর্ঘকাল একাসনে থাকবার একটি সহায় বললেই হয়; বহুক্ষণ একস্থানে বসতে সাহায্য করে। বিশেষতঃ হাতটি রাখবার জন্যই ওটা রচিত। অনেকক্ষণ থাকার জন্য, হাতটি একটু নড়াচড়া করবার দরকার হয় তখন ঐটি কাজ দেয়। হাতদুটি ছাড়া, পা থেকে মাথাটি মোটেই নড়াতে হয়না। বেশীর ভাগ এঁরা আসন সিদ্ধ সেইজন্যই একাসনে দীর্ঘকাল থাকতে পারেন।

যাই হোক আজ বিকালে সন্ধ্যার খানিক আগে যখন মন্দিরে যাত্রীর, অসম্ভব নয় সম্ভবমত কিছু বেশী লোকের ভীড় ছিল। অনেকে দর্শন শেষে পরিক্রমায় ছিলেন সেই সময়ে একজন হিন্দুস্থানী, প্রৌঢ় বয়সের ভদ্র তার সঙ্গে এক যুবা, দুজনের একই রকম পোষাক, এসে বসলো। প্রণাম করে তারপর যোড়হাতে, বাবা রকষা করো, কৃপা করো, কয়েকবার বলতেই একজন সাধু, আগুণের কাছে চিমটেটা পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে বেশ জোরে, তার সামনে ছিল প্রৌঢ় লোকটি, তার মাথায় মারবার জন্য চেষ্টা করলেও লাগলো তার কাঁধের উপর, সজোরেই লাগলো। গায়ের মোটা লুই, তার নীচে দুটো জামা নিশ্চয়ই ছিল, বোধহয় বেশী লাগলো না সেইজন্য। আমি কাছেই ছিলাম,—মন্দিরে প্রবেশ না করে ঐ সময়টি চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ওখানে ঘুরলে অনেক কিছুই দেখা যায়। যাই হোক ঐ চিমটা প্রহার দেখেই যুবা পুরুষটি তখনই উঠে গেল। চিমটার আঘাত হজম করে ঐ প্রৌঢ় নড়লোনা, বাবা রকষা করো, বুলিও ছাড়লেনা। তখন আর একবার চিমটা তার পাগড়ির উপর পড়লো, সেটাও বেশী জোরে নয়, হয়তো

তাই অবলীলাক্রমেই সে ব্যক্তি হজম করলে। তখন চারদিকে না হোক তিনদিকে লোক কিছু কিছু জমে উঠলো আর দেখা গেল সেই যুবাটি এক অচৈতন্ত যুবতীকে পাজাকোলা করে নিয়ে এসে তাদের সামনে অগ্নি বা ধূনীর পাশে শুইয়ে দিলে। মেয়েটি সবল মূর্ত্তি ;—হাতে গহনা, গলায় গহনা, পায়ে গহনা, পায়ের আঙ্গুলে পর্য্যন্ত গহনা।

যখন মেয়েটিকে এনে শোয়ালে, মেয়েটি স্থধুই অচৈতন্ত নয়,—মৃত বলেই মনে হোলো আমাদের। জোড়হাতে সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলতে লাগলো, আজ সুব, যব মন্দির খুলাথা, হামলোক একসাথ আয়া, দুয়ার মে দর্শনকো বখৎ পড়িগই,—ব্যস্, অব তক্ কুছ হোস নহিনা। মহারাজ! আজ হম্লোককা খানা পিনা নহি, ইহা মে রহা। হসপাতাল যানেকো বোলা কোই কোই। উঠানেকো গেয়া তো, দুসরে আদমী বোলা,—মৎছুয়া করো বো শরীর, দেওতা কো ভর হুয়া, তবতক্ এইসি হালত। অব আপকো পাস আয়া রক্ষা করো, মহারাজ। তাহার কথা বলা হলে পর মহারাজ তৎক্ষণাৎ আবার চিমটা উঠালেন এবং বেশ জোরেই ঐ মৃত বা মৃতপ্রায় যুবতীর একদিকের কাঁধ থেকে বুক পর্য্যন্ত স্থানে সটান একঘা সশব্দে লাগিয়ে দিলেন, সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো, একজন, ই কয়সা সাধু ভাই, রাচ্ছস, বোলে সহানুভূতি দেখালে। আমি কিন্তু সমস্তক্ষণ, ঐ চিমটার আঘাত বুকে পড়া পর্য্যন্ত দেখলাম, নারীদেহ যেন সেই আঘাতে একটু নড়ে উঠলো তারপর এক দুই মিনিট স্থির, তারপরই মেয়েটি চেয়ে দেখলে আবার তখনই চক্ষু বুজিয়ে ফেললে। তখন সবাই, আরে জয় বদরীনারায়ণ, বাছগেয়া, বাছগেয়া, বলে কলরব আরম্ভ করলে, তখনই দেখা গেল মেয়েটি মাথার কাপড়টা পাবার জন্ত হাত সেই দিকে নিয়ে গেল তার পর ধীরে ধীরে উঠে বসে মাথায় বুকে কাপড় টেনে দিলে।

জয় জয় বদরীনাথ রবে চারদিক মুখরিত, সকল দিকেই হৈ হৈ কাণ্ড চলতে লাগলো। কিন্তু নাগাদের দিকে আর কেউ ফিরেও চাইলো না ; সেই প্রৌঢ়ও নয় যুবাও নয়।

২০

মানা-ব্যাসগুহা-বসুধারা—শতোপন্ত—১৫ মাইল

এখান থেকে মানা পথেও যাওয়া যায় তিব্বতে, মানা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে। পথটাও মন্দ নয়, প্রথমদিকে আমরা ঋষীগঙ্গা হয়ে চললাম মানা হয়ে বসুধারার পথে। চড়াই উৎরাই বিশেষ নেই,—নগ্ন পর্ব্বত পাদমূলে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছপালার রেখা উপরে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশীর্ষ, এ সারা পথেই দেখা যায়। মানা পথ, এই পথটার নামই মানাপথ, গ্রামখানি বেশ বড় পার্ব্বত্যগ্রাম, এখানে ভোটিয়াদের বাস।

এখান থেকে বসুধারা বেশীদূর নয়, সাড়ে তিনমাইলের কিছু বেশী হবে। আর পথ খুব কঠিন নয়, তবে হাঁপ লাগে, গিরিসঙ্কটের মত। পাথর, পাথর, পাথর

পাথরের নানা আকার ক্ষুদ্র বৃহৎ, তারি পাশে জঙ্গল, মাঝে পথ। আর উপর দিকে নগ্ন পাষাণ স্তর, আর শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীটি। সারা পথটা হাঁপ লেগেছিল এমনভাবে যেন আমাদের সকল শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। 'আজই আমরা বসুধারা দেখে ফিরব বদরীতে এই ঠিক ছিল। আমরা খাবার নিয়েছিলাম,—পরোটা আর কিছু আচার আর হালুয়া। এই রকমই নিয়ম কারণ জানতাম ওখানে কিছু পাওয়া যাবেনা,—যেহেতু লোকালয় নেই।

আমরা তিনজন, তারমধ্যে একজন বালেশ্বর মিশ্র, এই অঞ্চলের মানুষ পথ প্রদর্শক হিসাবে, আমি আর নীলকণ্ঠ আইয়ার। প্রধান রাওয়াল পূজারীর সহকারী, যার সঙ্গে আমার একটু মিত্রতা হয়েছিল, চমৎকার হিন্দি কথা তার, কে বলবে যে দক্ষিণ-দেশীয় সে তামিল, বা মালাবারের লোক। আমার বসুধারা ও শতোপন্থ যাবার ইচ্ছা শুনে সঙ্গের আকর্ষণেই বোধ হয় সেও যাবে বোলে রাওয়ালের কাছে অনুমতি নিয়ে নিলে। শেষে অনুমতি পাবার পর যাত্রার কথা ঠিক হল এবং যাবার ব্যবস্থা করতে লাগা গেল। বালেশ্বর তারই জানাশুনা লোক। কথা হল আমরা প্রভাতেই বেরিয়ে পড়বো, প্রথমে দু আড়াই মাইলের মাথায় মানাগ্রামে যাবো, ব্যাসগুহা দেখে সেখান থেকে বসুধারায় গিয়ে স্নান করে শতপন্থ হ্রদ দেখতে যাবো। অবশ্য পথে লক্ষ্মীবান পর্ব্বত অতিক্রম করে চক্রতীর্থে তারপর মাজনাগ্রামে গিয়ে শতপন্থের পথে প্রবেশ করা যাবে। আমরা ঐসব দেখে ঐ দিনই সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসবো। কিন্তু গাইড বালেশ্বর বললে, —কখনই ঐদিনে ফিরে আসা সম্ভব নয় একরাত্র মাজনায় থাকতে হবে। সে যা হয় হবে ঠিক করে আমরা পর্য্যাপ্ত খাবার আচার ও মিষ্টি এই সব সংগ্রহ করে নিজ নিজ কম্বল বোঝা সবই নিজেরা ঘাড়ে করে প্রভাতেই আনন্দে যাত্রা করলাম। যদিও বদরিনাথের অধিকার এখানে তাহলেও যাত্রাকালে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করেছিলাম।

মানা নামে যে পার্ব্বত্য গ্রামখানি, যেখানে গিয়ে আমরা ব্যাসগুহা দেখবো,—সেটা মাত্র দুই আড়াই মাইলের পথ, পথের বৈশিষ্ট্য, গাছপালা ক্রমশঃই কমে এসেছে কিন্তু শোভা অতুলনীয় ঐ ছোট ছোট গাছেও। তুষার জায়গায়, জায়গায় দেখা গিয়েছিল, আবার কতক তুষার পদদলিত করেও চলেছিলাম। বন গোলাপের ঝাড়, ভাঙের জঙ্গল কোথাও কোথাও। দেখি রক্তকরবীর গাছের মত, ফুলও প্রায় সেই রকম। এই পথেই ব্যাসগুহা,—খানিক উঠে যেতে হয় পথ থেকে। তারপর ঐ গুহাটি যা দেখলাম এভাবের গুহা আগে আর দেখিনি। প্রথম খানিক দরদালানের মত, তার উপরে গুহাদ্বার। সেখানে একজন ছিলেন তখন। তিনি অনেক দিনই আছেন, ব্যাসদেবের উপাসক। আমরা বহুদূর থেকে এসেছি বলে আমাদের বড়ই স্নেহের সঙ্গে বসতে স্থান দিলেন। আমি তাঁর কাছে বসে শুনলাম, বেদব্যাস এই গুহাতেই বেদ বিভাগ করেছিলেন।

এখানে মন স্থির করে বসলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের অনেক মহা-পুরুষ দর্শন হয়। আমি একরাত্র থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলাম। তিনি
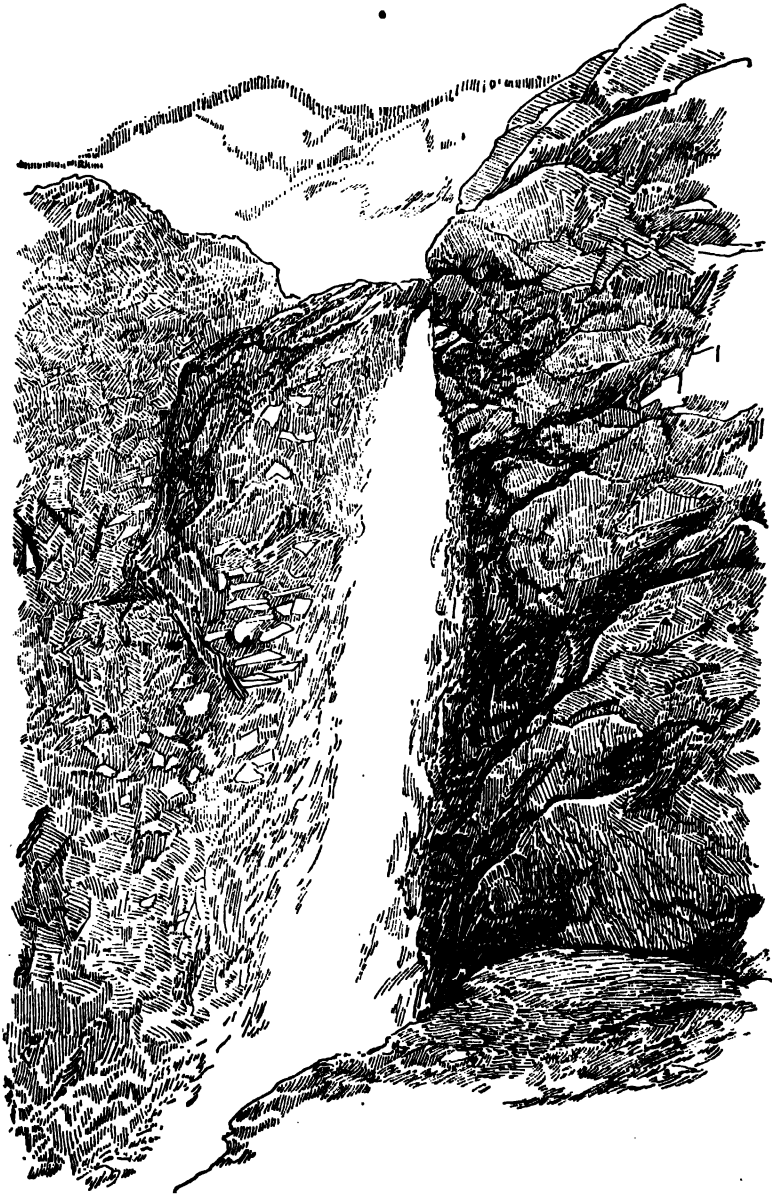
রাজীও হয়েছিলেন কিন্তু বালেশ্বর মিশ্র বেঁকে দাঁড়ালো. সে লোকটা বলে,—এরকম জায়গায় গৃহীমানুষের থাকলে অকল্যাণ হবে। কেন ? জিজ্ঞাসা করলে সে বললে, থাকতে

গেলেই এখানে তোমার মলমূত্র ত্যাগ আছে, তাতেই এ স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হবে, কিছুতেই থাকা হবেনা,—চলো মানা। সেই গ্রামই ভাল আমাদের। ইচ্ছা হোলো একটা প্রশ্ন করি,— কিন্তু তা করলাম না ;—খানিক দেখাশুনা, একঘণ্টার মত সময় এখানে ছিলাম তারপর বসুধারার পথে চললাম।

ঐ অলকনন্দার ধারা ধরেই আমরা অগ্রসর হয়ে বেলা নয়টার মধ্যে কতক চড়াই উঠে বসুধারায় পৌছে গেলাম। ওখানে দুটি ধারা একটি ক্ষীণ, অত্যন্ত ক্ষীণ, জল পড়ে যখন তখন একটা রেখার মত। সেটা উপরের বরফ গলার উপরই নির্ভর করচে। রৌদ্রের তেজ থাকলে ঐ ধারা দেখা যায়। তবে বড় ধারাটি অবিশ্রান্ত ঝরচে, তাতে আমরা স্নানও করলাম। বহুদূর উচু থেকে পড়চে। আমরা প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত ঐখানে ঐ রম্য দৃশ্য, স্বর্গের মুক্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিচরণ করলাম,—তারপর ভোজন শেষ করে যাত্রা করলাম। তুষার সেতুর পথে, খানিক গিয়ে আমাদের সম্মুখে যে তুষার স্তর দেখা গেল ঐ পর্য্যন্তই আজিকার গতি। বালেশ্বর বললে, কাল আমরা সকালে মাতামূর্ত্তি দেখে শতোপন্থ দেখতে যাত্রা করবো। কাজেই আমরা বৈকালেই ফিরে এলাম বদরীনাথ ধামে।

* * *

পরদিন আমরা দুর্গা দুর্গা বলে আবার যাত্রা করলাম। আর প্রথমেই তিন মাইলের মাথায় মাতামূর্ত্তির পথে যেতে আরম্ভ করলাম, কিছু খাদ্যদ্রব্য বেশী বেশী নিয়ে। মাতা-মূর্ত্তির মন্দির কাছেই, বোধ হয় দেড় মাইল। ইনি বদরীনারায়ণের জননী। উদ্ভবজীর যে বিগ্রহটি বদরীনাথ মন্দিরে আছে সেই বিগ্রহটি মন্দির বন্ধ হবার আগে এক বিরাট উৎসবের আকারে বহু লোক এবং গান-বাজনার শোভাযাত্রার সঙ্গে জন্মাষ্টমীর পরেই বামন দ্বাদশীর দিন ধুমধাম করে এখানে আনা হয় এবং পূজা ও ভোগরাগ ইত্যাদির দ্বারা তুষ্ট করা হয়।

এখানকার দৃশ্য দেখে প্রাণ আর নড়তে চায়না ;—আর বান্ধবেরা আজ,—পনরা দুনা তিশ-মিল চলনা পড়েগা, এসা বৈঠনেসে কাম ন বনি। এই বদরীনারায়ণের আশে পাশে অনেকগুলি তীর্থ ঘুরে যেতে হয় বোলেই পনেরো মাইল বিশ মাইল এই রকম দূর হয়েছে। না হলে সোজা পথে সবই কাছে কাছে।

যাই হোক এখান থেকে আমরা শতোপন্থ দেখবার আশায় যাত্রা করলাম। দুর্গা বোলে যাত্রা করা অভ্যাস তাই করেছিলাম আর জগদম্বার সৃষ্টি রক্ষার রীতি এবং নীতি যেমন চলে আসচে তিনি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেননি, সেটি কড়ায় গণ্ডায় সম্পূর্ণ পালন করলেন, রতিমাসা এড়ালো না। পথে মাতৃমূর্ত্তির এলাকা পেরিয়ে এসে হাঁফ ধরচে,

সবার শরীর এত দুর্ব্বল, এক ফোঁটা শক্তি আর কারো শরীরে অবশিষ্ট ছিলনা। এমনই অবস্থায় তুষার বৃষ্টি আর ঝড়। এটা কি জগদম্বার উচিত হয়েছিল ;—হোকনা তাঁর স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের নিয়ম, দয়া করে নাহয় তিনি আমাদের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবই দেখাতেন তাতে তাঁর কি ক্ষতি হোতো ? সেদিকে কিছুই করেননি,—তুষার-বৃষ্টি যেমন হবার তা ঠিকই হয়ে গেল, আমাদের এই সময়ে যেটুকু সুখ হোলো তার কথা শেষে বোলবো এখন দুঃখের কথাটাই সার কারণ এ দুঃখ সত্য, এখানকার প্রাণের ভয়ও সত্য। বিপন্ন, প্রাণান্তকর অবস্থায়,যখন প্রাকৃত ঘটনার হঠাৎ বিপর্য্যয় ঘটে, তখন মানুষের পক্ষে আপনার অস্তিত্ব রাখতে প্রাণ-শক্তিকে আঁকড়ে থাকা এটা যে কতটা স্বাভাবিক তা, আমাদের এযাত্রায় সম্পূর্ণই জ্ঞান হয়ে গেল। আপনাকে রক্ষার চেষ্টা, মৃত্যু এড়াবার জন্য দৃঢ় উদ্যম,—কি ভাবে কার্য্যকরী হয়,—কেমন করে আপন নিয়মেই আপন দুর্ব্বলতাই আত্মশক্তিতে পরিণত হয় ঐ দেহ-মন বুদ্ধির ভিতরেই, তরঙ্গের মত উঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে সকল অবসাদ নৈরাশ্যের অধঃস্তর থেকে একেবারে পূর্ণ শক্তিমান অবস্থায় জাগিয়ে তোলে আমাকে, এই অদ্ভুত খেলাটিও দেখলাম।

কষ্টকর পথ, চড়াই উৎরাই বোলে কষ্টকর নয়, আগাগোড়া তুষারমণ্ডিত মালভূমির উপর দিয়েই যাওয়া-আসা। চড়াই সবশুদ্ধ দেড় মাইল। ক্রমোচ্চ পথ, যেমন গিরি-সঙ্কটের উপর হয় অথচ এটা গিরিসঙ্কট নয়, গিরিসঙ্কট এখান থেকে অনেক দূর উত্তরে প্রায় দেড় দিনের পথ। এক একটা স্তরের উপর উঠে আবার ঢালু পথে নামা তারপর খানিকটা একেবারেই সোজা প্রশস্ত সমতল তুষারক্ষেত্র। এইভাবে সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফিট আমরা অতিক্রমণের পর তবে ঐ হ্রদটি পেয়েছিলাম।

পথে কি বিষম কষ্ট সহ্য করেই আসতে হয়েছে বোলেছি কারণ এতটা উচ্চ ভূমিতে বাতাস যে শুধুই শীতল নয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, এত হালকা যে শ্বাসকষ্ট বরাবর ছিল। মানা গ্রাম ছাড়িয়ে যখন আমরা বসুধারায় পৌঁছালাম, তখন সামান্যভাবেই অনুভব করেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীবান পেরিয়েই তার কষ্টকরপ্রভাবে আমাদের সবাইকে যেন একই হাসপাতালের রোগীর অবস্থায় পেড়ে ফেলেছিল। শতোপন্থে আমরা এই ভাবেই পীড়িত হয়েছিলাম, ফিরে আসবার আর উপায় ছিলনা, ফিরতে হলে লক্ষ্মীবান পর্ব্বতের আগেই ফেরবার পথ ছিল, এখন এতটা এসে আর উপায় নেই। সুতরাং পনেরো মাইলের শেষ সাত মাইলও আমাদের শেষ করতেই হোলো। এখন মনে হচ্চে যে,—আগে জানতে পারলে আমরা বোধহয় আসতাম না।

আমাদের গাইড, তিনিও কম বিপন্ন হননি, তবুও যেন আমাদের মুখ চেয়ে সব সহ্য করলেন আমাদের সাহায্যের চেষ্টাও করেছিলেন। দু তিনবার নীলকণ্ঠের হাত ধরে আবার তারই কাঁধে হাত রেখে নিজেই একটু দম নিচ্ছিলেন। যাই হোক সবাই মনে

করেছে, যেমন হয়ে থাকে, তার নিজের কষ্টটাই বেশী। কিন্তু নীলকণ্ঠ শেষকালে বললে, সবার চেয়ে কম কষ্ট হয়েছে যার সেই লোকটিই বীর আমাদের আজকার অভিযানে। সেই দিনেই এইভাবে পরস্পর যত রকমের দুর্ব্বলতা কাটাবার ফন্দি-ফিকির আছে সবগুলিই ব্যবহার করে শেষে আমাদের গন্তব্য সেই পৌরাণিক শতোপন্থ হ্রদের নিকটস্থ হয়ে যাত্রা সার্থক করলাম।

শতোপন্থ হ্রদটি বদরীনারায়ণ থেকে কাক ওড়ার সোজা গতি হিসাবে পশ্চিমে ছয় মাইল। কিন্তু যাবার পথ অনেক ঘুরে ফিরে পাক খেয়ে গিয়েছে। প্রথমে মাতাজীর মন্দির পথে ঐ গ্রামে তো যেতেই হবে, পাশেই অলকনন্দার গতি ধরে খানিক;— তারপর পশ্চিমদিকে বাঁক সে পথে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের দিকে তারপর সোজা পশ্চিম দিকে এসে দুটি পথের সংযোগ স্থলে পৌছলাম,—একটি, দক্ষিণ দিকে একটি পশ্চিম দিকে। আমাদের দক্ষিণের পথ বসুধারায় নিয়ে গেল। তারপর সেখান থেকে আবার পশ্চিমের পথটা বরাবর তুষারক্ষেত্রে এক তুষার সেতুর উপর দিয়ে আমাদের লক্ষ্মীবান পর্ব্বতের কাছে নিয়ে গেল। তারপর আবার সেই স্তর দিয়ে উঠে বরাবর অলকাপুরী শৃঙ্গ দেখতে দেখতে আমরা চক্রতীর্থে এলাম। এখান থেকে সামনের পথটাই শতোপন্থ হ্রদে নিয়ে যায়। সব কটাই তুষার শৃঙ্গ। নীচে অর্থাৎ পর্ব্বতের পাদমূলেই পথ, এই পথেই বাঁ দিকে নারায়ণ পর্ব্বত শৃঙ্গটি দেখা গেল যেন তার নীচেই শতোপন্থ হ্রদটিও দেখা গেল। খানিক তুষারাবৃত ভূমি, নিচেটা বরফ জমে প্রায় সমতল হয়ে গেছে। ছোট হ্রদটি দেড় মাইল পরিধি, ত্রিকোণাকৃতি বলা যায়, কোথাও জলের চিহ্ন নেই জানিনা সে তুষার কখনও গলে কিনা এখন জুলাই আগষ্টে যখন গলেনি। মাজনাগ্রাম থেকেই হ্রদটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয় কারণ এই গ্রামই একমাত্র লোকালয় এ অঞ্চলে যেখানে জীবনের চিহ্ন আছে। ১৪৪০০ ফিটের উপর হ্রদটি। মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদের সঙ্গে একই লেবলে অবস্থিত। এটাও একটা ভাববার কথা যে একই স্তরে এই লেকগুলি কি ভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

আমরা যখন শতোপন্থ হ্রদের তীরে পৌছালাম তখন বেলা আছে, কিন্তু আমাদের প্রাণ আর দেহ আশ্রয় করে আছে কিনা সন্দেহ। অবসন্ন হয়ে হ্রদের তীরে একটা কেঁকড়িওয়ালা পত্রশূন্য গাছ, সেখানে কম্বল পেতে খানিক বসলাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, হ্রদের সামনে তৃষ্ণায় কাতর, হ্রদভরা জল কিন্তু এ ট্যানটালাসেরই অবস্থা। বরফে ঢাকা সর্ব্বত্র, একটুও এমন স্থান নেই যেখান থেকে জলটা খাওয়া যাবে। খানিক বরফ লাঠির খোঁচা দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখে পুরতে গিয়ে দেখি ময়লা, উপরে ধূলার একটা পাতলা সর পড়ে ছিল সেইজন্য এমন স্থানে এ অবস্থায়ও মুখে দিতেই পারলাম না। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগলো এতটা উঁচুতে বরফের শুভ্র স্তরের উপর ধূলা কি করে এলো। তবে

এটা ঠিক, উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় ঐ তুষারের উপর মোটেই ধূলা নেই, কি শুভ্র তার লাবণ্য। সূর্য্যকিরণ তার উপর পড়লে একটা জ্বালা, একটা প্রভা দেখা যায়। আমরা অনেক চেষ্টা করেও একটু জলের সন্ধান পেলাম না। দেখলাম শেষে, ঐ হ্রদের পাশেই তুষার ঢাকা একটা সরু ধারা কুল কুল রবে চলচে। নিকটেই নায়ার ছিল সে বলে আমি জল বার করবো। ঐ লাঠির তলায় লোহার খোচাটা দিয়ে খানিক চেষ্টা করে যখন চাঁইটা ভাঙ্গলো তখন সেই চূর্ণগুলি নীচে জলের সঙ্গে মিলে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তৃষ্ণার পূর্ত্তি দূরের কথা, এক বিন্দু জলের সঙ্গে রসনার সম্বন্ধ যোগ ঘটলো না।

কিন্তু তারপর গাইড আমাদের নিকটস্থ গ্রামখানার নির্দ্দেশও হারিয়ে ফেললে। মাথাটা সবারই গোলমাল তো হয়েই ছিল, আমার তো সেই দুই পথের সংযোগ স্থলের আগেই দিকভ্রম হয়েছিল। কোন পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কিছুই ঠিক ছিলনা। কিভাবে এখন আশ্রয়লাভের উপায় করা যায়?

আমরা যে আজ ফিরে বদরীকাশ্রমে যেতে পারবোনা এতো জানা কথা। কিন্তু থাকবো কোথা? রাত্রযাপনের মত স্থান পাবো কোথায় তাতো জানিনা। আশ্চর্য্য! এ কি ব্যাপার সেই রাত্রে আমরা এমন স্থানেও আশ্রয় পেলাম। সুবিধার মধ্যে খাবার কিছু সঙ্গে আমাদের ছিল, কেবল রাত্রে একটু থাকবার, আরামপ্রিয় দেহটিকে রক্ষা করবার মত স্থান পেলেই কৃতকৃতার্থ হয়ে যাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্যভাবে যোগাযোগটা ঘটে গেলো, এখানকার দেবতারই কাণ্ড কিম্বা অন্য কিছু তাই ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমরা হ্রদটির ধারে ধারে ঘুরছিলাম। দেখছিলাম এখানে গাছপালা আছে আবার বেঁচেও আছে। গাছের কাণ্ড মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত নানা রঙ্গের ডুমো ডুমো সারি সারি উপর থেকে গুঁড়ির উপর অবধি নেমেচে। খানিক তফাতে বরফও জমে আছে, কোথাও খালা, কোথাও ঢিপি আবার কোথাও অনেকটাই সমতল ক্ষেত্র। এখন দেখলাম ধীরে ধীরে আলো কমে আসচে, আমরা কোন্ দিকে যাবো কোথায় গেলে আশ্রয় পাবো কিছুই জানিনা। কেমন এক বিভ্রান্ত মনোধর্ম্মে ঘুরতে লেগেছি তিনজনে সবাই। এখন নায়ারই প্রথমে লক্ষ্য করলে, বললে, শোনো শোনো!

কি শুনলাম আমরা? অতি মৃদু শাঁকের আওয়াজ। পল্লীগ্রামের মাঠের উপর পথে যেতে যেতে সন্ধ্যায় দূরের গ্রাম থেকে যেমন শাঁকের ধ্বনী শুনা যায় ঠিক সেই শঙ্খধ্বনি; শুনেই কোন্‌দিক থেকে আসচে, সেটা ঠিক করে নিতে বেশীক্ষণ লাগলো না, সেটা উত্তর-পূর্ব্ব কোণেই মনে হোলো। আমরা সেই শাঁকের ডাক লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম ঐদিকে। যেদিকে যাচ্ছি সামনেই আমরা লক্ষ্য করলাম খালি চড়াই সে চড়াই কঠিন নয়, আর তার পিছনের পর্ব্বত যেখানে আরোহণ শেষ হয়েছে সেটাও খুব বেশী উঁচু

নয় যদিও তার মাথার উপর বরফের ধবল লেপন, সেই শিখরের অনেকটাই বিভূতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দুবার ইতিমধ্যে শঙ্খধ্বনী শুনেছিলাম, যখন আমরা পাহাড়ের তলায় প্রথম স্তূপের উপর উঠেছি তখন তৃতীয় ধ্বনী শুনলাম আর এই ধ্বনীই শেষ। আমরা স্তূপের পর স্তূপ অতিক্রম করে যখন স্কন্ধদেশে উঠেছি তখন সন্ধ্যার আঁধার আগতপ্রায় যদিও এখনও পথের সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল। ধ্বনী আর হোলো না আমরা সেই স্কন্ধদেশের উপর দাঁড়ালাম একটা বাঁকের মুখে। বাঁকটা ঘুরেই দেখা যাক না কেন এই মনে করেই আমরা বাঁ দিকে ঘুরে চললাম, সারি সারি তিন চারটি গুহাদ্বার দেখলাম, একটা গুহা প্রবেশ পথ থেকে আর একটা গুহার প্রবেশপথের স্বাভাবিক দূরত্ব সাত আট হাত হবে।

এই গুহার একটিতে এক উলঙ্গ মূর্ত্তি দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলাম তাঁর হাতে শঙ্খ একটি। আমরা তিনটি মূর্ত্তি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন,—ইয়ে গুফামে রাতকো রহ যাও, বাহার মে কেঁও মরোগে। তারপর তাঁর ডান হাতের কয়টি আঙুল মুখে তুলে, খাওয়ার কথা বুঝাতে যেমন সঙ্কেত করে, বললেন, ভোজনকা প্রবন্ধ কুছ হৈ, সাথ মে? বালকিষাণ এগিয়ে গিয়ে বললে, জি হাঁ, স্বামী, কুছ খানা সাথহি হৈ, হামলোক লায়াথা। বহুত আচ্ছা,—ব্যস, তব যাও ভিতর ইঁহা রহে যাও। বোলে তিনি আর একটা গুহার দিকে গেলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরাও নির্দ্দিষ্ট গুহায় প্রবেশ করলাম। তিনটি প্রাণী আমরা,—কেউ রাত্রের কথা ভাবেনি। এখানে সবাই আনন্দে কলরব করে উঠলো যখন আমার গরম জামার পকেট থেকে বাতি ও দিয়াশলাই বার করে আলো জাললাম। এটা যে আমায় আজ ব্যবহার করতে হবে তা ভাবিনি,—পকেটেই যেমন থাকে আজও ছিল এবং এই সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজে লেগে গেল। এখন সেই আলোতে আমরা ভিতরটা উজ্জল দেখতে পেলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রশস্তও কম নয় আট দশ হাত লম্বা ও ছ'হাত আন্দাজ হবে চওড়া।

প্রথমে আমরা মহানন্দে, কাল রাত্রের প্রস্তুত পুরী হালুয়া, আচার এই সব উপযোগ করলাম। এখন জল কোথা? বালকিষাণ, বাইরে গেল। সেই অপর গুহায় প্রবিষ্ট সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিশাল এক তুম্বাপূর্ণ জল নিয়ে এলো। কি মিষ্ট জল, যেন গলিত শর্করা পান করলাম আমরা;—তারপর গুহাদ্বার বন্ধ করে পদ্মনাভ স্মরণ করে শয়ন করলাম।

শয়নের পূর্ব্বে আমরা খানিক আজ এই আশ্রয় লাভের কথা আলোচনা করেছিলাম। আমরা বিপন্ন, আশ্রয়প্রার্থী, পথহারা এ কথা এই গুহাবাসী সাধুরা জানতে পেরেই শঙ্খধ্বনী করেছিলেন। এ বিষয় সবাই একমত। তারপর এই গুহাবাসীরা সাধারণ

এ জীবনে আর হবে কিনা এদিকে আসা। কিন্তু আমার ইষ্টের কৃপায় কখনও তা হয়েছিল পর পর, যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, তারপর কৈলাস মানস সরোবর পর্য্যন্ত। অবশ্য একেবারে এক সময়েই নয়। মনে হয় এক বৎসর পরে পর পর তিনটি বৎসরের মধ্যেই এ সবগুলি হয়ে থাকবে। এখন যদিও দেশেই ফিরেছিলাম, কিন্তু দীর্ঘকাল এমনকি ছয়মাস কাল একসঙ্গে কলকাতায় বাস করতে পারেনি। নিজ গৃহে, অর্থাৎ যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সে গৃহে তো আর এ জীবনে উঠিনি।

এই গুলাব কোঠি থেকে পরদিন আমরা চামৌলীর পথে যাত্রা করলাম। জানা পথ চড়াই উৎরাই নেই, তবুও পথটি তুচ্ছ নয়, এমনই মনোরম, এ স্তরে নানা রং-এর নানারূপ পাষাণ স্তর, কখনও পাশে কখন নীচে কখনও উপরে পদদলিত করে চলেছি; আর ফুল সাদা গুলাব,—ছোট ছোট চারটি পাপড়ির ফুল, বেশ বড় বড় ঝাড়, মাঝে মাঝে আমাদের আনন্দ দিয়েছে। ঐ নীচে দূর প্রবাহিণী, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ ও ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়চে,—দিব্য গন্ধ, এই হিমালয়ের পথের গন্ধ উপভোগ করতে করতেই আমরা চলেছি মাতাল হয়ে। আনন্দে পথটা যেন ভরপুর। চামৌলীতে আসবো তখনও ঠিক আছে আমি দ্রুত পা চালিয়েই আসতে আসতে মাঝ পথে এক স্থানে এসে, একটি ঝরনার ধারে বসে গেলাম। আসবার বেলা সামনের প্রত্যেক অপরূপ দৃশ্যের কাছে বিদায় নিয়েই তো চলেছিলাম। এখন চলন্ত অবস্থা থেকে একটু স্থির হয়েই উপভোগ করচি। খানিকক্ষণ পর জেঠা এসে উপস্থিত। মোট নামিয়ে একটু জল খেয়ে খানিক জিরিয়ে নিলে। তারপর সে অনুরোধ করলে সাথ সাথ চলো। এমন চমৎকার, ভয়শূন্য পথে, সাথ সাথ, যেতে ইচ্ছা কেন? পরে বলছি, এখন যদিও আমি সাথ সাথ যেতে রাজী হলাম। আমার এ একটা বন্ধন মনে হয়, এ পথে কারো সঙ্গে যাওয়া, আবার ধীরে ধীরে যাওয়াও কষ্টকর।

চামৌলী পর্য্যন্ত আসলে সাত চল্লিশ মাইল পথ যা পূর্ব্ব থেকেই একেবারে হিসাব করাই ছিল,—কিন্তু ফেরবার সময় চামৌলীতে আর থাকলাম না। মঠ চটি বোলে একটা সুন্দর চটি, দু মাইল আগেই সেই গ্রামখানি, সেই খানেই রইলাম। ধর্ম্মশালাও আছে, চটিও আছে, আর দোকান পাট যথেষ্ট, অথচ ভীড় নেই। নির্জ্জন ভাবটা আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বোলেই এইখানেই রয়ে গেলাম। এখানে থাকার গোড়ায় জেঠামশাইয়ের হাত ছিল। চামৌলীতে থাকবো একথাই ছিল, আর ঐ চামৌলীর সুখ্যাতি আমার মুখে শুনে,—অর্থাৎ কালরাত্রে যখন আমি কথা প্রসঙ্গে আজ চামৌলীতে থাকবার কথা বাস সঙ্গে সঙ্গে চামৌলীর গুণ বর্ণণা করে আমার ঐ জায়গার উপর একটা পক্ষপাত যুক্ত মনোভাব জানিয়ে ছিলাম, তখনই সে প্রতিবাদ করলে। সে স্পষ্টই বোলে দিলে বো জাগাহা আচ্ছা নহি,—রহনে কা লায়েক নহি। বো মাথে পর রহে যাও তো মালুম হোগা কৌনসে জাগহা আচ্ছা হৈ।

ঝো মাথে পর রহে যাও, কিয়ে বাবা! তখন ঐ, মাথে পর, কথাটা শুনে ভাবলাম জেঠা বুঝি পরিহাস করলে। পূর্ব্বে, মঠ বা মাথা গ্রামের কথা তো শুনিনি কোথাও,—তাই তখন রহস্য ভেদ করতে পারিনি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাথা? কিসকো মাথা? সে তখন বললে, গাঁও কি নাম মহারাজ। আজ সত্যই যখন মঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন বুঝলাম স্থানটি শিরোধার্য্য করার মতই। নামগুলি এ অঞ্চলে কি বিষম। জয় ভগবান; এমন প্রবঞ্চক এই চলতি স্থানের নাম গুলি। এখন এই যে স্বর্গ তুল্য স্থানের মধ্যে আমরা আজ এসে পড়লাম, আসলে স্থানটি মনোরম, চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের মধ্যেই এর অবস্থিতি।

এখানে কোনকালে একটি মঠ হয়তো ছিল। এখন একটি পাঠশালা মাত্র আছে। গ্রামখানির স্বল্প সংখ্যক অধিবাসী যারা সরল, সহজ এবং সুন্দর। তাদের অবাক হয়ে চেয়ে থাকা দেখেই মনে হয় বেশী বিদেশী এরা দেখেনি। অথচ বদরীকাশ্রমে যাবার এই পথটি, গ্রামের ধার দিয়ে চলে গিয়েছে। তবে চামোলী প্রভৃতি সংযোগ পথের মত বেশী যাত্রীর গতিবিধি থাকে না। এমন তৃপ্তিকর স্থান আর নাই। এখানে দুধ, ঘী খুব পাওয়া যায়, চাল, ডাল, আটাতো যায়ই, অনেক রকম ফলমূল, আনাজ তরকারীও পাওয়া যায়। কিছু ঘী আমরা এখান থেকে নিয়েছিলাম। এখন দরটা একটু চড়া ছিল। কারণ সবই এখন বদরীনারায়ণে চালান হয়ে যাচ্ছে,—এখানে কিছু জমতে পাচ্ছে না। এখানকার যা কিছু ভাল ফল, কাঁচা কাঁচা পেড়েই বদরীর পথে চালান যাচ্ছে। পিচটা এখানে হয়। তারপর, আপেল আখরোট গাছও আছে। গ্রামখানির আশে পাশে কত গাছ। গ্রামখানি যেন একটি বাগান,—সত্যই বড় সুখে এখানে রাত্র বাস করে পরদিন নন্দ প্রয়াগের পথে চললাম আমরা।

এবারে চতুর্থ প্রয়াগের পথে আসচি আমরা;—যেথায় নন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম। পূর্ব্বকালে গোপরাজ নন্দ যিনি শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা অথবা স্বাধীন মগধের সম্রাট সেই লোক বিশ্রুত মহারাজ নন্দ এখানে যজ্ঞ করেছিলেন, এ কথা কে মিমাংসা করবে, তাই পাঠকের কাছে দুজনকেই ধরে দিলাম। নন্দ রাজাদের সময়েও যজ্ঞ কর্ম্ম চলিত ছিল। পর্ব্বতের নামটিও নন্দ পর্ব্বত;—সেথায় চণ্ডী দেবীর মন্দিরও আছে, নন্দেরও একটি মন্দির আছে। নগরটি বেশ বড়। বাজার হাটও যথেষ্ট বিস্তৃত, বহু লোক সমাগমে মুখর। আগের চটিতেই এই সব সংবাদ অন্যান্য যাত্রী মুখেই শুনেছিলাম আর পথে মনে মনে ঐ সব তোলাপাড়া করতে করতেই আসছিলাম। পথে কল্পনায় নন্দ প্রয়াগ যা ছিল, তা বহু গুণ বেড়ে গেল আসল জায়গায় এসে, একথা আমি নিঃসঙ্কোচেই বলতে পারি। এসে দেখলাম সত্যই এটি নন্দেরই সঙ্গম বটে;—তখন নন্দ অর্থে আনন্দই বুঝলাম বা ধরে নিলাম।

মহানন্দেই এই চতুর্থ প্রয়াগে প্রবেশ করলাম। এই বিখ্যাত বদরীর পথে আগেই দেব, তারপর রুদ্র তারপর বিষ্ণু প্রয়াগ বিখ্যাত পঞ্চ প্রয়াগের তিনটি আগেই হয়েছে এখনও যে দুটি বাকী তার মধ্যে নন্দ প্রয়াগে এবার এসে যাত্রা সার্থক করলাম। এর পর কর্ণ প্রয়াগ মাত্র বাকী রইলো। এখানে এসে কিন্তু জেঠাই কথা প্রসঙ্গে, কোন পথে নেমে যাবো, কর্ণ প্রয়াগ দিয়ে মহেল চৌরী দিয়ে দক্ষিণ দিকে নামবো অথবা কর্ণ প্রয়াগ হয়ে রুদ্র প্রয়াগ দিয়ে দেব প্রয়াগের পথে হৃষীকেশে রেলে চাপবো এই বিষয় মিমাংসার জন্য পেড়াপীড়ি আরম্ভ করলে। এতে ওর একটু স্বার্থ ছিল, কারণ কর্ণ প্রয়াগ দিয়ে যদি যাই তাহলে তার অসুবিধা হবে। বিনা উপার্জনে ফিরতে হবে অনেকটা, আর যদি রুদ্র প্রয়াগ দিয়ে যদি যাই তাহলে একেবারে ঘরে পৌঁছে যাবে কারণ ঐখানেই ও ঘর। সুতরাং ঐ রুদ্র প্রয়াগের পথেই নেমে যাবো এই কথাই রইলো। নামবার পথ কম হবে একেবারে হৃষীকেশ থেকেই রেল ধরা যাবে। এই কথাই জেঠা জোর করে অনেক বার আমায় শুনিয়ে আর বুঝিয়েই দিলে, আমিও বুঝলাম। কাজেই ঐ পথই মনোনীত করলাম। যদিও বিরুদ্ধবাদীরা বলে মহেল চৌরীর পথে দু' দিনের পথ নাকি সেভিং হয়।

যাইহোক এখন এই নন্দ প্রয়াগ আমার নূতন স্থান, বলতে গেলে চামৌলী বা লাল সাঙ্গা থেকেই রুদ্র প্রয়াগ পর্য্যন্ত সারা পথ, প্রত্যাবর্ত্তনের পথটাই নূতন। এই নয় মাইল পথ আগেই বোলেছি রাজপথ চড়াই উৎরাই নেই। পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝ বরাবর কেটে মোটর রোডের মতই সুন্দর পথ করা হয়েছে। একদিকে উঠে গিয়েছে সোজা অরণ্য-ময় ঢালু পর্ব্বতভূমি একেবারেই শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত আর দিকে কখনও বামে কখনও দক্ষিণে ঢালু ক্রম নিম্নভূমি জঙ্গলে ও প্রস্তর সমাকুল ভূমি অনেক নীচে একেবারে অলকনন্দার স্রোত পর্য্যন্ত। সে দৃশুই আলাদা। এই ভাবের মনোহর দৃশু এই পথেরই বৈশিষ্ট্য। মনে হয় যেন কত কতকাল এই সকল ক্ষেত্রে কাটিয়ে গিয়েছি, আর সকল পথই আমার পরিচিত। এই সকল দেবভূমিতে আবার যেন আসবার সুযোগ ঘটে এই কামনাই সর্ব্বক্ষণ আমার মনে ছিল। পথে একটি সুন্দর ঝরনা পেলাম। ক্লান্ত না হলেও বসলাম ঐ ঝরনার টানে, তারপর পাথরের উপর শুয়ে পড়লাম আমার যে বড়ই আপন। কতক্ষণ এভাবে আমার শরীরটি দিয়ে ধরিত্রীকে ছুঁয়ে স্থানটিকে আত্মসাৎ করে নিলাম। ভাবছিলাম আবার কবে হবে, অথবা একেবারেই হবে কিনা কে জানে? তবুও আশা রাখি। যাইহোক এই নন্দ প্রয়াগের পথ এমনই সুন্দর মাধুর্য্যপূর্ণ সবার কাছে।

যে প্রবাহিণীর সঙ্গে অলকনন্দার মিলন ঘটাতেই এই ক্ষেত্রটি মহান তীর্থে পরিণত হয়েছে তার নাম নন্দাকিনী। নন্দা অর্থে আনন্দদায়িনী। এখানকার সকল প্রবাহিণীই গঙ্গা অপরূপ তার অভিব্যক্তি, আনন্দই তার মূল সত্তা। সুধু বিশালকায় উচ্চ অরণ্যময়

হরিৎ শরীরের জন্য এই হিমালয়ের এতটা প্রভাব কেউ যেন মনে না করেন। এরমধ্যে বিজন অরণ্য, দীর্ঘ আরোহণ অবরোহণ, বিষমাত্রী, যার নাম মাউনটেন-গর্জ, তারপর নির্ঝরিণী, প্রপাত, ধারা, তার উপরে বিস্তৃত তুষার ভূমি ;—সবার উপরে চির তুষারময় ধবল শিখর এই সকল নিয়েই এই বিশাল হিমালয়ের মাহাত্ম্য।

এই নন্দ প্রয়াগ ছোট নগর, পথটি পাহাড়ের একধার দিয়েই ঘুরে গিয়েছে, তার পথের দুদিকেই নীচে দোকান আর উপরে যাত্রীশালা এবং গৃহস্থদের বাস করবার ঘর। এখানে যাত্রী সমাগমও কম নয়। তবে বেশীরভাগ যাত্রী বদরীনারায়ণের পথে যাচ্ছে,—কারণ যাদের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, পথ কেমন, এই প্রশ্নই সবার মুখে। খুব কমই দেখলাম ফিরে আসচে এ পথে যেমন আমরা আসচি। যারা বদরী যাচ্ছে তারাও ফেরবার পথে আবার লাল সাঙ্গায় এসে অলকনন্দা পেরিয়ে গোপেশ্বর, রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ, উখি মঠ হয়ে আবার কেদারের পথে যাবে ত্রিযুগীনারায়ণ গৌরীকুণ্ড হয়ে। আবার ইচ্ছা করে যদি তারা কেদার থেকে ত্রিযুগীনারায়ণের পথ ধরে উত্তর কাশী দিয়ে ভাগীরথীর তীরে তীরে গঙ্গোত্তরীতেও যেতে পারে তারপর যমুনোত্তরী যাওয়াও শক্ত হবে না তাদের পক্ষে।

নন্দ প্রয়াগে আজ আমরা খুব আনন্দেই, স্নানাহার বিশ্রামের পরও কতক্ষণ কাটালাম। যেন যেতেই ইচ্ছা হয় না। জেঠা এইবার যাবার উদ্যোগ করছিল। বেলা প্রায় তিনটা। তাকে বললাম, মোটে তো তিন মাইল পথ, আমাদের গন্তব্য সোনেলা, পাঁচটার সময় বেরুলে সন্ধ্যার আগেই পৌছে যাবো, এত তাড়াতাড়ি কেন? জেঠা বুঝলে মনের কথাটা, সে অন্য দিকে মন দিলে ;—আমি পথের উপর দাঁড়িয়ে দেখচি,—এখনও যাত্রী আসচে কর্ণ প্রয়াগের দিক থেকে, সেই দিকেই চেয়ে আছি আর পথের কথাই মনে আসচে।

যতই হিমালয় থেকে নেমে আসচি ততই শরীরটা এত হালকা মনে হচ্চে যেন বাতাসে উড়ে চলেচি। বিশেষতঃ এই চামোলী বা লাল সাঙ্গা, এটা ওরা উচ্চারণ করে চমৎকার, লাল্ সাংগা বলে, আর শেষের গা, খুব জোর দিয়ে বলে। আমরা লাল্ সাঙা বোলেই সেরেনি। এখান থেকে যেন পাখা বেরুলো, উড়েই চলেছিলাম। এ পথটা তেমন চড়াই উৎরাই নেই বিশেষতঃ নন্দপ্রয়াগ তো উৎরাইয়ের শেষেই যেখানে সারাদিন কাটিয়ে এখান থেকে এখন যাবার আগে পথে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, বোলেছি।

একটা বড় দল, তারা উৎরাইয়ের পথে এসে পৌছে গেল। তাদের মধ্যে বাঙ্গালী পরিবারের কথাটিই বলবো। তাদের সঙ্গে ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঝাপান আর বহু কুলীবাহক আছে। প্রথমে কিছুতেই বাঙ্গালী বোলে চিনতে পারিনি। একটি যুবা তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এগিয়ে, তাঁর গলায় লাল রেশমের রুমালে বাঁধা কি ঝলচে তাঁকে দেখে আমি প্রথমে মনে করেছিলাম পেশওয়ার অথবা কাবুল অঞ্চলের কোন

আমীরের ছেলে হবে। তার বেশভূষার ধরণেও ঐরকম। এমন দীর্ঘ, সুপুরুষ মূর্ত্তি আগে দেখিনি। তিনি আগে এসে আমাকেই জিজ্ঞাসা করচেন; আপনি বদরীনারায়ণ থেকেই ফিরচেন বুঝি? আমি স্বীকার করবামাত্রই পিছনে একটি প্রৌঢ়া বিধবা, সাদা থানের উপর একখানি সিল্কের চাদর জড়ানো. তাকে উদ্দেশ করেই বললেন, দেখো পিসিমা, এরা কেমন সুন্দর এদিক দিয়ে নামচেন সব কাজ শেষ করে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনারা রুদ্রপ্রয়াগ দিয়ে আগেই কেদারনাথ করে তারপর বদরীতে শেষে গিয়েছিলেন তো? আমি এদেরও তাই করতে বোলেছিলাম কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। পিসিমার আগে বদরী নারায়ণ না দেখে আর কারো মুখ দেখবেন না। আমি বললাম, এওত ভাল, অনেকই দেখেছি বদরীনারায়ণেই আগেই যান যে—তাতে দোষ কি?

যুবা নিরস্ত হলেন না,—পিসিমার ইচ্ছা সবার আগে বদরীনারায়ণের মুখ দেখবেন বোলেই যে এদিকে এলেন তার কি হোলো? পিসিমা বড় গম্ভীর হয়েই ছিলেন এখন এই ভাইপোর কথায় তাঁর বাঁ হাতের দিকে একবার চাইলেন, এবং আমিও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম লোহার বালা এক হাতের মণিবন্ধে কাপে কাপ বসে আছে। এখন পিসিমা, সহজ উত্তর দিলেন.—তা হলেই বা, আমি যদি আগে নারায়ণেই যেতে চাই, তাঁরই মুখ আগেই দেখতে চাই। শুনেই যুবা হো হো হো হো শব্দে হেসে,—আকাশ ফাটিয়ে বললে, কোথায় রইলো প্রথমে তোমার নারায়ণ দেখা—আগেই তো দেবপ্রয়াগে রঘুনাথ মূর্ত্তি দেখলে, তারও আগে কতো কি আরও দেখেছ সেটা আমি তো ছেড়েই দিলাম;—ভেবে দেখো একটার পর একটা দেবতার মুখ দেখতে দেখতেই তো চলেছো।

পিসিমা তিলমাত্র অপ্রতীভ না হয়েই বললেন, রঘুনাথও ত নারায়ণ,—তিনি কি অন্য?—এইবার যুবা আর হাসলে না, কেবল বললে পিসিমা, তুমি উকিল হলে বেশ হোতো। বোনে আপনা আপনিই,—বলতে লাগলো একলা আসাই ভালো, তুমি আমায় বেঁধে নিয়ে চলেছ। পিসিমা বললেন, আরও একবার লোহার বালার দিকে চেয়ে,—তোকে একলা ছেড়ে দিতে পারি শিবু? তোর বাবা যে আমাকে রক্ষে করবার জন্যেই তোকে আমার সঙ্গে দিলে না? তুই না হলে কার সঙ্গে যেতাম বল?

কেন এইতো আরো সব যাচ্চে, তোমার পাণ্ডাও ত রয়েছে এই সব—

বাবা, তুই না হলে আমার চলবে কি করে, তুই তো বুঝবি না? আমাদের কাছেই অল্পদূরেই একটী ঝরনা দেখা যাচ্ছিল,—হু হু শব্দে উপর থেকে জল নেমে যাচ্চে পাথরের উপর দিয়ে, স্তূপের উপর দিয়ে নীচের দিকে হু হু শব্দে চলেছে,—দেখেই যুবা বললে, আমি চান করবো। পিসিমা এগিয়ে এসে হাত ধরলেন শিবুর, বললেন,—

ওখানে না থন, চটিতে পৌঁছে গেছি,—পথে ওখানেই বা কেন, এইতো নীচে গঙ্গা আছে সেখানেই চান করবি। আমরাতো এবার নন্দপ্রয়াগ পৌঁছে গিয়েছি, ওরে নিবু,—বোলে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ শরীর নিবু এসে দাঁড়ালো, বললে,—এসো ছোটবাবু, আমরাতো এবার এসে গিয়েছি চটিতো খুব কাছে। গম্ভীর মুখে শিবু এবার কোন কথা না বোলে চলতে লাগলো, তার জরীর কাজ করা পাঞ্জাবী জুতোও চলতে লাগল, মসমস্ মস্ মস্ আর কোন উচ্চবাচ্চ না করে শিবু যখন এগিয়ে গেল নিবুর সঙ্গে, তখন পিসিমা আমার সামনে এসে একটু নীচু গলায় বললেন, ওর কি সারবার রোগ হয়েছিল,—তিরলের বালা পরিয়ে সেরেছে এখন বেশ আছে। আর এই যাত্রায় হিমালয়ের পাহাড়ে ওর খুব আনন্দ,—কেবল জলধারা, ঝরনা, নদী দেখলেই চান করব বলে, ঐ চানটাই ওর সুখ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গলায় লাল রুমালে বাঁধা কি ঝুলচে দেখলাম। পিসিমা বললেন আমার নারায়ণ, আমাদের শালগ্রাম, ঘরে পূজা করবার কেউ নেই, ওই নিয়ে এসেছে বদরীকাশ্রমে রেখে আসবে বোলে। ও বলে কি, স্বপন পেয়েছে ঠাকুর নাকি বলেছেন আমায় বদরী নারায়ণে রেখে আয়, না হলে ভাল হবেনা। তাই ওঁকে নিয়ে যাচ্চে।

শিবু চলতে চলতে পিছন ফিরে যেই দেখলে তার পিসিমা আমার সঙ্গে পথের উপর দাঁড়িয়ে কথা কইচেন, সে সটান ফিরে এলো। এসেই আমায় ধরে টানাটানি। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি কি করবো, ভাবচি—পিসিমা আমায় বললেন, চলুন না আমরা যেখানে উঠবো একবার চলুন। এই অবোধ দেব শিশুটিকে শান্ত করতে আমায় যেতেই হোলো। তাঁদের ডাণ্ডি কাণ্ডি লোক লস্কর সব জমায়েত হোলো প্রাঙ্গণে। ইতি অবসরে পিসিমা আমায় চুপী চুপী বলে গেলেন আমরা ওকে চান করাতে নিয়ে যাবো সেই তক্কে সরে পড়বেন। অনেক মালপত্র, সব রাখা হলে, শিবুকে পিসিমা বললেন, চল চান করে আসি। যে শিবু ঝরনার জল, নদী, জল দেখলেই স্নান করবার জন্য ছট্‌ফট করে এখন সেই শিবু বললে, অবেলায় এই তিনটের সময় চান করবো কেন? আমরা আজ এখানে তো থাকবো, কাল সঙ্গমে স্নান করবো। কেমন ঠিক না, পিসি? পিসিমা বললেন, তা হোক, কোন অসুখ করবে না বরং দুবেলা চান না করলে তোর শরীর খারাপ হবে যে শিবু, চল, চল। ফটিক বাবু সব গুছিয়ে রাখবে তখন।

শিবু আমার দিকে চেয়ে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে, কি যে তার মনে হোলো জানিনা, তারপর পিসিকে বলে কি? এঁকেও নিয়ে চলোনা পিসি। পিসি প্রমাদ গণলেন, বললেন, ওঁরা যে কর্ণপ্রয়াগে যাবেন, আজই তো সেখানে পৌঁছে যাবেন বলে তৈরী

হয়েচেন, আমাদের সঙ্গে গেলে চলবে কেন, তুই চল। আমরা চান করে আসি। আজ এখানে আমরা এতটা পথ এসেছি, বলতে গেলে সেই কর্ণপ্রয়াগ থেকেই এখন,—স্নান করে রান্নাবাড়া করতে হবে, খাওয়া দাওয়া হতে সন্ধ্যা হবে যে বাবা, ওঁকে ছেড়েদে।

এবার শিবু বড় দুঃখেই বললে, আমার যাকে ভাল লাগবে তুমি পিসিমা তখনই তাকে, ছেড়েদে, ছেড়েদে করে তার কাছ থেকে আমায় ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্চো। কেন, তুমি ওকে নাওনা আমাদের সঙ্গে পিসিমা, উনি আর একবার না হয় চলুন না—দুবার তীর্থ করলে দোষ কি? এমন তীর্থ আর হবে কি? বোলে আমার দিকে সম্মতির অপেক্ষায় চেয়ে রইলো।

এবার পিসিমা এসে শিবশঙ্করের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন শিবু শোন্, বোলে নিয়ে গেলেন একটু তফাতে। কি বললেন কিছুই শুনা গেল না,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিবু একেবারে নির্জীব হয়ে গেল। মুখখানি ম্লান, চক্ষুদুটি করুণ হয়ে এলো,—যেন সে শিবুই নয়। তারপর ধীরে ধীরে পিসিমার কাছ থেকে ফিরে আমার কাছে এসে, আমার পায়ের কাছে নমস্কার করতে গেল, আমি তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। শিবু বললে, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন যেন দর্শন হয়, নারায়ণের দয়া হয় আমার উপর;—বোলে শিবু কাঁদতে আরম্ভ করলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তারপর পিসিমা তার হাতটি ধরে নিয়ে আমার সামনে দিয়েই ফটকের পথে চলে গেলেন তাকে গঙ্গায় স্নান করবেন বোলে। আমরাও চললাম, তবে এখান থেকে যাবার আগেই দ্রুত গিয়ে নামবার পূর্ব্বেই পিসিমাকে ধরলাম, তখন শিবুর হাত ছেড়ে দিয়ে পিসিমা তার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, শিবু আগে আগেই চলেছিল,—তাঁকে আমি বললাম, দেখুন! তিনি পিছন ফিরে আমায় দেখেই বললেন, আপনি আবার এসেছেন কেন এখানে? আমি বললাম একটা কথা আছে, অনুগ্রহ করে যদি শোনেন তো বলি। একটু বিরক্তির ভাবেই তিনি বললেন, বলুন শিগগির, আপনাকে দেখতে পেলে ও আবার অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। আমি বললাম, দেখুন খুব ভালই হয়েচে ওকে তীর্থে নিয়ে এসে; আমার ধারণা ও সাধারণ পাগল রোগী নয়, ওর অবস্থাটা মনে হয় উচ্চ যোগোন্মাদের অবস্থা, সাত্বিক ভাব ওর প্রবল, ওকে কখনও ওর কোন অপ্রিয় কাজ, যা ও চায়না এমন কোন বিষয়ে জোর জবরদস্তি করবেন না; কোন ভাল, সংভাবের সঙ্গী ওর দরকার, সেইজন্যই ও ছট্‌ফট্ করচে। পবিত্র ভাব ওর যেন কোন রকমে নষ্ট না হয়। বোলেই আমি কোন কথার অপেক্ষা না করেই চলে আসবো বলে ফিরলাম, পিসিমা বললেন, ঠিক এই কথাই রুদ্র প্রয়াগের এক সাধুও বলেছিল। ঐটুকু শুনেই আমি চলে এলেম।

এখন আমরাও সোনলার পথে চড়তে সুরু করলাম। আর এই শিবুর অদ্ভুত উন্মাদ জীবনের খানিক, যা আজ চক্ষের সামনে দেখলাম তাই তোলাপাড়া করতে করতে

যাচ্ছি। যে যাই বলুক শিবু কিন্তু নিজ ভাব ছাড়া আর কোন বিরুদ্ধ ভাব প্রশ্রয় দেবে না। কি অদ্ভুত; আমাদের সমাজে এত রকমের মানুষ জন্মায়, যা বাহ্য লক্ষণ দেখে আপন জনের কাছেও ধরা পড়ে না যে কোন ভাবের প্রেরণা এটা। আমার নিজের জীবনের প্রথম থেকেই তো দেখছি কি ভয়ানক একটা পাতকের দণ্ডভোগ করতেই যেন এই সংসারে জন্মেছিলাম। আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁধা মারই খেয়েছি, যতদিন না স্বাধীন ভাবে নিজের পথ বেছে নেবার জোর পেয়েছি। জীবনে এ ভাবের পরিণতি হতেই পারতো না যদি গোড়া থেকে আদরে, স্বচ্ছন্দে অভাবহীন সুখ আর স্বাধীনতা থাকতো আমার। এখন দেখ্‌ছি প্রতিকূল পরিবেশ আত্ম-শক্তিকে জাগাবার কাজে সহায়তা করে। সুতরাং যাঁরা আমার প্রতিকূল পরিবেশের জন্য দায়ী তাঁদের প্রতি আর আমার কোন প্রকার বৈরী ভাবতো নেইই বরং তাঁদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে শিখেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকুই দেখেছি আমার প্রতি এখন তাঁদের মনোভাব সম্পূর্ণই অন্য ভাবের, যেন মনেই হয়না এক সময় তাঁরাই আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন। এতে এই কথাই বুঝলাম, যে তাদেরও মনোভাবের পরিবর্ত্তন এসেছে এক রকম আমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। তাহলে কি এইটাই সিদ্ধান্ত নয় যে, আমার নির্ব্বাচিত সঠিক পথে নিজ উদ্দেশ্যে দৃঢ় নিশ্চিত পাদক্ষেপের ফলেই আমার সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব ঐ প্রকার পরিবর্ত্তিত হয়েছে ?

আমরা বেলা চারটার পর নন্দপ্রয়াগ থেকে যাত্রা করলাম। সোনেলা মাত্র তিনটি মাইল, সহজ পথ। এখান থেকে স্বচ্ছন্দ মনেই একরকম বেড়াতে বেড়াতেই আমরা চলেছিলাম। এই অঞ্চলে জনবহুল গ্রাম বা নগর কমই দেখেছি। নন্দপ্রয়াগের পর কর্ণপ্রয়াগই বড় স্থান এবং একটী বড় জংসন ষ্টেশন, কেন্দ্র। তবে আজ আমাদের গন্তব্য সোনালা,—পৌছে গেলাম প্রায় পাঁচটায়। এখানেই আজ রাত্রবাস। চটি, ধর্ম্মশালা, দোকান পাট, সবই খোলা আছে যাত্রীদের সুখ সুবিধার কোন অভাব নেই,—যার পর্য্যাপ্ত ঐ গোলাকার রজত চক্র আছে তার এ দুনিয়ায় কোন অভাবই নেই।

আকাশে মেঘ ছিল, আমাদের এপথে আজ ঘোর ঘনঘটা দেখলাম এমনটা আগে দেখিনি বোলেই মনে হল। তারপর ধীরে ধীরে যে জলটা আরম্ভ হোলো তা সবটুকুই সুখের। আমাদের গাঢ় নিদ্রার পর প্রভাতে যখন উঠলাম তখন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হোলো। আজ প্রাতেই আমরা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় জয় খণ্ডের পথে যাত্রা করলাম। অল্পদূরেই চটিটা ওখানে আমরা থাকবো না তবে পথটা ঐখান দিয়েই তাই উল্লেখ করলাম।

নন্দপ্রয়াগ থেকে কাল যখন যাত্রা করি তখন কোন গোলমালই ছিল না। সোনালায় রাত কাটিয়ে সকালে যখন যাত্রা করি তখন পাদুটি অর্থাৎ আমার চরণ যুগলই একটু-

ভারী একটী বেদনার পূর্ব্বভাষ যেন মনে হোলো। আরও তিনটি মাইল চলে তবে নাগরাসু এলাম যখন, তখন বেশ ভারি আর বেদনাও হয়েছে। গ্রাহ্যও করলাম না, যোয়ান শরীর, মনে বল, সব মিলিয়ে একটা, ও কিছু নয়,—ভাবটাই ছিল প্রবল।

পাড়ি বেশ জমিয়ে এই জয় খণ্ডে এসে যখন নিঃশ্বাস ছাড়লাম,—তখন গ্রাহ্য করতেই হোলো। বুদ্ধি বললে, সত্যই এটা দ্রুত চলার জন্যই হয়েছে এখন সত্যই কিছু বিশ্রামের দরকার। কথাটা সত্য, যখনই পথে বেরিয়েছি তখন যেন এক নিঃশ্বাসেই চলেছিলাম, তাইতেই সম্ভব চরণরাজ্যে শ্রম ঘটিত বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। এ বেলা এই জয়খণ্ডে স্নানাহার ও বিশ্রামের সংকল্প করলাম যদিও এটা মোটেই কোন নির্দ্ধারিত স্থান আমাদের তালিকায় ছিল না। প্রায় পাঁচটি ঘণ্টা বিশ্রামের পর তবুও চলতে হোলো। সাড়ে চার মাইল চলে এ অঞ্চলের ঐ বৃহৎ সঙ্গম তীর্থে অর্থাৎ করণ—প্রয়াগে পৌঁছে গেলাম। এখানে পিণ্ডার গঙ্গা আর অলকনন্দার সঙ্গম। এই পিণ্ডার, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদ পিণ্ডার তুষার ক্ষেত্র, ইউরোপ আমেরিকার পর্য্যটকগণেরও বিশেষ পরিচিত স্থান। অনেক পর্য্যটকই ঐ তুষার ভূমি এবং তার প্রান্তে তুষার শিখর লক্ষ্য করে উত্তীর্ণ হবার জয়োল্লাসে মত্ত হয়ে থাকেন। গত পরশু যোশী মঠ থেকে ফেরবার পথে, মারে সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখনই বলেছি তিনি ত পিণ্ডার গ্লেসিয়ার হয়ে এদিক ঘুরে তিব্বতে যাচ্চেন, যোশীমঠ হয়ে নিতিপাশ দিয়েই তাঁর পথ।

সবশুদ্ধ আমরা নয় মাইল এসেছি আজ;—তারপর কর্ণপ্রয়াগে এসে এই তীর্থের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ধর্ম্মের চেয়ে কর্ম্মের প্রসার এই স্থানটিকে শ্রেষ্ঠ করেই রেখেছে। এখানে সহজ পথেই এসেছি সত্য কিন্তু পিণ্ডার গঙ্গার পুল পেরিয়ে খানিক চড়াই উঠতে হয়েছিল। আর সেটা বোলে রাখাই ভালো, ঐ চড়াইয়ের অন্তে কর্ণপ্রয়াগ পেয়ে গেলাম যদিও চড়াইটা খুব বেশী নয়।

এই করণ প্রয়াগের সঙ্গেই কুন্তীদেবীর কানীন পুত্র এই বীর শ্রেষ্ঠ কর্ণেরই সম্বন্ধ একথা না বললেও চলে। ঐ নন্দ প্রয়াগে মন্দিরে যেমন নন্দরাজার খুব পুরাতন মূর্ত্তি আছে বোলেছি এখানেও এক মন্দিরে কর্ণেরও মূর্ত্তি আছে। এখানে দর্শনীয় যা কিছু, সবই বাইরের দিকেই আছে, সেদিক দিয়ে এমন বিশেষ কিছু নাই। এখানে ধর্ম্মশালাও যত, চটিও তত, পথ পরিবর্ত্তনের স্থান বোলে কুলি ডাণ্ডি, কাণ্ডী, ঝাপান, ঘোড়া গাধা, মোট বহনের যা কিছু বড় আড্ডা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও প্রীতির এইটাই কর্ণপ্রয়াগ।

কর্ণপ্রয়াগ আর একটি অবতরণের পথ উপর হিমালয় থেকে, অনেকেই কেদার শেষে বদরীনারায়ণের মহাতীর্থের পর এই কর্ণপ্রয়াগ দিয়েই রাণীক্ষেত পৌঁছান তারপর সেখান থেকে রামপুর না হয় কাটগুদামে গিয়ে রেল ধরেন।

বদরীনাথ থেকে এই কর্ণপ্রয়াগ সাড়ে সাতষটি মাইল, সেখান থেকে সিমলী আদবদরী

লোভা, মাহেল চৌরী, পান্নুয়া খাল,—গনোই অথবা চৌখুঠিয়া, দোয়ারা হাট থেকে রাণীখেত সাড়ে দশ মাইল পোঁছে সোজা যাট মাইল মোটার রোডে কাটগুদাম রেল ষ্টেশনে। আমাদের সময়ে মোটর রোড ছিল না কাজেই রাণীক্ষেত থেকে কাটগুদাম পর্য্যন্ত যাট মাইল হাঁটতে হোত না হয় ঘোড়ায় প্রায় বাইশ মাইল রাণীক্ষেত থেকে আলমোড়া দিয়ে কাটগুদামে পৌছতে হোত্তো। এখন অনেকগুলি পথের উন্নতি হয়েছে যাত্রীদের সে দুঃখ আর ভোগ করতে হয় না।

এখানে কর্ণ প্রয়াগে এসেই আমরা কমলীবালার ধর্ম্মশালায় উঠেছিলাম। মাঝের বড় ঘরেই ঢুকে পড়লাম। কতকগুলি যাত্রী ছিলেন দেখে, যেদিকটা খালি আমি সেই দিকটাই নিলাম। আজ যাত্রীর ভীড় ছিল। একজন বলচে,—

এখানে স্বধু ঘুরে বেড়ালেইতো হবে না, পুঁজী বাড়ানো চাই, এই কথাটা শুনেই চেয়ে দেখি লোকটিকে। বাঙ্গালী, টাকমাথা, বেশ উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, শ্রমহেতু গালে লাল আভা,—সপ্তাহ খানেকের দাড়ি গোঁফ, মিশ মিশে কালো ভ্রুর নীচে মানানসই দীপ্তিপূর্ণ চক্ষু দুটি, তীক্ষ্ন দৃষ্টি। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের উপর, একটু খর্ব্বাকৃতি,—সহজ বাঙ্গালী পোষাক কিন্তু চাদর নেই গায়ে কাপড়ের উপর কোট পরা, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, বেশ প্রসন্ন মুখ একজন যাত্রী। সঙ্গে তাঁর দুজন আছে,—একটি নারী, বোধহয় স্ত্রী, অপরটি আপন জন নিশ্চয়ই। ধর্ম্মশালার বড় ঘরখানার মধ্যে শেষ দিকে মালপত্র রেখেই, বেশ নিশ্চিন্ত মনে কথা কইচেন, পাশেই, আর একদল যাত্রীর সঙ্গে। সে তিন চারটি যাত্রীদের মধ্যে সবাই পুরুষ, তার মধ্যে প্রৌঢ় আছে, যোয়ান আছে একটি বৃদ্ধও আছে। বেশ অবস্থাপন্ন মনে হোলো। তাদের সোনার বোতাম প্রত্যেকেরই সার্টে, আঙ্গুলে রত্নালঙ্কৃত আংটি, সঙ্গে তাদের এক চাকরও আছে নিজেদের। বৃদ্ধকে তামাক সেজে দিলে গুড়গুড়িতে। এরা সব একই পাণ্ডার অধীনস্থ যাত্রী বুঝলাম। যাই হোক এখন,—

যিনি প্রথম বলেছিলেন, অর্থাৎ যার কথা আমার মনযোগ আকর্ষণ করেছিল, তিনি যখনই কথাটা বোললেন,—বোধ হয়, কথা বার্ত্তা তাঁদের মধ্যে চলছিল আগে থেকেই, এখন কথাটা শুনেই বৃদ্ধ লোকটি তাঁর পাশের যুবা পুরুষটিকে বললেন, আমাদের মিত্তির মশাইয়ের কথাগুলির দাম আছে। তখনই দেখলাম মিত্র মশাই পকেট থেকে নস্য দানি বার করে ছিপি খুলে হাতে ঢাললেন। সেই ছেলেটি তখন জিজ্ঞাসা করলে, পুঁজি আমরা কি করে বাড়াতে পারি সেটাও যে বোলতে হয়, মিত্তির মশাই। মিত্তির মশাই তখনই বললেন, এক জ্ঞানের পুঁজি, আবার কর্ম্মশক্তিরপুঁজি, অভিজ্ঞতার পুঁজি—কত কি পুঁজি আছে। বৃদ্ধ তামাক টানতে টানতে বললেন,—দেব দ্বিজে ভক্তির পুঁজি, মানুষে মানুষে ভালবাসা সৌহার্দ্দ্যও ত একটা বড় মনের কথা। মিত্র তৎক্ষণাৎ বললেন,

তারপর অভিজ্ঞতার পুঁজী, তার সঙ্গে ধনের পুঁজী। বৃদ্ধ বললেন, এ কি কথা বললেন মিত্তির মশাই, এর মধ্যে ধনের পুঁজীর কথা আসে কি করে ?—

কেন আসবেনা এসব জায়গায় কাটবার মত কিছু কিছু জিনিসপত্র আনলেই তো ধনের পুঁজীও বাড়ানো যায়। বৃদ্ধ কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুদর্শন যুবা পুরুষটি বললেন, তা হলে তীর্থ ধর্ম হবে কি করে ? মন তো পড়ে থাকবে ধন উপার্জ্জনের দিকে। শুনে যেন বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন, গোঁপের ফাঁকে একটু প্রসন্ন ভাব যেন বেরিয়ে এসেই প্রায় সবার মনেই চারিয়ে দিলে যাঁরা সেদিকে দেখছিলেন। এইবার মিত্র মশাই বললেন, মন অনেক দিকেই রাখা যায়। আসলে যেটা মূল কাজ সেটা সব সময়েই উপরে থাকে, তাতে কোন বাধা না হয়, সেটা ঠিক রেখে তারপর অন্য দিকেও ত কাজ করা যেতে পারে। যদিও ঠিক এই তীর্থ ধর্ম্মের সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্য রাখতে আমিও চাই না, তবে অভিজ্ঞতা থেকেই বলচি, এই তীর্থ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে একদল তীর্থ যাত্রী ব্যবসাও করে চলেছে এটাও দেখেছি কিনা তাই বোলচি।

কথা শুনেই বৃদ্ধ বললেন, তা সত্যই, আপনার ভূয়োদর্শন ঠিকই আছে,—এরকমও হয় ;—তবে এটাও মনে হয় তারা মাড়োয়ারীই, কখনও অন্য জাতি নয়। মিত্র মশাই বললেন, একথাও ঠিক তারা বাঙ্গালী নয় কিন্তু একথা তাবোলে ঠিক নয় যে তাদের চেয়ে বাঙ্গালীর বেশী ধর্ম্মজ্ঞান বা মহত্ত্ব আছে বোলে বাঙ্গালী তাদের মত ব্যবসায় অনুরক্ত নয়, বা অধর্ম্ম বা অসৎবুদ্ধিও তাদের চেয়ে কম নয়। আসলে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধিই কম, ও দিকে যাবার প্রবৃত্তিরই অভাব। জাতিগত বৈশিষ্ট্যই তো ধনোপার্জ্জনের উপর প্রাণ ঢালতে দেয় না। তবে মাড়োয়ারী ছাড়াও অন্য দেখেছি, ঐ পাহাড়ী ভোটিয়ারা, তারা মাড়োয়ারী নয় তবে মনোভাব অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন সম্পর্কে তাদের ভাবটা মাড়োয়ারীর মত এটা সত্য। তারা ধনকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করে। সেই প্রিয় দর্শন যুবাটি তখন জিজ্ঞাসা করলে, কেন বলুন তো? মিত্র মশাই বললেন, ধনোপার্জ্জনের মূল অভাব বোধ। ঘটনাক্রমে ধন এসে গেলে, যতটা অভাব, সেটার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়ে গেলেও যে পন্থায় তার ধনোপার্জ্জন সহজেই হচ্ছে সেই পন্থার ভিতর দিয়ে ধনাগমের ফলে একটা সহজ নেশা লেগে যায়, আর যদি তার মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা, অথবা পবিত্রতার উৎকর্ষ না থাকে তখন ঐ ধনেই জড়িয়ে পড়তে হয়। তারপর সদসৎ অনেক কর্ম্মেই ঐ ধনের মারফৎ হয়ে পড়ে। এই যে অন্নসত্র, ধর্ম্মশালা, জলসত্র প্রভৃতি এসব কর্ম্মে বড় বড় দান তাদের বড় বড় ধনোপার্জ্জনের ফল।

চরিত্র সংশোধন, সৎভাবের পুঁজীও কম বাড়ে না এই তীর্থ তারপর ব্রহ্মচর্য্য, স্বাস্থ্যের পুঁজি আছে আরও কত কি। এ পর্য্যন্ত শুনেই আমার নিজ কর্ম্মে যেতে হোলো। এরা, দেখলাম কেউ ঘোড়ায়, কেউ ডাণ্ডিতে, কেউ হেঁটে গেলেন নন্দ প্রয়াগের দিকে।

যাই হোক তখনকার দিনে সহজ যে পথ দিয়ে অর্থাৎ কর্ণপ্রয়াগ থেকে রুদ্র প্রয়াগ শ্রীনগর দেবপ্রয়াগ হয়ে স্বচ্ছন্দেই হৃষীকেশ কিম্বা হরিদ্বারে আসা যেতো সেই পথে আসাটাই সুবিধা মনে করেছিলাম। তার প্রথম পড়াও ছিল গৌচর। ছয় মাইল পথ, এই গৌচর গরুচরার জায়গা কিনা জানি না,—তবে শস্য শ্যামলা ভূমি অনেকটাই পর্ব্বতের কোলেই গ্রামখানি, বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানে দিঙমণ্ডল আনন্দ পরিপূর্ণ। যদিও মেঘভরা আকাশ, মিষ্ট গন্ধ বাহী বাতাস আর পরিষ্কার নদীর জল, মধ্যে মধ্যে বর্ষণের মধ্য দিয়ে বেশ চলেছিলাম নিজ পথে, স্ফূর্ত্তির কোন ব্যাঘাত হয়নি। আমরা গৌচরের চটিতেও একদল প্রায় ছয় সাত জনের একটি যাত্রীদল দেখলাম। তারা সবাই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক। দুটি কলেজ ষ্টুডেন্ট আলীগড়ের, বেশ আনন্দে হিমালয় এক্সপ্লোর করতে চলেছে। যেমন পথে, পথিকের সঙ্গে পথিকের দেখা হলে হয়ে থাকে, কেমন দেখলাম বদরীনারায়ণ? পথ কেমন, পরিস্থিতি কেমন? ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন। তাদের সন্তুষ্ট করতে পারিনি কারণ উত্তরে বললাম, যেটা আমার ভাল লাগে সেটা আর কারো ভালো না লাগতে পারে সেই জন্য এ সকল পথের নিজ অভিজ্ঞতা দিয়েই সব কিছুর পরিচয় নেওয়াই ভালো। তবে চড়াই আর উৎরাই, তার আর ভালো মন্দ কি?

যাই হোক গৌচর থেকে একবেলা চারমাইলের মাথায় নাগরাসুতে স্নানাহার বিশ্রাম তারপর দুটা নাগাদ যাত্রা করে তিনটি মাইল সুখে হাঁটার পরে শিবনন্দীতে পৌছানো গেল। নগরাসু থেকে শিবনন্দী মাত্র তিন মাইল পথ, সোজা সুন্দর, হেঁটে সুখ আছে। শিবনন্দী একটি বড় না হোক মধ্যমাকৃতি চটি। সব কিছুই পাওয়া যায়;—চাল ডাল উরুদকী ডাল খোসাসুদ্ধ আর ঘি, তেল, নুন ও লকড়ি। এখানে লকড়ির এত প্রাচুর্য্য হায় হায়, এ প্রাচুর্য্য বদরী বা কেদারে যদি থাকতো সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হল যে ঐ বদরী কেদারের ক্ষেত্রে অত ঠাণ্ডা আর বরফ যদি না থাকতো—তা হলে কি সুন্দরই হোতো। একখানা নিধুবাবুর গান মনে পড়ে গেল,—ঐ সকল বরফের রাজ্য থেকেই গানখানা আমার মনে উঁকি মেরেচে বারবার;—

তবে প্রেম কি সুখের হোতো;
আমি যারে ভালবাসি,
সে যদি আমায় বাসিত।
কিংশুক কি সুখ ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিহনে
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরেরি জল, হ'ত যদি সুশীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত।

কি জানি এই গানখানা বদরীনারায়ণের আশ্রয় থেকে নেমে আসতে মনে আমার

সারা পথটাই একটা কিসের প্রেরণা যুগিয়েছিল। গান করতে করতেই এসেছিলাম। ভাগ্যে পথে ধোপারা কেউ ছিলনা।

দিনের সারা পথেই আমরা দুজনে কত ভাবের অভিব্যক্তি ছড়াতে ছড়াতে এসেছিলাম তার ঠিক নাই। সে কথা এখন মনে হলে, বেশ একটা অদ্ভুত লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব সঙ্কোচহীন ভাবের জন্য আনন্দও হয়। যাই হোক, এই শিব নন্দীতে রাত্র কাটিয়ে, প্রভাতেই সোজা রুদ্র প্রয়াগের পথে যাবো এই সংকল্প করেই চটিতে রাত্র যাপন করলাম। এখানে শিবের মন্দির তো আছেই আবার বৃষরূপী নন্দীর মূর্ত্তিও আছে। সারা ভারতের সকল প্রদেশেই শিবের বাহন যে বৃষ তাকেই নন্দী বলা হয়;—কিন্তু আমাদের বাঙ্গালায় নন্দী, বৃষ নয়, বৃষ হল শিবের বাহনমাত্র। বৃষ বৃষই,—তার নামও বৃষ কাজও নিশ্চিত বৃষেরই কাজ;—আর নন্দী হোলো শিবের প্রধান শিষ্য, সেবক আনন্দময় শিবের তত্ত্বাবধায়ক, শিবের প্রিয়তম অনুগত ভক্ত,—সর্ব্বকালেই শিবের নিকটেই তার স্থান,—এইটিই বাঙ্গালার অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালীর নিজস্ব পৌরাণিক শিব এবং নন্দীর ধারণা। কিন্তু সারা ভারত বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পশ্চিম প্রদেশে নন্দী বলতে বৃষটি বুঝায়। কি জানি পুরাণ সম্বন্ধে বাঙ্গালার ধারণা এবং অন্যান্য প্রদেশের ধারণার পার্থক্য এতটা কেন? সকল প্রদেশের রামায়ণ মহাভারতের এমনকি ভাগবতের ব্যাখ্যারও পার্থক্য আছে জানি কিন্তু শিব আর নন্দী নিয়ে এমন গোলমাল কিভাবে স্থান পেলে তা এখনও বুঝতে পারিনি।

পরদিন রুদ্র প্রয়াগ। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস পরিষ্কার, আর পরিষ্কার ছিল আমাদের মন। প্রাণভরা আনন্দ একদিকে, আর একদিকে এই কথাই মনে হচ্ছিল হিমালয়, আমার প্রিয়তম মহান, গম্ভীর, রহস্যের আকর হিমালয়,—সৌন্দর্য্যের মহিমায় চির উজ্জ্বল, দেব দ্বিজ গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, সিদ্ধ যোগী ক্ষেত্র এই হিমালয়ের পথ যে শেষ হয়ে আসচে। আরও সেই জন্য অনেক দূর পথ হাঁটচিনা একদিনের পথকে দেড় দিন, কখন কখনও দুদিনও করেছি কিন্তু তবুও শেষ হতে চলেছে। কিন্তু শেষ হোক আমার হৃদয়ে তার সকল স্থান সকল মাহাত্ম্য যেটুকু আমার এই সঙ্কীর্ণ প্রাণ ধারণা করতে পেরেচে তা আমার মধ্যেই ধরা, এমনকি হৃদয়ক্ষেত্রে খোদিত হয়ে আছে—তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই আর হবেও না।

শিবনন্দী থেকে রুদ্র প্রয়াগ আট মাইল অর্থাৎ চারক্রোশ মাত্র সুতরাং আমাদের কোন কষ্টই হোলো না। তারপর থেকে পূর্ব্ব পরিচিত পথগুলি সেইজন্য পরবর্ত্তী ভ্রমণের মধ্যে পথের কথা আর বলতে হবে না। যদিও এই রুদ্র প্রয়াগ থেকে যখন পুরানো পথেই আসছিলাম তখন কিন্তু বিপরীত দিকে গতির জন্য এ পথ কোন প্রকারেই পুরানো মনে হল না, বরং প্রত্যেক স্থানই নূতনই মনে হলো আর নূতন বোলেই উপভোগ করা গেল।

যতটা সময় অর্থাৎ একটা দিন ও একটি রাত্র এই রুদ্র প্রয়াগের মধ্যেই ছিলাম আর এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান মনে করেই ছিলাম, এখান থেকেই জেঠামশাইকে পেয়েছিলাম, আবার এখানেই তাঁকে ছাড়বার কথা। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সত্য সত্যই এই স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ছিল বিশেষ আর এক অপ্রত্যাশিত কারণে। সে কথা পরে বলচি কিন্তু তার আগে এখনই একটা কথা আমায় বোলতে হবে। এখানে জেঠা এসেই আমায় একটা চমৎকার গুহাবাসী সাধুর কাছে নিয়ে গেল। চার পাঁচ জন তার কাছেই বোসেছিল। দেখতে তাঁকে অনেকটা জটিয়া বাবার মত। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অপর নাম ছিল জটিয়া বাবা, পার্থক্যের মধ্যে এর শরীর দীর্ঘ আর উদরের স্থূলতা কম। না হলে জটাভার একই রকম। মুখের ভাব প্রায় একই রকম মনে হয়। এখন এই কৃষ্ণানন্দজী এখানে মৌনীর মতই ছিলেন কারো সঙ্গে কোন কথাই কইলেন না, চক্ষু তাঁর অত্যন্ত চঞ্চল অবস্থায়, চারিদিকেই ঘুর ছিল। আরও বড় ভয়ানক দেখাচ্ছিল তাঁর চক্ষের পাতা নেই, কাজেই সে দৃষ্টি বড় তীব্র। অনেকেই কিছু এনেছে সেগুলি সব সামনেই রাখা আছে। জেঠামশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে নমস্কার করে তো বসলাম, জেঠাযে সেই হাত জোড় করেছে সে হাত সেই রকমই রইলো। খানিক বসার পর সবাই উসখুস্ করচে দেখা গেল; তিনি অভয় মুদ্রা দেখিয়ে সবাইকে উঠতে বারণ করলেন। আর কি থাকতে পারে শেষে, এই ভেবে আমরা রইলাম তবুও। শেষে দেখি পাশ দিক থেকে থালা হাতে ঢুকলো এক মাইজী গৈরীক ধারিণী ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বয়স উজ্জ্বল রং অত্যন্ত গম্ভীর। পরসাদ লেই লে, বোলে সবার হাতেই দুটি একটি কিসমিস, একটু শুকনো নারিকেল, একটি এলাচদানা এই সব, পরসাদ, দেওয়া হলে সবাই যেমন করলে আমরাও প্রণামান্তর উঠে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের দিকে চললাম।

এইখানেই আমাদের তীর্থস্থান ভ্রমণের শেষ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হলো, দাঁ মশাইদের সঙ্গে যখন দেখা হোলো। রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে আমায় অবাক করে দিয়ে যখন তিনি হাসতে হাসতে,—এই যে আবার দেখা তো হোলো, বোলে এ গিয়ে এলেন,তার শ্যালিকার আবির্ভাবও দেখলাম শুধু নয় তাঁর স্বাস্থ্যের চমৎকার উন্নতিও হয়েছে। এখন তিনি আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচেই ব্যবহার করলেন। এমনই আত্মীয়তার ভাব আমি পূর্ব্বে কখন কল্পনাও করিনি। অবশ্য রুদ্রপ্রয়াগে আমরা প্রথমে দেখা না হলেও ঘটনাচক্রে পৃথক ঘরে একই ধর্ম্মশালায় অর্থাৎ তাঁরা যেখানে ছিলেন আমরাও সেখানে উঠেছিলাম। এখন দাঁ মশাইয়ের সঙ্গে দেখা,ঐ রুদ্রেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে আমায় চমকে দিয়ে সামনে আবির্ভুত হয়ে বিকট হেসে উঠলেন, তখনই আমি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ছিলাম, এভাবে এমন সময় এখানে তাঁদের থাকা কি করে সম্ভব। পরে শুনলাম। তিনি তাঁর বাজখাই আওয়াজ বার করে, যেভাবে ভুষণ্ডির মাঠে ইটের পাঁজার কোল

থেকে সেই কর্ত্তা ভূত বেরিয়ে পেনেটির নিতাই ভড়চাজকে তাক লাগিয়েছিল নিজের বৈভবের কথায়,—সবই বন্ধকী তমসুক দাদা, বোলে পরিচয় যুক্ত আক্ষেপ, এখন দাঁ মশাই ঠিক সেই ভাবেই বললেন, সবই বরাত দাদা সবই বরাত, না হলে বাবা এতটা অনুগ্রহ করেও শেষে ফিরিয়েইবা দিবেন কেন ?

আমি বললাম, কেন উনি তো বেশ সেরেই উঠে ছিলেন দেখেছিলাম, যখন ওখান থেকে চলে আসি? বাধা দিয়ে তিনি বললেন, সেরেতো সত্যই গিয়েতোছিলেন, কিন্তু বাবা শেষ অবধি আবার এক ঘা লাগালেন যে। এত সহজে কি আমায় নিষ্কৃতি দেবেন, ইত্যাদি। ধৈর্য্য ধরে রইলাম, তবুও আর প্রশ্ন করলম না। এই অবস্থা দেখে গিন্নিই এগিয়ে এসে সব খুলে বোলে আমায় বাঁচালেন। বললেন আমারই দোষেই আবার পড়লাম। কেদার থেকে আমরা পরদিন যাত্রা করি। যে ডুলটায় গিয়েছিলাম সেই ডুলিই আমায় নিয়ে এসে গৌরীকুণ্ডে পৌছে দিলে,—তখন মনে হোলো আর আমার কিছু বেদনা নেই একেবারেই সহজ হয়ে গিয়েছে, ডুলিওলাকে বিদায় দেওয়া হোলো, সেও তার ঘরে চলে গেল। কিন্তু অদৃষ্টে দুর্ভোগ থাকলে যা হয় আমার তাই হোলো। রাত্রে ভালই ছিলাম।

পরদিন আমরা যাত্রা করলাম। পথে নেমে আবার ঐ জায়গায় বেদনা বাড়লো, রামপুরে এসে কোন রকমে পড়লাম শয্যা নিয়ে। উনিতো চটে গিয়ে বললেন, আর বদরীনারায়ণ গিয়ে কাজ নেই, চল রুদ্র প্রয়াগে ফিরে যাই। তাই হোলো, ওখান থেকে কাণ্ডিতে এসে সেই যে এখানকার হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিলাম কাল ছাড়া পেয়ে বেরিয়েছি। এখান থেকে হরিদ্বার যাবো।

আমি বললাম, ভালো, যেন আবার হাঁটবার চেষ্টা করবেন না, কাণ্ডি কিম্বা ডাণ্ডিতেই এইটুকু যাবেন। সেখানে দাঁ মশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, আমায় ফতুর করলে, কাণ্ডিতেই পঁয়ত্রিশ টাকা গিয়েছে এইটুকু আসতে, আবার এখানে থেকে ডাণ্ডিতে চেপে যেতে হবে হরিদ্বার ? সর্ব্বনাশ। আমি বললাম, এতটা ভূগে আবার পথ চলায় যদি—

দাঁ মশাই আবার বিরূপ হলেন, বললেন, এখান থেকে এইটুকু, হেটে যাওয়া যাবে না কেন ? সেরে গিয়েছে তো, তা ছাড়া এতো সোজা পথ, সেরকম চড়াই তো নেই। দাঁ মশাইয়ের এ মূর্ত্তি তো কেদারে দেখিনি।

আমি আর ওখানে না দাঁড়িয়ে চলে এলাম যেখানে মালপত্তর রেখে জেঠা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জায়গায়। এবার জেঠা বলে কি, আমায় বিদায় দাও। অবশ্য টাকাকড়ি চুকিয়ে দেওয়া হোলো তখনি, কিন্তু আমি ধরে বসলাম আমায় একজন লোক দিতে হবে হৃষীকেশে পৌছে দিতে। আমারই সৌভাগ্যক্রমে লোক পাওয়া গেল না, কেউ হরিদ্বারের দিকে যেতে রাজী নয়। তখন জেঠা বললে, তাহলে আমাকেই যেতে হবে। হোলো ভালো,—কথা রইলো কাল ভোরেই আমরা রওনা হব। ইতিমধ্যে

বাদল নামলো প্রবল বেগে। দুপুর বেলা যখন ভোজনান্তে বিশ্রামে ছিলাম, দেখি পা টিপে টিপে দাঁ গিন্নি হাজির হলেন,—জেগে আছেন? এই কথাই যেন জিজ্ঞাসা করচেন। ব্যাপার কি? গিন্নি বললেন,—আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আমি ওঁর সঙ্গে যেতে চাই না। এ কি অসম্ভব কথা! আমার সঙ্গে আপনার যাওয়া, অসম্ভব। উনি এত খরচ করে এনেছেন, শেষ পর্য্যন্ত আপনার জন্য—

এবার বাধা নিয়ে তিনি বললেন, হায় হায়, আমার এমনই বরাত বটে উনি খরচ করে আমায় এনেছেন,—উনি আমার জন্য এত করেছেন, জানেন ব্যাপার কি, কার টাকা? ও সব তো আমারই টাকা, উনি পর্য্যন্ত আমার টাকায় এসেচেন। আসবার সময় কড়কড়ে চারশো টাকা গুণে নিয়েচেন, সে টাকা কি সবই খরচ হয়ে গিয়েছে মাত্র এই কয়দিনে? আমার টাকায় আমায় ভাণ্ডিতে যেতে দেবে না, ও টাকা আর বার করবেন না বোলেই এই সব ফ্যাঁকড়া তুলেছেন। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে চাইনা, আপনাকে চুপি চুপি বলচি, বলে আওয়াজ খুব খাটো করে,দরজার দিকে দেখে বললেন, ওঁকে তো চিনি, গোপনে দুশো টাকা রেখেছিলাম এখনও আমার কাছে আছে, সেই টাকায় আমার দেশে যাওয়া হতে পারে কি? কখনও কারো গলগ্রহ হয়ে আমি যাবোনা। সুধু একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করবেন, পথে বিপন্ন মেয়ে মানুষ কিনা তাই, আপনি ভাল লোক বলেই বলচি।

বললাম, সে কথা নয়,—ঐ টাকায় আপনি স্বাধীন ভাবেই যেতে পারবেন, কিছুই বলবার নাই কিন্তু কেন, এই শেষ কালটায় এরকম বিচ্ছেদ করবেন?

তিনি একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, পারতেন আপনি সহ্য করতে, আপনার টাকা এ ভাবে আত্মসাৎ করে প্রতিপদে পদে, আমায় ফতুর করলে, আমার সর্ব্বনাশ করলে, ঐ বন্ধুর সামনে দিন রাত ঐ সব শুনতে? জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ বন্ধুটি কে,—ওঁর সঙ্গে আপনার টাকা সম্পর্কে সবকথা তিনি কি জানেন?

এবার গিন্নি যেন হতাশ হয়ে পড়লেন, বললেন, কি বলবো কত কথাই বা বোলবো, ওঁর যথা সর্ব্বস্ব যে দাঁ কর্ত্তার পেটের মধ্যে। সঙ্গে এনেছেন তীর্থি ধর্ম্ম বাবদে আরও এককাঁড়ি টাকার দায় ওর ঘাড়ের উপর চাপাবার জন্য। ওর কি আর কিছু থাকবে, ওকে পথের ভিকিরী করে ছাড়বে। বন্ধুকে তিক্ষ করিয়ে স্বর্গে যাবার পথ করে দিতেই এনেছেন।

এত কথার পর কি আমি বলবো কিছুই ভেবে উঠতে পারি নি। যাই হোক শেষে বললাম, আমাকে আপনি নিষ্কৃতি দিন, আমি আপনাকে একটি সহায় জুটিয়ে দিচ্ছি, গরীব সে, তাকে দুটো মিষ্টি কথা আর কিছু বকশিষ দিলেই আপনার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে।

জেঠামশাইকে দিলাম তাঁর সঙ্গে যাবার কুলী ও ডাণ্ডির সকল ব্যবস্থাই করে দেবে তারপর হৃষীকেশে কিম্বা হরিদ্বার গিয়ে একটা টিকিট করে দেওয়া, শুনেই তিনি বললেন, আমি হৃষীকেশ থেকেই যাবো, কারণ ওঁরা হরিদ্বারেই যাবেন, সেখানে দুই একদিন থেকে তবে দেশে যাবেন, ওদের এই রকমই কথা আছে। এখান থেকে আমি স্বাধীন ভাবেই যেতে চাই। আমি আজই যাবো। এখানে আজ আমি আর রাত্র কাটাবো না।

তাই হোলো। জেঠামশাই একটা কুলী মাল পত্র নেবার জন্য আর একটি ডাণ্ডির ব্যবস্থা করে দিলে। আজই বৈকালে তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিজের যা কিছু সব নিয়ে। বলে গেলেন, এখানে দু মাইলের মাথায় যে ছোট চটি আছে আজ সেইখানেই থাকা যাবে। এই সব মৎলব তিনি ঠিক করেই রেখেছিলেন। ওরা বেলা চারটে আন্দাজ বেরিয়ে গেলে আমি নিঃশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস আমার অদৃষ্টে নেই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুঁড়োজালি হাতে তার মধ্যে আঙ্গুলে মালা জপ করতে করতে দাঁমশাই এলেন, চক্ষে সংযত রোষ বহ্নি। এসে একেবারেই নির্ঘাত প্রশ্নটি,—আপনি সঙ্গে গেলেন না ?

আমি বললাম, আমি তো আজ যাবো না, কাল ভোরেই তো যাবার কথা আমার। আমার কথা তার কাণে ঢোকবার আগেই আবার প্রশ্ন হল, খুব তেজ করে মাগিতো ডাণ্ডি নিয়ে চলে গেল, পয়সা পেলে কোথা ? শুনে আমি বললাম, সেটা আমার জানবার কথা তো নয়।

ও, তাই বলচি, সঙ্গে সঙ্গে গেলে কেমন কেমন দেখায় না তীর্থের ফেরত ? উনি আমার কথা কিছুই বলেন নি, আপনাকে টানবার বেলা ? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজে আরম্ভ করলেন, বাব্বা, মেয়েমানুষ বটে,—আমার তীর্থধর্ম্মটা মাটি করলে,—এত করেও মন পাওয়া গেল না, কি না করেছি ওর জন্য,—আমার যথা সর্ব্বস্ব গেল, ওর জন্যেই আমার বদরী হোলো না, নিছক এইখানে আমায় বসিয়ে রাখলে ?

বুঝলাম, আমার কথা বলবার কর্ত্তব্য থেকে রেহাই দিলেন। আপন আসন থেকে উঠে আমি বাইরে এলাম। তিনি সঙ্গ ছাড়লেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে ঐ বন্ধুটি, তাঁর মুখখানা এমন শুকনো, দেখে অস্বস্থি হয়। হায় নকড়ি বসাক,—বন্ধুর উপকার তার উপর তীর্থ দর্শন,—তাকে দেখেই কর্ত্তা খিঁচিয়ে উঠলো, তুমি এখানে কিকত্তে এসেছ; ওখানে আমার মাল পত্তর গুলো পড়ে আছে,—এখানে পিছনে পিছনে আসার মানে কি ?

সে বেচারা, আমার সামনে এই খিচুনীটা ঠিক হজম করতে পারলে না, তখনই বললে, ঘরে চাবি দেওয়া হয়েছে, বোলে পকেটে চাবির গোছার শব্দ করে দেখিয়ে দিলে।

এত দুঃখেও তাদেখে আমার হাসি এলো। দাঁমশাই এবার বন্ধুর দিকে দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে,—জানেন, এরজন্য কত করেছি, তীর্থে পর্য্যন্ত এনেছি,—বেইমান, এরা বেইমান, বাপ বেইমান, ওর পিতোমো পর্য্যন্ত বেইমান,—হুঁ এ তুনিয়ায় কারো ভালো কত্তে আছে?

এই বেইমানের তালিকা শুনেই বসাক ন' কড়ির মুখ লাল হয়ে উঠলো, সামনেই দেখলাম, সে এখন আর কিছু সহ্য করলো না। তার ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, তুমি বড্ড বড় বড় কথা বোলচ যে হয়েকেষ্ট,আমার বাপ,পিতোমো তোমার কি বেইমানি করেছে? অপরাধের মধ্যে ঠাকুর্দা তোমার কাছে কিছু কর্জ্জ করেছিল, আমার বাবা তো তার জন্যে যথাসর্ব্বস্ব তোমার কাছে তুলে দিয়েছে, এতে বেইমানিটা কি হোলো। তুমি তো কিছু কম আদায় করোনি।

দাঁমশাই গলাকাটা চীৎকার আরম্ভ করতেই আমি দ্রুত ধর্ম্মশালা থেকে বেরিয়ে পথে এসে হাঁপ ছাড়লাম। আঃ, আর চারটি বা পাঁচটি দিন কাটাতে পারলেই এ অশান্তির শেষ হবে। হায় ভগবান, শেষ পথে একি যোগাযোগ ঘটলো। মানুষ, মানুষ, মানুষ, পথের মধ্যেও মানুষে মানুষে টানাটানি, ছেঁড়াছিঁড়ি, দলাদলি, শেষে তীর্থধর্ম্মের ভিতরেও এত অশান্তির বীজ থাকে।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে জেঠাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রুদ্র প্রয়াগ থেকে ফিরবার পথে মাইল খানেকের মাথায় গুলাব বাগ নামে ছোট্ট এক খানি গ্রাম আছে, যাত্রীরা কখনও কখন এখানে একবেলা কাটায়,—কিন্তু রাত্র বাসের জায়গা নয়। দাঁগিন্নি এইখানে ছিলেন, আমরা যখন এখানে পৌছেচি তখন সূর্য্যোদয় হোলো। জেঠা বললে, বো দেখো, ডাণ্ডি, মাইজি অভিতক ইহাই ঠারা। দেখলাম, তিনি এখনও এইখানেই আছেন। দেখা হোলো বটে কিন্তু আমি দাঁড়ালাম না। তিনি বললেন, আমার কথা নিয়ে আপনাকে কিছু নিশ্চয়ই শুনতে হয়েছে তাই বুঝি আপনি রাগ করে আর আমার সঙ্গে কথাই কইবেন না, কিন্তু জেনে রাখুন আপনার উপকার আমি কখনই ভুলবো না। ভগবান যদি সত্য থাকেন আপনি আমায় যে বিপদ থেকে উদ্ধার—

কেন আপনি ওসকল কথা বলছেন, আমি আপনার তিল পরিমাণও উপকার করিনি, করেছে ঐ লোকটা,—জেঠাকে দেখিয়ে বোললাম, সুধু আপনার নয় ও আমারও উপকার করেছে, ওকে আমিও ভুলতে পারবো না। আমার কথাটায় তিনি কি মনে করলেন তা জানি না যেন একটু অবিশ্বাসের ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম উপকার করেছে আপনার,—

তখন বললাম, রুদ্র প্রয়াগ থেকে হরিদ্বারের ওদিকে যাবার কুলী পাওয়া যায় না,—

তবুও তিনি বললেন, কেন? আমায় বুঝিয়ে দিতে হোলো যে এখান থেকে পঁচানব্বই মাইল পথটা গিয়ে তবে হরিদ্বার। এখান থেকে তারা বেশ গেল ভাড়াও পাওয়া গেল তার জন্য, কিন্তু ওখান থেকে ওদের পাঁচ দিনের পথটা শুধু হাতে আসতে হবে, কারণ এখন যাত্রা শেষ বোলে ওদিক থেকে আর ভাড়া হবে না। সেইজন্য আপনার পক্ষেও ডাণ্ডি পাওয়া সহজ ছিল না;—এ অবস্থায় যে এতটা সুবিধা করে দিলে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা নয় কি?

এখন সব কিছু বুঝে তিনি বললেন, আপনার কোন উপকারই আমি করতে পারবো না এইভেবে একটু নয়, বিলক্ষণ দুঃখ পাচ্ছি। যাইহোক এরপর আপনার ইচ্ছায় আর বাধা দেবো না। নমস্কার।

নমস্কার বোলে আমিও খুব দ্রুত হন হন করে পা চালিয়ে দিলাম। সেই রাত্রে ছাটি-খালের সেই ডাক বাঙ্গালায় এসে নিশ্চিন্ত মনে দাওয়াতে বিছানা পেতে রাত্র যাপন করলাম। পুরানো জমাদার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলো আনন্দে রাত্র যাপন করে, শ্রীনগরে পথে পাড়ি দিলাম। মোটে নয় মাইল পথ বেলা এগারোটার সময়ে পৌঁছে গেলাম। দিনের এবেলাটা এখানেই থাকা, স্নানাহার ভোজন ও বিশ্রাম।

ফেরবার পথে শ্রীনগরের কথাও একটু আছে। এইখানে আমার একমাত্র সঙ্গী রামপ্রসাদকে হারিয়ে দুঃখ পেয়েছিলাম। সে বেচারা গোস্ত খাবার জন্যই দরজীর মেহ-মান হয়ে ঢুকেছিল আর বার হোলো না তার দোকান থেকে। এখন সেই দরজীর দোকানের সমুখ দিয়েইত গেলাম আর অতীতের কথাগুলি ঠেলে উঠলো স্মৃতি থেকে। সে যে মুসলমান এখনও আমি ভাবতে পারিনি, হিন্দু সেজে হিমালয় ভ্রমণের খেয়াল তার কেন হয়েছিল সেইটাও বুঝতে পারিনি।

শ্রীনগরের চেহারা দেখলাম বদলে গিয়েছে, যাবার সময় যে রকম দেখেছিলাম এখন যেন সেরকম নয়,—আমার মনের অশান্তি বা পরিবর্ত্তনটা বোধ হয় এ ক্ষেত্রে কাজ করেচে, এটাও হতে পারে আমি গতবার যে সময়টায় এসেছিলাম সেটা প্রায় সন্ধ্যা এবারে ভরা দিন দুপুর,—সেই জন্য এতটা পরিবর্ত্তন। যাবার সময় শ্রীনগরে প্রবেশ করে-ছিলাম তখন এই নগরের যে শ্রী দেখেছিলাম, এবারে দিন দুপুরে সে শ্রী দেখতে পেলাম না অথচ নগরটী সেই শ্রীনগরই বটে। শ্রীহীন দেখাটী আমার দৃষ্টি দোষ এই কথাই ঠিক। সে যাই হোক আজ আমায় এখানে থাকতেই হোলো।

বদরী অভিমুখে যাত্রাকালে যে তালে চলেছিলাম, এখন তার মান দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলাম। হয়তো আমি ধীরে ধীরে চারদিক এ অঞ্চলটা ভাল করে দেখতেই দেখতেই যেতাম কিন্তু ঐ পিছনের দাঁ-মশাই এবং তার কুটুম্বিনীর দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তাড়াতাড়ি করছিলাম। রাণীবাগেই আজ নবরাত্রির অধিবাস হবে আমাদের এই

ব্যবস্থা ঠিক ছিল সকাল থেকে জেঠামহাশয়ের সঙ্গে। বিশ্রামান্তে এখান থেকে মাত্র মাইল দশ গেলে আজই রাণীবাগ পৌছাবো এই রকম হিসাব করছিলাম। এমন সময় জমাদার, এক বুড়াকে হাজির করলে, শুনতে পায়না কালা, হাপানী রোগী যেন স্থবীর, যদিও তার বয়স পঞ্চাশের বেশী নয়। একটিও চুল পাকে নি। কি ব্যাপার? বৃদ্ধ শ্রীনগরের লোক—একটি উপযুক্ত ছেলে, ছেলেটি কাজের লোকও ছিল, সেই এই-হাঁপরোগে ক্লিষ্ট বাপকে খাওয়াতো। সে আজ কয় দিন কোথায় চলে গিয়েছে। তার সঙ্গী বান্ধবেরা বলেছে যে সে নাকি কলকাতায় চলে গিয়েছে। আমি কলকাতার মানুষ, যখন এদিক থেকে উপরে যাই তখনই ধর্ম্মশালার জমাদার সেটা জেনেছিল। এখন দেশে ফিরচি তাই জমাদার বুড়োকে আমারই কাছে এনেছে এই ভেবে, যাতে আমি কলকাতায় গিয়েই তার জমাদারের ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাপের দুঃখের কথা বোলে, যেন পাঠিয়ে দি। তার কাছে যে কথা পেলাম তার মোদ্দা কথা এই। এখন এদের কি করে বুঝাই যে কলকাতাটা শ্রীনগর নয় আর সেখানে ডাক বাঙ্গলা বা যাত্রী শালায় আমায় উঠতে হবে না। দূর করো ছাই, এই সব অবুজ গাঁইয়াদের কি করে বুঝাই।

পল্লিগ্রামের মোড়লের যে অবস্থা এখানকার ডাক্‌বাঙ্গলার জমাদারদেরও সেই পর্য্যায়। রাস হালকা সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে এরা অনেক খবরই রাখে। রাস হালকা আমি তো বটেই। যারা গম্ভীর, সায়েবী মেজাজ কারো পানে চেয়ে দেখে না। তাদের কাজ না থাকলে ধর্ম্মশালার জমাদারের সঙ্গে কথাই কয় না। কাজেই এরা তাদের থেকে দূরেই থাকে, সুধু সেলাম বাজিয়ে আর ইনাম হাত পেতে নিয়েই খালাস। তা ছাড়া কলকাতার লোক, মর্য্যাদায় যেন তারা একটু বেশী। এই সব কারণে আমার উপরেই এই কাজের বোঝা সসম্ভ্রমে এসে ঘাড়ে পড়েছিল। কিন্তু এতটা বাক্যব্যয় যার অপর নাম মাথা ফাটাফাটি করেও কিছুতেই তাদের মনে প্রাণে এ বিশ্বাস জন্মে দিতে পারিনি যে, কাজটি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যখন কিছুতেই পারলাম না তখন জমাদারের সাহায্যে সেই পলাতকের যে সব বন্ধু, সে কলকাতায় গিয়েছে খবর দিয়েছিল তাদের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে বললাম। দস্তুর মত পুলিস ইনস্পেক্টারের কাজ আর কি। ভাগ্যক্রমে তারা তিনজন এলো, সবাই বিশ বৎসরের নীচে বয়স। তারা এসেই তো ভড়কে গেল যখন আমি সরল বন্ধু ভাবে আসল খবরটী জানতে চাইলাম। তাদের, একজনকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, ও জানে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, ঐ বাবু জানে এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে শেষে যে তত্বটুকু উদ্ধার হোলো তা এই,—গত সপ্তাহে রামকৃষ্ণ মিশনের তিন জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন বাবুও এসেছিলেন। সেই ভারি কলকাতার বাবু ডাণ্ডিতে, সন্ন্যাসীরা হেঁটেই এসেছিলেন। সেই বাবুর সঙ্গেই সে গিয়েছে। বাবু তাকে খুব পছন্দ করেছিলেন আর কাশীনাথের কলকাতা যাবার ঝোঁক বরাবরই ছিল বেশী কারণ কাশী-

নাথের দৃঢ় বিশ্বাস, কলকাতায় না গেলে ধনবান হওয়া যায় না, তাই সে চট্‌করে স্বীকার করেছিল। তা ছাড়া ঐ সন্ন্যাসী সোয়ামীরা, বাবুটিও, তার বাপের সঙ্গে দেখা করে, কথা কয়ে, তাকে নিয়ে যাবে বোলেছিল। ছেলেটা তাতে রাজী হোলো না। কোথাও যেতে কারো মত নিতে হবে না, সে বলে, তার হুকুম নেবার কেউ নেই বা সে কারো কথা মানবে না। আসলে বুঝলাম অনেক দিনের আশা ফল দিয়েছে দেখে কাশীনাথ দৌড় দিয়েছে ইষ্ট-মন্দিরের ঠিকানায়।

আর আমার কিছুই করবার নেই বুঝে, যখন জমাদারকে, আর ছেলেটির বাবাকেও বুঝিয়ে দিলাম সে ছেলের ফেরবার আশা না করাই ভালো;—তবে সে রোজগার করে টাকা পাঠাবে তাইতেই ছেলের দুঃখ বা শোক ভুলতেই হবে, অন্য পথ নেই।

কিন্তু এই জোয়াল যখন নামাতে পারলাম তখন আর রাণীবাগে যাবার সময় নেই, পাঁচটার পর তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আজ এইখানেই আমার নবরাত্র কাটাতে হোল, কি আর করা যাবে। আমরা বিধাতার বিধানে অধিক বিশ্বাসী, পুরুষার্থ আমাদের সেকেণ্ডারী অর্থাৎ গৌণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বোলেই এই দুর্ভাগ্য আমাদের, একথা বৃটিশ রাজ আমাদের দুশো বছর ধরে বুঝাচ্ছে। আমরা বুঝবো না, কিছুতেই নয়,—এর জন্যে যে দুর্গতি বরণ করতে হয় করবো। কিন্তু ভেবে দেখতে ইচ্ছা করে আসল রোগটা কোন খানে? এই ছেলেটা কাশীনাথ, সেতো কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে, রুগ্ন বাপকে এই অসহায়, দুরবস্থার মধ্যে ফেলে না গেলেই পারতো, তাকে ত্যাগী বলে শ্রদ্ধাও করতো লোকে টের পেলে কিন্তু,—সে যে কিছু বিশেষ অন্যায় কাজ করেছে তা তো মনে হয় না, তার অবস্থার উন্নতির দায়িত্ব সে নিজে নিয়েছে। সে তার বান্ধবদের চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছে তার কেসটা। সে বলেছে এমন সুযোগ কোথায় পাবো, বাবুরা খেতে দেবে, রেলে করে নিয়ে যাবে। রেলের অতোটা ভাড়া দিয়ে একজনকে নিয়ে যাওয়া কি সহজ কথা। তারপর সেখানে গিয়ে সে মাইনে পাবে, বাবাকে পাঠাবে। এমন ভাগ্যকে ছাড়া যায়? ছাড়লে কি ভালো হোতো তার? আর আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোন সমাজেরই ন্যায় নিতি বিগর্হিত কিছুই ত করেনি সে।

যাই হোক কর্ম্মবিপাকে শ্রীনগরে রাত্র যাপন তারপর প্রভাতে যাত্রা করে বেলা সাড়ে এগারো প্রায় তখন রাণীবাগ চটিতে পৌছে গেলাম। জেঠামশাই প্রত্যহই আমার প্রতি মমতার পরিচয় দিচ্ছেন। এই এক মায়ার ফাঁদ। যার সঙ্গে একটু, একদিন ঘর করা যায় তার উপর মমতা। আবার দেখচি ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত কাণ্ড আমার চিত্তক্ষেত্রে চলচে। প্রায় দু মাস কাল হিমালয়, নানা মূর্ত্তিতে আপনার মধ্যে নানাভাবে, কখনো সহজ, সরল, কখনও কঠিন বন্ধুর পথ হয়ে, দৃশ্যরূপে, কত আশা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির

সহায়তা করে ভ্রমণ ব্রত উদযাপনে আমায় ধন্য করে দিলে ;—সে সকল একত্র তাল পাকিয়ে ঐ জেঠার উপর এসে পৌঁছেচে। তাকে দেখছি যেন মহান হিমালয় এই যাত্রায় জেঠা হয়েই আমার সকল ভার পিঠে নিয়ে চলেছে। এমন আপন বুঝি আজ সংসারে আর কেউ নেই যার সঙ্গে জেঠার তুলনা হতে পারে। কেমন করেই বা দুদিন পর— এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ ঘটবে তাই ভাবচি, কি ভয়ঙ্কর!

রাণীবাগের কথা বিশেষ কিছু নেই আজ এই খানেই স্নানাহার—বিশ্রামান্তে চললাম পথে। বেলা ছয়টা—তখন দেবপ্রয়াগ এলো আমাদের কাছে। সেই বাবা কমলীর পুরানো ধর্ম্মশালায় উঠলাম না। এবারে নূতন এক আশ্রম বাড়িতে আঁচল বিছালাম এবং দশম রাত্র যাপন করলাম। দোকানী পসারী যাদের সঙ্গে পূর্ব্বে একটু লেনদেন হয়েছিল সবাই যেন আমার উপর শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করলে। অবশ্য বড়ই আশ্চর্য্য লাগলো যখন হিন্দু নামে খাবারওয়ালা, হয়তো তার দোকানে খাবার দাবার সে রাত্রে নিয়েছিলাম আজ সন্ধ্যার পর খাবার আনতে গিয়ে দেখি সে নমস্কার করে বলছে,—আপকো তীরথ পুরা হোগেয়া,—মহারাজ? কি জানি এরা রাতেও যাত্রীদের চেনে সল্প এই যাওয়া আসার পথে। এটা মনে আছে আমাদের ওদিকে যাওয়ার সময় এই অঞ্চলে এরা, দোকানের মালিক যারা, বোধ হয় প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল কোন পথে ফিরবো? আর সবাই এই পথটাই ভালো তাই এই পথেই প্রত্যাবর্ত্তনের অনুরোধও করেছিল। তাই আজ যখন এরা দেখল, এই পথেই ফিরেচি খুসী হোলো, বড়ই প্রসন্ন বাহু বিস্তারে কেউ কেউ কোলাকুলি পর্য্যন্ত করলে।

দেব প্রয়াগের চেহারাটা, এই ফিরবার পথে যেন সমৃদ্ধিশালী দেখলাম। এটাও দৃষ্টি খেলা কিম্বা মানসিক অবস্থার প্রতিচিত্র কিনা জানিনা যদিও,অনেক সময় মনের অবস্থা বাইরের পরিস্থিতিতেও প্রতিফলিত হয়। তা এখানে ঘটেছিল কিনা জানি না বা বুঝিনি, প্রথমে যখন প্রাচীন এই দেব প্রয়াগের নামে মুগ্ধ হয়ে এসেছিলাম, এখানে কতো কি পুরানো কালের স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়েই এটি সেই কালের অবশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র নগর বোলেই দেখেছিলাম। রঘুনাথের মন্দিরের ভিতরেও দেখেছিলাম কিন্তু এমন ভাবে প্রভাবিত হইনি। আরও এ সকল মন্দিরে দেবতার মূর্ত্তির উপরে তখন একটা তমোভাব আমার মধ্যে ছিল যেন—আমি আর এসব কি দেখবো? এখন আর এক চক্ষে রঘুনাথকে দেখলাম, এ যেন অভয় বর দাতা, আমার সকল দুর্ব্বলতা, সকল দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে আমায় আপন বুকে টেনে নিয়েছেন। কেদার, বদরী, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ত্রিযুগী নারায়ণ এসকল দর্শনের পর মনে এখন আর কোন আকাঙ্ক্ষার বোঝাই নেই, আমার হৃদয় পূর্ণ,—তাই এখানে এখন যা দেখচি আর এক রকম, গৌরবের চেয়ে প্রেমের বস্তু সব মনে হচ্ছে। জয় রঘুনাথ, জয় জয় রঘুপতি,—রাত্রে আরতি

দেখলাম। ধন্য হলাম। মনে হোলো এখান দিয়ে যখন যাই তখন আমি ছিলাম অহং বিমূঢ় আশা বাদী, এখন হয়েছি প্রেমাকাঙ্ক্ষী, অথবা পূর্ণ ভক্তি বাদী।

পাহাড়ের কোলে যে সব ধর্ম্মশালা, দোকান, পথ, লোকের ঘর যাত্রীশালা গাণ্ডাদের আশ্রয় তখন যেন এত সুন্দর এত অভ্যর্থনা এর মধ্যে ছিল না; এখন এই অভ্যর্থনা কিসের?—যেন ইষ্টসিদ্ধি অভ্যর্থনা। পোষ্ট মাষ্টার মিশ্রজী যখন বললে, ক্যা বাবুজী সব আচ্ছা দর্শন ভ'ই? আপকে দর্শনমে পুণ্য, হামলোক—বাধা দিয়া বললাম, অব আপকো দর্শনমে হামারা পুণ্য, হামারা যিতনা পাপ, বো অঘন সব উতার গই। বলবা মাত্র সে এসে কোলাকুলী করে বললে, এয়সা মৎবোলা করো সন্তজী, ইয়ে অচ্ছি বাৎ নহি,—আজ ইহা পধারিয়ে, হামলোক কো দর্শন দেনা, কুছ শুনেগা আপনা মু সে। ইয়ে বরদান তো দে না। আশ্চর্য্য, এদের কাছে তীর্থ বিবরণ বোলতে হবে। আগে আমাদের মনে এই ধারণা ছিল যে হৃষীকেশের পর থেকে ঐ যতদূর হিমালয় আছে, পুণ্য ভূমিতে যারা বাস করে তারা সবাই কেদার বদরীর কথা তো জানেই সবাই প্রতি বৎসর বুঝি একবার করে দেখে থাকে। কিন্তু এখন অভিজ্ঞতা বলে আর এক কথা;—যোশী মঠের অধিবাসী একজন সে বোলেছিল আমি কখনও বদরীনারায়ণ দেখিনি, আমি ঠাট্টা কথা মনে করেছিলাম, কিন্তু জেঠামশাই বললে, ইয়ে সচ্চাবাৎ, বহোত এয়সা হ্যায়, কভি উধার গেয়া নাহি। রুদ্র প্রয়াগ রহনেবালা হরদোয়ার পচাশ দফ হো আয়া লেকেন কেদার ভগবান কভি ন দেখা ত্রিযুগীনারায়ণ কিধার হৈ উসিকো মালুম ভি নহি।

চমৎকার—

এখানে পোষ্টমাষ্টারের যোগাড়ে ভাগবৎ কথার এক বাসর হয়েছিল রাত্রে। কি সুন্দর হিন্দি ভাগবৎ কথা,—এর আগে শুনিনি। আমাদের রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবত যে ধরণের এদেশে ঠিক সেইভাবের নয় এখানে রামচরিত মানসের মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা ছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই বলবার। কিন্তু সুধুই শ্লোকের ব্যাখ্যা হোলেও তা নেহাত নিরস নয়। আমরা প্রচুর উপভোগ করেছিলাম। বোলতে বোলতে কথকের বেশ সুন্দর একটি ভাবের স্ফুরণ হয়েছিল বেশ বুঝা গেল পাঠকের আন্তরিকতা আছে, গভীর ভক্তিও আছে ইষ্টের উপর। বড়ই আনন্দে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দিবারাত্র দেবপ্রয়াগে কাটিয়ে এমনই আনন্দ পেয়েছিলাম এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম সবার যা পূর্ব্বে যাবার পথে কখন হয়নি। যাই হোক আমরা পরদিন প্রাতেই রওনা হলাম কোটলীভেলের পথে। মোটে নয় মাইল সোজা ময়দান পথ। চড়াই-উৎরাইবিহীন পথকে এখানে ময়দান পথ বলে। বেলা সাড়ে দশটার সময় পৌঁছে গেলাম। চমৎকার চটি আছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভারি সুন্দর স্থানটি। স্নান, পান, ভোজন বিশ্রামে প্রায় আড়াই তিন

ঘণ্টা কাটিয়ে আমরা এগারো মাইল বিজনীর পথে পুরাদমে পা চালিয়ে দিলাম। অবশ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পূর্ব্বপরিচিত বিজনীতে পৌছে গেলাম।

আমার বেগ দেখে জেঠা একটু গুইগাঁই আরম্ভ করলে,—কেন এত ছোটা, একটু ধীরে ধীরে চললে ক্লান্তি আসবেনা,—তাড়াতাড়ি শরীর ভেঙ্গে যাবেনা। ইত্যাদি ওসব কথা তো আমি জানি,—তবুও তাড়াতাড়ি যে কেন করচি কি করে ওকে বুঝাই। ঐ দাঁ—গিন্নি ও কর্ত্তা এদের অপ্রিয় সঙ্গ এড়াতেই তো এত কাণ্ড করচি। যে গতিতে আমি চলচি, তারা কিছুতে আমায় ধরতেই পারবেনা। এখন একটা দিনের ব্যবধান ঠিকই আছে। পথের মধ্যে কোথাও দেরী হলেই বিপদ, তাই যেন রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছি। জেঠাকে একথা না বোললেও, আর—লোকটাও সরল বোলেও কতকটা নিশ্চয়ই বুঝেছিল। বিজনীতে দ্বাদশ রাত্র হোলো ফেরবার পথে অর্থাৎ আজ বারো দিন আমরা স্বর্গের অধিকার ছাড়িয়ে এসেছি।

পথের দুদিকেই শিবালিক শ্রেণীর পর্ব্বতমালা। হাওয়াতেও হিমালয়ের মহিমা, আর দৃশ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। সকল মাটি মাড়িয়ে চলেছি হিমালয়কে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শের ফল লাভ করতে করতে। মনে সাধ নারায়ণকে জানিয়েছিলাম, যদি তাঁর কাছে প্রার্থনা আন্তরিক হয়ে থাকে তাহলে ফল ঠিকই পাওয়া যাবে। আমাদের মত একজনের এই পুণ্যভূমিতে দেহত্যাগ করবার কথা মনে হওয়াও বড় দম্ভের মতই শুনায়, —বিশেষতঃ যারা সহরান্ত প্রাণ, সহর ছাড়িয়ে যাদের মনবুদ্ধির বিকাশ সম্ভব নয়। মনে মনে অন্তরাত্মা আমার সহর থেকে দূরে থাকাই কামনা করে। কিন্তু কাম্যবস্তু লাভ কি সহজ, আর সহজেই কি তার নিকটস্থ হওয়া যায়? যাঁরা পান তাঁদের প্রতি ঠাকুরের কৃপার অন্ত নাই। আজ হৃষীকেশ পৌছাবো,—কিন্তু জেঠা সকালেই আরম্ভ করলে,—

এয়সা না করোজি, এত্না ঘাবড়াও মৎ, আজ রাতভি গড়ুরমে রহোনা, ফির কাল সুবো কো তিন ঘণ্টেমে হৃষীকেশ পৌছাও গে। ওর উঁহা একরাত রহে যাও, ফির দুসরে রোজ টেন মে বৈঠ যাও—জলদি ঘর পৌছ যাবেগা।

তার কথার উপর এতদিন কথা কইনি আজ আর মানতে পারলাম না, কিন্তু কেন যে তাড়াতাড়ি যেতে চাই সেটাও বলবার নয় তাই জোড় হাত করে বললাম, মাফ কিজিয়ে জেঠাজি আজ মুঝে হৃষীকেশ পৌছনাই পড়েগা, ফির কাল হামকো টেন পর বৈঠায় দেনা।

এবার গড়ুর চটিতে পৌছে গেলাম। স্নান, ভোজন, বিশ্রামও হোলো। কি পবিত্র স্থানটি, যাবার সময় তো এমনভাবে দেখিনি,—এখন যেন অতি প্রিয়জনের মতই অচ্ছেদ্য বন্ধনের মত বোধ হোলো এর মায়া কাটাতে। এত রূপ, পথের সঙ্গে এই আশ্রয়ের কি চমৎকার সম্বন্ধ সারা পথই যেন আরাম,—এত আকর্ষণ আগে কোথা ছিল?

আমরা বিকালে যখন যাত্রা করি তখনও আমার মনের মধ্যে একটা গুরুভার চেপেছিল, যদি এসে পড়েন সেই অপ্রিয় জন যার সংস্পর্শ এড়াতে এতটা চঞ্চল পদে চলেছি গন্তব্য পানে। বিকালে তিনটা নাগাদ বেরিয়ে বেলা সাড়ে চারটের সময় লছমনঝুলায় এসে গেলাম। জয় বদরীনারায়ণ, জয় হৃষীকেশ আমরা গঙ্গা পার হয়েই তখনই গাড়ি জমালাম এবং বোধ হয় সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই হৃষীকেশ। জয় জয় জয় জয়—জয় কমলীবাবার ধর্ম্মশালা-পরমাশ্রয়ের জয়। একেবারে ঘরের ধারেই যেন এসে গেলাম। এইবার শেষ গর্ভাঙ্ক।

এখানে এসে আবার একবার ছুটি পাওয়া ছেলেদের মত গঙ্গাতীরে গিয়ে পড়লাম। তারপর বেশ খানিক ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যায় ধর্ম্মশালার উঠানে বসে জেঠার সঙ্গে কালকের কর্ম্ম তালিকা না বোলে প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলা গেল,—ঐ ধর্ম্মশালায় অবশ্য টাইম টেবল একখানা পাওয়া গেল। কথা হোলো কাল এই হৃষীকেশ থেকেই ডেরাদুন এক্সপ্রেসে যাওয়া যাবে; জেঠা আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে স্বস্থানে যাবে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে। এত কাছে এসে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান না করলে ভগবান নারাজ হবেন যে।

যতক্ষণ এখানে আছি একটা সঙ্কোচে পূর্ণ আনন্দ ভোগ করতেই পারছিনা। কোন রকমে এই পুণ্যতীর্থে রাত্র যাপন করে প্রভাতে উঠেই আগে গঙ্গা স্নান করে কিছু জলযোগান্তে একবার ঘুরতে গেলাম। জেঠাও তার নিজের ধান্ধায় রইলো। তারপর যখন আমি ফিরে এলাম,—সে বলে কি, পরমাত্মীয় একজনের মত এগিয়ে এসে,—মক্ষম কথাগুলিই সে বললে,—অব ঘর যায়কে বৈঠ্ যানা, আপনে কাম পর লাগা রহনা, ইধার ওধার মৎ যানা, অচ্ছা? অর্থাৎ ঠিক তো? আমি বললাম, অচ্ছা জি। তারপর সারা দিনটা আমিই ওর সঙ্গে কথা করেছি, ও কিন্তু একটা হাঁ, একটা না, একটা আচ্ছা, এইতেই সব কাজ সেরেছে। হাতে আঁকা, ওরই একটা পেন্সিল পোর্টেট তাকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখবার উদ্দেশ্যেই দিতে গেলাম, ও নিলেই না,—বললে, বো লেকর ম্যায় ক্যা করুঙ্গা, বদরীনারায়ণকে চতুর্ভুজ মুরতি হোতে তো রাখ দেতে, প্রেমসে রাখতে। বাড়ির জন্য একখানি ছবি কিনেছিলাম, তা ও জানতো না, সেখানা বার করে ওকে দিয়ে দিলাম। ভারি খুসী হোলো, আশ্চর্য্যও হোলো এখানে কি করে ও জিনিস আমি পেলাম, এই ভেবে।

যাই হোক ভোজন ও একটু বিশ্রামের পর সব বাঁধাছাদা ঠিক করা হয়ে গেল, এখান থেকে ঠিক চারটার সময় ষ্টেশান যাওয়া যাবে, সাড়ে পাঁচটায় গাড়ি সুতরাং পর্য্যাপ্ত সময় থাকবে;—এখন একটু বাইরে ঘুরে আসতে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিয়েছি;—হা ভগবান,—আমার শমন এলো,—সামনেই কাণ্ডী থেকে দাঁ-গিন্নি

উঠানে নামলেন, চট্ করে আবার ঘরে ঢুকলাম। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। মনে কেবল, হা ভগবান, হা ভগবান শেষে এই হোলো, এই কথাই উঠতে লাগলো। আর কি ধর্ম্মশালা ছিলনা এইখানেই কি উঠতে হয়? ঘরে ঢুকেও কি রক্ষা পেলাম। ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন বোধ হয়। অল্পক্ষণেই তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আমার সঙ্গে দেখামাত্রই বললেন, আপনি এইখানেই আছেন? সত্যের ভগবান ঠিক সময়ে ঠিক যায়গায় তিনি আমায় এনেছেন। জয় কেদারনাথ। তারপর গলায় আঁচলটি দিয়ে,—আপনাকে একবার প্রণাম করবার জন্ম কত ইচ্ছা হয়েছিল, এখন ভগবান সে সাধ পূর্ণ করলেন, বোলেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম হোলো, খানিক ধুলোও কপালে চিহ্ন রাখলে। যোড় হাতে আমি প্রতি নমস্কার করে একবার, নারায়ণ, উচ্চারণ করলাম,—তাঁরই জয় হেথা। এখন বললাম, হৃষীকেশ থেকেই আজ আমি সাড়ে পাঁচটার গাড়িতেই যাচ্চি। আমার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, তিনি বললেন, আমিও যাবো তাহলে।

হায় ভগবান, এ কি অশান্তি দয়াময়! কি বলব ঠিক করতে না পেরে, চেয়ে দেখি, সামনে এ আবার কি? দাঁ মশাই, পিছনে সেই অনুগত সর্ব্বস্বান্ত বন্ধু গুটি গুটি প্রাঙ্গণটুকু পেরিয়েই একেবারে ঘরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলাম, হে ধরণী তুমি দ্বিধা হও। দাঁ মশাই দেখলেন, গললগ্নকৃতবাসা গিন্নি দাঁড়িয়ে,—অপরাধীর ছাপও মুখে ছিল। দেখেই মুচকে হেসেই, দাঁ মশাই বললেন, এই যে ঠিক দুজনেই আছেন, আপনি না আলাদা এসেছিলেন, অন্ততঃ আমাদের চক্ষে ধুলা দেবার জন্মই ঐ প্ল্যান করেছিলেন নাকি? তা বেশ বেশ,—

প্রথমটা আমি লজ্জা ও সঙ্কোচেই যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিলাম,—তারপর মনে বল পেলাম, মরীয়া হয়ে সব দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেললাম,—আমি কাল বিকালে এসেছি আজ এখনই ষ্টেশানে যাচ্চি সাড়ে পাঁচটার গাড়িতে যাবো,—ইনি এইমাত্র আসছেন।

সত্যই তিনি আমার মোটঘাট বাঁধাও দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে এঁরও মোটঘাট বাঁধা বারান্দায় দেখলেন, সে সব এইমাত্র এসেছেন যেমন কুলীর পিঠে ছিল সে সব সেই রকমই রয়েচে। দেখে দাঁ মশাই বামালসুদ্ধ হাতেনাতে চোর ধরার ভাবে আবার মুচকে হাসলেন আমি কিছুই বললাম না, দেখে গিন্নি বললেন, একেবারে অন্ধ নাকি, সামনে কাণ্ডী রয়েছে ঐ কাণ্ডীয়ালা দেখতে পাচ্চনা? আমি আর কোন কথা না বোলে, জেঠার দিকে চেয়ে বললাম, উঠাও জি; বোলে আর তিলার্দ্ধ না দাঁড়িয়ে উঠানে নেমে পড়লাম,—তারপর হন হন করে ষ্টেশনের পথে যাত্রা। বাকী সময়টা ষ্টেশনে কাটানো যাবে, মন্দ হবেনা সেটা। টাঙ্গা বসেই ছিল, দেরী হোলো না পৌছাতে।

ষ্টেশানে পৌছে, টিকিট করে বেশ শান্তিতে প্ল্যাটফরমে এসে দেখলাম যাত্রী অনেক। এক জায়গায় সভা বসে গেছে গৈরীকধারী এক সাধুকে কেন্দ্র করে। সাধু বাঙ্গালী, পঁচিশ ত্রিশ জন শ্রোতাও বাঙ্গালী অন্ততঃ অধিকাংশই বাঙ্গালী বসে বেশ নিবিষ্টমনে শুনচে তাঁর কথা। আমিও মহাস্ফূর্ত্তিতেই বসে গেলাম পিছন দিকে। জেটাও বসলো,—ঠিক জায়গায়। পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল অনেকেই।

২২

হৃষীকেশ ষ্টেশনে—শেষ

আগে যা বলেছিলেন তা শুনিনি,—বসবার পর তার এই কথাগুলি শুনলাম,—সাধু বলছিলেন।

মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করে গোপনে কেউ আবার বেশ করে লোক জানিয়ে নানা ভাবে চাউর করে কত কাজই করে থাকে। অথচ তার মূলে আমি ভাবটাই সর্ব্বেসর্ব্বা থাকে। আবার সেই কর্ম্ম সফল বা বিফল হলে ফলাফলটা নিজেরাই ভোগ করে, গৌরব সম্পূর্ণই নিজেদের, এই নির্লজ্জ মূঢ়তা কোনদিনই ঐ ভণ্ডভাব সম্বন্ধে সচেতন করে না,—আমরা নির্ব্বিবাদে সবাই ঐ ভগবানের নাম নিয়ে ঐ মিথ্যা ভাবটাতে অভ্যস্থ হয়েই আসচি,—এখন ঐ যে বাইরে ভগবানকে আর ভিতরে আমারই দায়ীত্ব, গুরুত্ব, এবং গৌরবের মনোভাব,—এই সকল কঠিন তীর্থ ভ্রমণের ফলে সংশোধিত হতে পারে;—বিশাল হিমালয়ের মধ্যে—তিতিক্ষায় সহিষ্ণু করে তোলে ঐ সকল মহাতীর্থে,—যেমন কেদার, বদরী, যমুনোত্তরী বা গঙ্গোত্তরী, এই সকল কঠিন তীর্থ ভ্রমণের ফলে, মনোভাব সরল আর সত্য বা সৎভাবে দৃঢ় হতে সাহায্য করে এটা সত্য;—আপনারা এটা পরীক্ষা করে দেখতেও পারেন। এই পর্য্যন্ত শুনেছি;—সামনেই দেখি, দাঁমশাই, কাছে বা পাশেই বিধবা শালীকা গিন্নি তার পাশে বন্ধুটি এলেন, কাছেই মালপত্র মুটেকে রাখতে বলে বসে পড়লেন সৎকথা শুনতে, শুনলাম গিন্নিকে বলচেন, এখনও ট্রেণের অনেক দেরী, হরিকথা শোনা যাক্। গিন্নি, চারিদিকে চাইতে চাইতে আমাকেও আবিষ্কার করলেন, কিন্তু তাঁর পাশের লোকটিকে দেখালেন না। তিনি বক্তা সাধুর দিকেই চেয়ে ছিলেন। সাধু অর্দ্ধবয়সী সুন্দর গৌরবর্ণ, মাথায় পাগড়ি,—আমার মনে হোলো যেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্লিষ্ট কেউ হবেন।

এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী শ্রোতা পেয়ে সাধুজি একটু উৎসাহিত হয়েছিলেন তা পরিষ্কার বুঝা গেল তাঁর বলবার আগ্রহ দেখে। তাছাড়া তাঁর শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেদার বদরী, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মধ্য হিমালয়ের তীর্থের ফেরত অনেক যাত্রী আছে এ অনুমান তার নিশ্চয়ই ছিল, আমার সেটা মনে হোলো তাঁর কথার ভাবেই। যাই হোক এখন তিনি আবার আরম্ভ করলেন,—

আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসচি, আশা করি আপনারাও শুনে থাকবেন কথাটা এই যে, অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, অর্থাৎ বাল্যে বা কৈশোরে যখন বুদ্ধি তরল থাকে, তখন যে সব পাপ অন্যায় কর্ম্ম, পাতক অনুষ্ঠিত হয় তা জ্ঞান বা বুদ্ধির ঘনীভূত বা সুপক্ক অবস্থায় সে সকল ক্ষয় হয়ে যায়। কারণ যা কিছু অন্যায় বা পাপ যা আমাদের স্মৃতিতে ধরা থাকে জ্ঞানোদয়ে,—অর্থাৎ জ্ঞানের অবস্থায় অর্থাৎ বিবেক প্রখর হলেই তার জন্য অনুতাপটা স্বাভাবিক ভাবেই মনে ক্রিয়া করে, তাইতেই সে সকল পাপ আর ফলপ্রসূ হয় না, যথাকালেই মনের গ্লানী কেটে যায়।

তাঁর কথা শেষ হতে না হোতেই দাঁমশাই বিকট ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়, আচ্ছা তাহলে, বোলে কি একটা কথা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, পাশ থেকে একটা কোমল হাতের গোঁতা কাঁকালের কাছে এসে পড়তেই নিরস্ত হলেন;—স্বামীজিও আবার তার কথা আরম্ভ করলেন,—

তারপর অজ্ঞানের পাপ কিভাবে জ্ঞানে যায়, আশা করি আপনারা বুঝছেন, এখন জ্ঞানের পাপ যায় তীর্থে, এই সত্য বুঝতে কষ্ট হয় না,—জ্ঞান হবার পর একজনের জীবনের অনুষ্ঠিত পাপ তা তীর্থ ভ্রমণে ক্ষয় হয়ে যায়। এই যে তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা তারপর এই সকল কঠিন পথের কষ্ট স্বীকার করে তীর্থ স্থানে গিয়ে পুণ্য আশ্রমে স্নান,—স্বল্পকাল সেই পবিত্র বায়ুমণ্ডলে বাসের ফলে সেই তীর্থে পবিত্র ধারা, তার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হলেই অন্তরের মলিনতা ধুয়ে যায়, বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়, যার ফলে পূর্ব্বকৃত অকর্ম্মের গ্লানী আর থাকতেই পারে না। এই সকল তুষার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মহান তীর্থ স্থানে স্নানের ফলে যে অন্তরের পাপ ধৌত হয়, অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় এ কথা ধ্রুব সত্য। এইভাবে জ্ঞান কৃত পাপাচরণ তীর্থে ক্ষয় হয়। কিন্তু এই তীর্থে এসে যে পাপ করে অথবা তীর্থ স্নানাদি ভ্রমণের পরও যদি কেউ পাপাচারি হয়,—সে পাপের আর ক্ষয় নাই, পূর্ব রকমেই তার ফলাফল ভোগ করতেই হয়।

দেখি দাঁমশাইয়ের মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছে কিন্তু শালিকা দেবীর মুখ অত্যন্ত উজ্জ্বল। অল্পক্ষণেই ঘণ্টাধ্বনী হোলো সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো,—ট্রেণ আসচে।

ধৈর্য্যশীল পাঠক, মহাতীর্থের কথা এইখানেই শেষ। প্রথমে হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর তারপর যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ, তারপর হিমালয়ের মহাতীর্থের কথা এইখানেই শেষ। এই ভ্রমণের যদি কিছু শুভ ফল থাকে তাহলে সেই ফল আমি ভবিষ্যতের যাত্রীগণের রুচি, নিষ্ঠা, প্রবৃত্তির সাফল্যের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করলাম আর সর্ব্বান্তঃকরণেই তা করলাম। এখন বিদায়।

সমাপ্ত

মহাতীর্থের পথ
যমুনোত্রী
গঙ্গোত্রী
উত্তর কাশী
টিহরী
দেরাদুন
হরিদ্বার
হৃষীকেশ
দেবপ্রয়াগ
শ্রীনগর
রুদ্রপ্রয়াগ
কর্ণপ্রয়াগ
নন্দপ্রয়াগ
বিষ্ণুপ্রয়াগ
কেদার
গৌরীকুণ্ড
তুঙ্গনাথ
চামোলী
বদরী
হনুমান
মানাপাশ
হেমকুণ্ড
ভিউন্দর
তপোবন
তিব্বত
আ ল মো ড়া